স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
উমা মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী লাইব্রেরী
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে
স্বদেশী আন্দোলনের ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের
দুই প্রধান অধিনায়ক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবৎ বর্তমান শতকের প্রথম ভাগের বাংলা দেশের ইতিহাসের আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অতুল অধ্যবসায়ের ফলে আমরা এই যুগ সম্বন্ধে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়াছি। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইংরেজীতে লিখিত ১৯০৫-০৬ সনের স্বদেশী আন্দোলন বা মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের চিন্তাধারা এবং বাংলায় লিখিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির বিবরণ। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে মূল আকরগ্রন্থ, দলিল দস্তাবেজ ও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা এই সমুদয় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়া এই যুগের উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের —তথা ভারতবর্ষের—এই নবজাগরণের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহারা পথিকৃৎ (pioneer) বলিয়া পরিগণিত হইবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পূর্বে এই বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন— কিন্তু এরূপ সামগ্রিকভাবে এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া আর কেহ এই নবযুগের কাহিনী রচনা করেন নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ঐতিহাসিক নানা বিষয়ে গবেষণা করিয়া উপাধি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব যে-কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার যথাযথ ইতিহাস রচনা করার দিকে

কাহারও দৃষ্টি এ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাতে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবদান বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যে প্রদেশ এ বিষয়ে অগ্রণী এবং যাহার অবদান সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সেই প্রদেশের সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনার দিকে আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ব-বিদ্যালয় কোন প্রযত্নই করেন নাই। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় ও বাংলার কলঙ্কস্বরূপ। কিন্তু সুখের বিষয় মুখোপাধ্যায় দম্পতি স্বীয় যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা এই কলঙ্ক কতকটা মোচন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলন বা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলার দান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা কোন ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যের অতীত। গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু কেবল ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় যাহা করা সম্ভব মুখোপাধ্যায় দম্পতি তাহা করিতেছেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি এবং নবপ্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থ "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" গ্রন্থখানিতে ঐ সময়কার জাতীয় আন্দোলনের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক ভারতে যুগান্তর-আনয়নকারী স্বদেশী আন্দোলনের যথার্থ ও স্পষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। পূর্ব প্রকাশিত কোন গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ সঙ্কলিত হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা (অর্থাৎ বঙ্গ-বিভাগের বিবরণ ও ইহার প্রতিক্রিয়া), ইহার উদ্দেশ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, গতি ও প্রকৃতি, এবং রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনস্বীগণের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রবণতা কিভাবে ইহার সার্থকতা সাধনে কার্যকরী হইয়াছিল তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া 'যুগান্তর' ও বিপ্লববাদ এবং মুসলমান সম্প্রদায় কি পরিমাণে এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল তাহার বিবরণও এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

স্বদেশী আন্দোলন খুব বেশী দিনের কথা নয়। আমি যেবার বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবেশ করি সেই বৎসরই ইহার সূচনা। সুতরাং আমার এক জীবনেই ইহার আরম্ভ ও পরিণতি, এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই আমার কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার ইতিহাস লিখিতে গিয়া মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি যে এই কার্য কত কঠিন। কারণ কেবল স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচনা করা যায় না। তাহার জন্য চাই সমসাময়িক গ্রন্থ ও সংবাদপত্র এবং সরকারী ও বেসরকারী দলিলপত্র প্রভৃতি। সে যুগের এই সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করা যে কত কঠিন সে বিষয়ে আমার নিজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতা হইতেই আমি এই গ্রন্থের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকটা সঠিক ধারণা করিতে পারি। গ্রন্থকারদ্বয় বিপুল আয়াস সহকারে ঐ সমুদয় উপকরণ যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পূর্বোক্ত উপকরণগুলির সাহায্যে ঘটনা-পরম্পরা ও সনতারিখ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটি যথাযথ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ফলে পূর্বেকার লেখকদের অনেক ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছে। কোন গ্রন্থই একেবারে নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা কম। এই গ্রন্থেও হয়ত কিছু ভুল আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যত লেখা পড়িয়াছি তাহার মধ্যে এই গ্রন্থখানিই যে সমধিক নির্ভুল এ বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। এজন্য গ্রন্থকারদ্বয়কে কি বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহা খানিকটা ধারণা করিতে পারি এবং এজন্য আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ভবিষ্যতে যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবেন তাঁহারা এই গ্রন্থের সাহায্যে অনেক আয়াস ও পরিশ্রমের হাত হইতে ত্রাণ পাইবেন। আমি নিজেও যে এই দলের অন্তর্ভুক্ত সে কথা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না।

বিষয়টির গুরুত্ববোধই যে গ্রন্থকারদ্বয়কে এই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে অনেক ভারতবাসীও স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নহেন। চারি বৎসর পূর্বে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ

সম্বন্ধে আমি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে বঙ্গদেশের স্বদেশী আন্দোলন যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা হইলে যুক্তপ্রদেশে সীমাবদ্ধ ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহই বা ঐ আখ্যা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? আলোচ্য গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই মিলিবে। যখন এই প্রশ্ন একজন ঐতিহাসিকের মনে জাগিয়াছে তখন সাধারণ লোকের মনেও ঐ প্রকার সন্দেহ উঠিতে পারে, এবং আলোচ্য গ্রন্থের পক্ষে ইহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। একথা সত্য যে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তজ্জনিত বিলাতী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং বঙ্গভেদ রহিতকরণই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তখন ইহাকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের এক পর্ব বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষে কোন সঙ্গত যুক্তি ছিল না। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই এই আন্দোলনের যাহা বিশেষত্ব তাহা সমগ্র ভারত গ্রহণ করে। ইহার পূর্বেকার আমলের রাজনীতির প্রধান উপজীব্য ছিল নতশিরে আবেদন ও নিবেদনের থালা বহন করিয়া পূজা দ্বারা ইংরেজ রাজের তুষ্টি বিধান করা। উন্নতশিরে নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিরোধ করার কল্পনা ব্যক্তিবিশেষের মনে উদিত হইলেও, ইহা ব্যাপকভাবে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পূর্বে হয় নাই। কিন্তু বাংলাদেশে ইহার সূত্রপাত হওয়ার পরে ইহা ভারতের রাজনীতিতে স্থায়ী আসন লাভ করে। ইহার ফলেই নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের সৃষ্টি—ক্রমে ক্রমে নরমপন্থীদলের অপসারণ, চরমপন্থীদের 'হোমরুল আন্দোলন' ও গান্ধীযুগের জনজাগরণ এক অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনও এইরূপে ক্রমশঃ ব্যাপক ভাব ধারণ করে। প্রথমে বিদেশী পণ্য বর্জন ও দেশী জিনিষের ব্যবহার ইহাই ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা। কিন্তু অচিরেই ব্যবহারিক জিনিষ ছাড়াইয়া শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতি এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও বিদেশীর মোহ ত্যাগ করিয়া ভারতের নিজস্ব সভ্যতা

পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ইহাও সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয় এবং তদবধি এই ধারা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। সুতরাং যে রাজনৈতিক প্রণালী ও লক্ষ্য লইয়া বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও প্রসার হইয়া ইহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল। বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণ অথবা বিদেশী পণ্য বর্জন তখন বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং আন্দোলন ভারতব্যাপী হইল। ইহার প্রণালী হইল Passive Resistance (নিরস্ত্র প্রতিরোধ)—লক্ষ্য হইল সমগ্র ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এইখানেই ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ ও বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রভেদ। ঐ বিদ্রোহ যুক্তপ্রদেশ ও কয়েকটি সন্নিহিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল—ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া ভারতব্যাপী হয় নাই। ১৮৫৮ সনে ইংরেজ ঐ বিদ্রোহদমন করিবার পর অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ঐ বিদ্রোহের ধারার কোন অস্তিত্বই ছিল না। পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলন ইহার দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে যে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের কোন উপক্রমই হয় নাই একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের কাল হইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বৎসর যে এই সংগ্রামের প্রস্তুতিকাল তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। জাতীয় জাগরণে ইহার মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

> "যে ফুল না ফুটিতে
> ঝরেছে ধরণীতে,
> যে নদী মরুপথে
> হারালো ধারা
> জানি হে জানি, তাও
> হয় নি হারা।"

ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। কোন নদীর ধারা বন্ধ হইলেও তাহার স্রোতে একদিন হয়ত জমি উর্বরা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ নদীর পরিচয় দিতে গিয়া তাহার অব্যাহত ধারার কথাই ভাবি। নদীর মোহনা হইতে অনুসরণ করিয়া তাহার প্রথম লুপ্ত ধারাতে উপনীত হই না। এই হিসাবেই বলিয়াছি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় জাগরণের যে স্রোত ১৯৪৭ সনে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতেছিল তাহার প্রথম উল্লেখযোগ্য ধারা ১৯০৫ সনেই আমরা দেখিতে পাই। এই জন্যই ভারতের ইতিহাসে ইহা চিরদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ও নবযুগের অগ্রদূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই মত অনেকেই হয়ত গ্রহণ করিবেন না। কেহ বলিবেন ইহা বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ ভাবপ্রবণতা—আবার কেহ হয়ত বলিবেন ইহা বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর আত্মম্ভরিতার পরিচয় মাত্র। এইজন্য আমি এমন কয়েকজন জননায়কের উক্তি উদ্ধৃত করিব যাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ সংশয় সম্ভবপর নয়। পাছে কেহ মনে করেন অনুবাদে ভাবের আতিশয্য ঘটিয়াছে সেইজন্য মূল ইংরেজী উক্তিই উদ্ধৃত করিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন :

"It is not merely an economic or social or political movement, but it is an all-comprehensive movement co-extensive with the entire circle of our national life, one in which are centred many-sided activities of our growing community."

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তি উল্লেখ করিয়া ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহামতি গোখ্‌লের নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"I have said more than once, but I think the idea bears repetition, that Swadeshism at its highest is not merely

an industrial movement but that it affects the whole life of the nation—that Swadeshism at its highest is a deep, passionate, fervent, all-embracing love of the motherland, and that this love seeks to show itself, not in one sphere of activity only, but in all; it involves the whole man and it will not rest until it has raised the whole man. My own personal conviction is that in this movement we shall ultimately find the true salvation of India."

১৯০৮ সনে মহাত্মা গান্ধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহারও কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বহুদিন পর যখন তাঁহার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ভারত প্লাবিত, তখনও তিনি বলিয়াছিলেন যে এই উক্তির সম্বন্ধে তাঁহার মত কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই।

"The real awakening (of India) took place after the partition of Bengal...That day may be considered to be the day of the partition of British Empire...The demand for the abrogation of the partition is tantamount to a demand for Home Rule...As time passes, the nation is being forged... Hitherto we have considered that for redress of grievances we must approach the throne, and if we get no redress we must sit still, except that we may still petition. After the Partition the people saw that they must be capable of suffering. This new spirit must be considered to be the chief result of the Partition."

মহাত্মা গান্ধীর মতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে জাতীয় জীবনে যে নবযুগের সূচনা হইয়াছিল তাহার তিনটি বিশেষত্ব: "The shedding

of fear for the British or for imprisonment, and the inauguration of the Swadeshi Movement."

স্বদেশী আন্দোলনই প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেসে গরমপন্থী (Extremist) দলের প্রতিষ্ঠা করে এবং ভারতের রাজনীতিতে এক নূতন যুগ আনয়ন করে। ১৯০৫ সনে বারাণসী কংগ্রেসে লাজপৎ রায় "congratulated Bengal on heralding a new political era for the country. If other provinces followed the example of Bengal the day was not far distant when they would win."

গোখ্‌লের শিষ্য জ্যাকেরিয়াস্‌ এই বারাণসী কংগ্রেস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "A new turn was given to Indian politics; the policy of 'mendicancy', as the Congress method was derisively called, was henceforth even more seriously assailed—and significantly enough the great Indian Sinn Feiner (and adversary of Gokhale)—Tilak—was once more received with an ovation, as at Benares he rose to speak on Passive Resistance."

স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে এই সমুদয় প্রসিদ্ধ সমসাময়িক জননেতাদের বাণী স্মরণ করিলে আমরা ইহার গুরুত্ব এবং এই গ্রন্থের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিব।

কলিকাতা
৯. ২. ১৯৬১

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রস্তাবনা

স্বদেশী আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক নবযুগের উদ্বোধন করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিল্প-সাংস্কৃতিক সকল বিভাগেই ১৯০৫ সনে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ও আলোড়ন দেখা দেয়। এই যুগান্তকারী আন্দোলনের বিকাশ ও বিবর্তন, গতি ও প্রকৃতির বিষয়ই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় সকল প্রকার সমসাময়িক সরকারী ও বেসরকারী দলিল-দস্তাবেজ, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে সংরক্ষিত কাগজপত্রেরও যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা কোনো-না-কোনো ভাবে সংশ্লিষ্ট বহু কর্মীর সঙ্গে পত্রালাপ ও মোলাকাতের ফলে যে সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছি, তাও গবেষণার উপাদান স্বরূপ এই পুস্তকে স্থান লাভ করেছে।

গ্রন্থের অধ্যায়গুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রের উদ্দেশে লিখিত হয়েছিল, আর সেগুলিই পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে পুস্তকের অধ্যায় হিসাবে সন্নিবিষ্ট হলো। এই গ্রন্থকে স্বদেশী আন্দোলনের ঐক্যগ্রথিত ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বিবেচনা করা যেমন অনুচিত, তেমন আবার পুস্তকখানিকে কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি জ্ঞান করাও অযৌক্তিক। বিভিন্ন সময়ে রচিত হ'লেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাব-পারম্পর্য ও চিন্তার ক্রমিক বিবর্তন নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায়—এমন কি ষোল-আনা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাতেও—বর্তমান লেখকদ্বয় বিশ্বাসী নন। কোনো জাতির উত্থান বা পতন, একমাত্র তার নিজ কর্ম ও চেষ্টার ফলে সাধিত হয় না। বিশ্বশক্তির বা আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার প্রভাবও জাতীয় ইতিহাসের ভাঙা-গড়ায় কম লক্ষণীয় নয়। তা'ছাড়া, সৃষ্টিশীল নেতৃত্ব বা ব্যক্তিত্বের স্বরাজ মানব-

সভ্যতার ইতিহাসে আর এক প্রকাণ্ড শক্তি। ইতিহাসের বহুত্বনিষ্ঠ ব্যাখ্যা (pluralist interpretation) লেখকদের দৃষ্টিতে বেশী সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস এ-সত্যকেই মনে দৃঢ়তর করেছে।

এই পুস্তকের প্রথম চারিটি অধ্যায় ইতিপূর্বে যথাক্রমে 'বিশ্ববাণী' (শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৫৩), 'ইতিহাস' (১৯৫৭-৫৮), 'মন্দিরা' (শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৫৯) ও 'যুগবাণী' (শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৫৮) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু 'অরবিন্দের রাষ্ট্র-দর্শন'। এই বিষয়ের উপর লেখকদের ইংরেজী গ্রন্থের নাম *Sri Aurobindo's Political Thought* (কলিকাতা, ১৯৫৮)। ঐ পুস্তকের মর্মানুবাদ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংযুক্ত হয়েছে। অধ্যায়টি রচনা করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-সমালোচক ও সংস্কৃতি-সাধক কালিদাস মুখোপাধ্যায়। পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ের কিয়দংশ ইতিপূর্বে যথাক্রমে 'মন্দিরা' (জুন ও আগষ্ট, ১৯৫৭) ও 'যুগান্তর' (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সপ্তম অধ্যায়টি প্রথম বের হয় ১৯৫৭ সনের 'মন্দিরা' পত্রের শারদীয়া সংখ্যায়। পরিশিষ্টে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলায় বিপ্লববাদ প্রসঙ্গে একটি অতি-মূল্যবান অপ্রকাশিত রচনাও সংযুক্ত হলো।

এই গ্রন্থ প্রনয়ণের কাজে আমরা বহু সুধীজনের সুপরামর্শ ও সহৃদয় সহায়তা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর সুশীলকুমার দত্ত ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম সকলের আগে মনে পড়ে। তাঁদের সকলের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নানা অসুবিধা ও কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের গ্রন্থের জন্য মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন।

পুস্তকের নির্ঘণ্ট অশেষ শ্রম স্বীকার করে তৈরী করে দিয়েছে শ্রীমতী

চিত্রলেখা গঙ্গোপাধ্যায়। তা'ছাড়া, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির ব্যাপারেও শ্রীমতী চিত্রলেখা আমাদের অকৃপণভাবে সাহায্য করেছে।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। ১৯৫৯ সনের অক্টোবর মাসে পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠানো হয়। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মন্থর গতিতে মুদ্রণ কাজ এগিয়ে চলে। ১৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'কালিকা প্রেসে' ছাপা হবার পর বাকী অংশ 'মানসী প্রেসে' ছাপানো হয়। দুই অংশ মুদ্রণের মাঝখানে ব্যবধান সুদীর্ঘ হওয়াতেই অনিবার্যভাবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পুস্তকের মধ্যে রয়ে গেল। তবে তাতে কোথাও মূল বক্তব্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে করি না।

পরিশেষে 'সরস্বতী লাইব্রেরী' ও 'মন্দিরা' পত্রের পরিচালক গোষ্ঠীর শ্রদ্ধাস্পদ অরুণচন্দ্র গুহ, ভুপেন্দ্রকুমার দত্ত ও সুধীরচন্দ্র রায় মহাশয়েরা এই গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশের সকল দায় ও দায়িত্ব গ্রহণ করে লেখকদের পরম কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

ইতি

'শিক্ষাতীর্থ',
১২।৫, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
১৪ই এপ্রিল, ১৯৬১

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
ও
উমা মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন নব ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কার্জন-ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির প্রকাশ্য বিদ্রোহের ক্ষণ থেকে (৭ই আগষ্ট, ১৯০৫) পঞ্চম জর্জ কর্তৃক দিল্লী দরবারে এর আনুষ্ঠানিক রহিতকরণ পর্যন্ত (১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১) এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক মেয়াদ সুবিস্তৃত। এই আন্দোলন ছিল আত্ম-সচেতন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঙালী জাতির সর্বাত্মক স্বাদেশিকতার আন্দোলন। পরাধীনতা-জর্জরিত, আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বহুদিন পর আবার তার আত্ম-সংবিৎ ফিরে পায়। আধুনিক কালের ভারতীয় ইতিহাসে তাই এ আন্দোলন এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। এই আন্দোলন বাংলার ভূমিতে প্রথম জন্মগ্রহণ করে ধীরে ধীরে এক সর্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করে*(১)। এর মধ্যে নবজাত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক বিপ্লবাত্মক রূপ প্রকটিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের মোহ ও মায়াকে বর্জন করে স্বরাজ লাভের সংকল্প সেদিন এদেশ-বাসীর মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের মূল শিকড়

*(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে রক্ষিত দলিল-পত্রে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকদের *India's Fight For Freedom* (কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ২৩৫-২৩৬) দ্রষ্টব্য।

অনুসন্ধান করতে হলে বিগত শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা আবশ্যক*(২)।

১৭৫৭ সনে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা দেশে, তথা ভারতে, ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার ভয়ঙ্কর পরাজয় ও পতন মধ্যযুগীয় জীর্ণ মোগল সভ্যতার নিদারুণ ব্যর্থতাই ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মোগল সভ্যতা তার অন্তিম দশায় উপনীত। আচার্য যদুনাথ সরকার মোগল সভ্যতার শেষ পর্যায়ের নিখুঁত ও নিপুণ পর্যালোচনার পর এ অভিমত ব্যক্ত না করে পারেন নি যে, ক্লাইভ যখন বাংলার নবাবকে গদিচ্যুত করলেন, মোগল সভ্যতা তার আগেই ব্যবহৃত বা নিক্ষিপ্ত বুলেটের মত নিস্তেজ ও অকেজো হয়ে পড়েছিল। সৃষ্টিশীল, সমাজ-উন্নয়নকারী গতিবেগ সে সভ্যতা তখন খুইয়ে বসেছিল, এমনকি তার জীবনীশক্তি পর্যন্ত হয়ে পড়েছিল নিঃশেষিত। দেশের শাসন-ব্যবস্থা তখন ছিল শোচনীয়ভাবে বিকল। অসাধু, অযোগ্য, হীনবীর্য, ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিরা তখন সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সদা-সর্বদা হীন কলহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা ছিল ভয়াবহ। অকর্মণ্য শাসকগোষ্ঠীর ও সামন্তশ্রেণীর চরম অপদার্থতা, তাদের শোচনীয় নৈতিক অধোগতি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কুৎসিত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত সাহিত্যের পুষ্টি, পবিত্র গৃহজীবনেও দুর্নীতিপরায়ণতার আবির্ভাব, ধর্মের নামে নানা ব্যভিচার, ব্যক্তি-স্বাধীনতার একান্ত অভাব ভারতীয় সমাজকে ভীষণভাবে পঙ্কিল ও কলুষিত করে রেখেছিল। এমন দিনে অসার, জীর্ণ, মৃতপ্রায় ভারতীয় সমাজে ইংরেজ শাসন বহন করে আনে এক উন্নততর সভ্যতার জীবনাদর্শ। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠাকে তাই মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গবেষক নবযুগের শুভ

* (২) উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে লেখকদ্বয় তাঁদের ***The Growth of Nationalism in India*** (কলিকাতা, ১৯৫৭) গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

অরুণোদয় বলে চিহ্নিত করেছেন*(৩)। শতধাবিচ্ছিন্ন, আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ভারত ইংরেজ শাসনে ধীরে ধীরে ঐক্যগ্রথিত, কেন্দ্রীয়শাসিত হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে বৃহত্তর ও উন্নততর সমাজ ও সভ্যতার সম্ভাবনা দেখা দেয় স্পষ্টভাবে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্তন। উনিশ শতকে আমাদের নবজাগরণের মূলে এর দান অনন্য-সাধারণ। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন রক্তকণিকার সঞ্চার করে, গতানুগতিক চিন্তার বদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ সীমানা থেকে আমাদের মনকে দেয় মুক্তি, আমাদের চেতনায় ভাসিয়ে তোলে নবজীবনের স্বপ্ন। তাই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তৎকালের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ,—যেমন রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তি,—জানিয়েছিলেন স্বাগত সম্ভাষণ। ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগ্রত হয় আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার বোধ এবং সেই স্বাধিকার বোধের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় স্বাধিকার লাভের প্রচেষ্টা। ঐক্যগ্রথিত, কেন্দ্রীয়শাসিত ভারতের রাষ্ট্রিক পরিবেশে আমরা কল্পনা করতে আরম্ভ করি এক অখণ্ড ভারতের মূর্তি। যে স্বদেশ-বাৎসল্য বা দেশপ্রেমের কথা রামমোহন রায়ের পর রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রচার করেন, সেই দেশাত্মবোধ, ভারতবর্ষকে জননী জন্মভূমি জ্ঞানে সেবার

*(৩) যদুনাথ সরকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "When Clive struck at the Nawab, Mughal civilization had become a spent bullet. Its potency for good, its very life was gone. The country's administration had become hopelessly dishonest and inefficient, and the mass of the people had been reduced to the deepest poverty, ignorance and moral degradation by a small, selfish, proud, and unworthy ruling class. Imbecile lechers filled the throne; the family of Alivardy did not produce a single son worthy to be called a man, and the women were even worse than the men···The army was rotten and honey-combed with treason. The purity of domestic life was threatened by the debauchery fashion-

আদর্শ উনিশ শতকের সূচনায়ও এদেশবাসীর মনে স্থানলাভ করে নি। এমন কি ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের মধ্যেও এ ধরণের দেশাত্মবোধের প্রেরণা বড় একটা নজরে পড়ে না * (৪)। মহাবিদ্রোহের বহুদিন পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: "এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাঙলা দেশে ছিল না, কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত। ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট"*(৫)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও রাষ্ট্রিক চেতনার উদ্বোধন এক উল্লেখযোগ্য আকার গ্রহণ করে। সিপাহী বিদ্রোহের সংগ্রামী ঐতিহ্য (১৮৫৭-৫৮), নীলকর আন্দোলনের স্মৃতি (১৮৬০), হিন্দুমেলার জাতীয় ভাব প্রচারে প্রচেষ্টা (১৮৬৭-১৮৮০), পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় ও জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ, স্বাধিকার-সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমিক অভ্যুত্থান, ভারতীয় কর্তৃত্বে স্বাধীন সংবাদপত্রের অভ্যুদয়, রোমান্টিক কাব্য ও জাতীয় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় নাট্যাভিনয়, ব্রাহ্মসমাজে সংগঠিত স্বাধীনতার আদর্শ, কেশবচন্দ্র সেনের বিলাতে ধর্মপ্রচার (১৮৭০), ইণ্ডিয়ান লীগ

able in the Court and the aristocracy and the sensual literature that grew up under such patrons. Religion had become the handmaid of vice and folly. On such a hopelessly decadent society, the rational progressive spirit of Europe struck with resistless force." যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *History of Bengal, Vol. II* (ঢাকা, ১৯৪৮) গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৪৯৭-৪৯৮ দ্রষ্টব্য।

* (৪) কালিদাস মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় রচিত "১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ" (কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ২১-৩০) পুস্তকখানি পঠিতব্য।

* (৫) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস ও বাঙ্গালা" (কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃঃ ৯-১০ ও ৩৫) দ্রষ্টব্য।

(১৮৭৫) ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশানের রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা (১৮৭৬), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতায় ও ভারতের বিভিন্ন জনপদে রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং তাঁর পরিচালনায় সারা ভারতব্যাপী সিভিল সার্ভিস আন্দোলন গড়ে তুলবার ব্রতবদ্ধ আয়োজন (১৮৭৬-৭৮), লালমোহন ঘোষের রাষ্ট্রিক কারণে বিলাত ভ্রমণ (১৮৭৯-৮০), ইলবার্ট বিল আন্দোলন (১৮৮৩), জাতীয় কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা (ডিসেম্বর, ১৮৮৩), থিয়োযফিষ্ট আন্দোলনের প্রভাব, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিজয় গোস্বামীর ধর্মপ্রচার, বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও শক্তিযোগের অগ্নিমন্ত্র (১৮৯৩) বাঙালী জাতির, তথা ভারতবাসীর, মনে এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ সঞ্চার করে। এই দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের পটভূমিতেই জন্মলাভ করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ১৮৮৫)। কংগ্রেস একদিকে যেমন জাতীয় চেতনার বিবর্তনের পরিণতি, অন্যদিকে তেমনি এই জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশেরও বিপুল সহায়ক। কংগ্রেস-জীবনের প্রথম দুই দশকে (১৮৮৫-১৯০৫) এর কাজকর্ম প্রধানত আবেদন-নিবেদনের পথে পরিচালিত হলেও ভারতীয় জাতীয়তার স্ফুরণে ও প্রসারণে ঐ যুগেও কংগ্রেসের অবদান বিরাট। এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "স্বদেশী ধুয়া" প্রবন্ধে * (৬) কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মহোপকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দেশবাসিগণকে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ও সুশিক্ষিত করে তোলা, জাতির প্রাণে স্বদেশানুরাগ সঞ্চার করা, এবং সর্বোপরি বিভিন্ন প্রদেশের, ধর্মের ও ভাষাভাষী লোককে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা কংগ্রেসী কাজকর্মের তিনটি মহামূল্য ফল। একতাবোধের সঞ্চার সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন : "ইহা বর্ষে-বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার, বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিগণকে এক স্বদেশানুরাগসূত্রে আবদ্ধ করিয়া একস্থলে আনিয়া উপবিষ্ট করিতেছে। তাঁহারা কংগ্রেস মণ্ডপে সমবেত হইয়া অতি প্রবলরূপে অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহারা

* (৬) 'প্রবাসী', আষাঢ়, ১৩১২ বা জুলাই, ১৯০৫

এক দেশের লোক, তাঁহাদের সুখ দুঃখ এক, তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এক, তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার এক। আমি এই ভারতীয় একতা সাধনকে কংগ্রেসের মহামূল্য কার্য বলিয়া মনে করি।"

এই ঐক্যবোধ ও জাতীয়ভাব জাগরণে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান অসীম। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও তার ফলে সারা ভারতের যুবকগণকে এক ছাঁচে ঢেলে গড়বার চেষ্টা, রেলপথ, ষ্টীমার প্রভৃতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে যাতায়াতের সুবিধা, পোষ্ট-অফিসের দান, একই রাষ্ট্রিক শাসনে জীবন-যাপন ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনাই এদেশবাসিগণের মনে ঐক্যবোধ বা "একতা প্রবৃত্তি" সঞ্চার করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে * (৭)।

ইংরেজ শাসনে আর্থিক ভারতের রূপান্তরও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণে ছিল এক বিশেষ কার্যকরী শক্তি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত দেখিয়েছেন যে, ১৭৯৩, ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সনের অর্থনৈতিক আইনের ফলে এদেশে তিনটি বিশিষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়: প্রথমতঃ, এক শক্তিশালী ও প্রভাবশীল জমিদার-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, এক উৎসাহী ও আকাঙ্ক্ষাপ্রবণ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব; তৃতীয়তঃ, বাংলা দেশে আপেক্ষিক হিসাবে সম্পদশালী ও অধ্যবসায়শীল কৃষক-শ্রেণীর অভ্যুত্থান * (৮)। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কৃষক-শ্রেণীর সজ্ঞান ও সংঘবদ্ধ অংশ খুব বেশী না থাকলেও এ-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যাঁরা সেদিন নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁরা বাংলার এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। আর তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা অর্থ ও সহানুভূতি দিয়ে ঐ আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন, তাঁরা হলেন বাংলার জমিদার-শ্রেণী।

অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁর "ইতিহাস বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধে

* (৭) শিবনাথ শাস্ত্রী: "জাতীয় একতা" ('প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১২ বা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫)

* (৮) **Romesh Chandra Dutt:** ***The Economic History of India in the Victorian Age*** (**London, 1904; pp. 460-461**)

লিখেছিলেন (প্রবাসী, ১৯১১) যে, কোন জাতির,—কি রাষ্ট্রিক, কি আর্থিক, কি সামাজিক, কি সাংস্কৃতিক,—জীবন শুধু নিজেদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে না; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাতির উত্থান-পতনে বা উন্নতি-অবনতিতে বিশ্বশক্তির প্রভাব লক্ষণীয়। তাই জাতীয় উন্নতির জন্য তিনি সর্বদাই "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের" মন্ত্র প্রচার করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় বিদেশী চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা এই আন্দোলনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজ শাসন ও শোষণের প্রভাব তো প্রথমেই স্বীকার্য। ইংরেজী শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাবও ছিল জাতির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এলান অক্টেভিয়ান হিউম, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, স্যার হেনরী কটন প্রমুখ ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের অবদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। মেজর জে. বি. কীথ্, মিঃ ই. বি. হ্যাভেল, স্যার জর্জ বার্ডউড প্রভৃতি মনীষীর সাংস্কৃতিক দানও ভারতের জাতীয়তা বিবর্তনে বিপুল আত্মিক শক্তি যুগিয়েছে।

আয়র্লণ্ডের প্রভাবও আমাদের উপর কম ছিল না। পার্ণেলের প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামাদর্শ এদেশের বহু চিন্তাবীরের কল্পনায় ধাক্কা দিয়েছিল। অরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শনে ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় পার্ণেলের প্রভাব সুস্পষ্ট। আইরিশ মহিলা সিষ্টার নিবেদিতা ও অ্যানি বেশান্তের দান আমাদের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কি বিরাট, তা আজকের দিনে কারো অজানা নেই। ১৯০৫ সনে বাঙালী জাতি ও কিছু পরিমাণে ভারতবাসী যে "বয়কট" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল, তার মধ্যে আইরিশ প্রভাব জাজ্বল্যমান। আইরিশ শব্দ "বয়কট" এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

জার্মানী ও ইতালীর প্রভাবও আমাদের জাতীয় চেতনা উদ্বোধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ইতালীর ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুর এবং জার্মানীর বিসমার্ক আমাদের রাষ্ট্রিক চিন্তায় খুব বড় ঠাঁই পেয়েছিলেন। ইতালীর কার্বোনারি আন্দোলনের ইতিহাসে তৎকালে অনেকেই বিশেষ প্রভাবিত হন। এ ছাড়া, জার্মান কবিবর গ্যেটে, দার্শনিক কাণ্ট, হেগেল, হার্ডার ও

ফিখ্‌টে এবং জার্মান অর্থশাস্ত্রী ফ্রেডারিক লিষ্ট প্রভৃতি মনীষী সে-যুগে বাঙালী চিন্তাকে অনেকখানি পুষ্ট করেছিলেন * (৯)।

এই প্রসঙ্গে ফরাসী, মার্কিন ও রাশিয়ান প্রভাবও স্বীকার্য। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রভাব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অধিনায়কদের জীবনেতিহাস পাঠ করলেই সম্যক্‌ বুঝা যায়। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রতীকস্বরূপ যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা জ্ঞানতঃ ও প্রত্যক্ষভাবে ফরাসী দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "এ নেশান্‌ ইন্‌ মেকিং" (লণ্ডন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২৭, পৃ ২১২) গ্রন্থে একথা স্বীকার করেছেন। এছাড়া, ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো, মলিয়েয়ার প্রভৃতির চিন্তাধারাও আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৯৩ সনে বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার সময় থেকে আমেরিকার সঙ্গে এদেশের ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীর সংঘবদ্ধ প্রচারকার্যের ফলে (১৮৯৩-১৯০৬) ভারতের অনুকূলে মার্কিন মুল্লুকে সশ্রদ্ধ জনমত গড়ে উঠতে থাকে। আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের কাহিনী তৎকালে আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে প্রকাণ্ড আত্মিক শক্তি যুগিয়েছে। আবার রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেলেও একথা বলা চলে যে, উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার জনগণের মধ্যে যে আত্ম-চেতনা ও জাতীয়তাবোধ জাগরিত হতে থাকে, তাও আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনাবোধকে কতকটা প্রভাবিত করেছিল। জারের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ১৯০৫ সনে বিদ্রোহে পরিণত হয়, তা তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রিক আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল সন্দেহ নেই। বুয়োর যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভাগ্যবিপর্যয় ভারতে তৎকালে যথেষ্ট আশা ও আনন্দের সঞ্চার করেছিল।

* (৯) B. K. Sarkar's : *Creative India* (Lahore, 1937, pp. 476—499).

এই প্রসঙ্গে এশিয়ার দু'টি রাষ্ট্রের কর্মপ্রচেষ্টা ও দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৭ সনের পর থেকে জাপানের দ্রুত অগ্রগতি সারা এশিয়ার বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৯৫ সনে চীনের বিরুদ্ধে তার বিজয়লাভ ও ১৯০৫ সনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য এশিয়াবাসিগণের মনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। চীন থেকে পারস্য পর্যন্ত প্রত্যেক দেশের কাছেই জাপান হয়ে দাঁড়ালো এক বিরাট আদর্শ। জাপানী দৃষ্টান্ত, জাপানী রাজনীতি, জাপানী শিক্ষা-দীক্ষা, জাপানী শিল্প-বিজ্ঞান সোৎসাহে আলোচিত হতে থাকে এশিয়ার প্রত্যেক দেশে। পোর্ট আর্থারের সামরিক বিজয়ের (১৯০৫) মধ্য দিয়ে জাপান একালে এশিয়ার মান প্রতিষ্ঠা করে শক্তি-মদোন্মত্ত পাশ্চাত্যের দরবারে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে জাপানী আদর্শ ছিল তৎকালে এক প্রকাণ্ড আত্মিক শক্তি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে রক্ষিত সরকারী দলিলেও (ফাইল নম্বর ৪৭৬।১৯৩-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায়) এর উল্লেখ দেখতে পাই। জাপানী চিন্তানায়ক ওকাকুরা বর্তমান শতকের প্রারম্ভে বাংলা ও ভারতের নানাস্থান পরিদর্শন করেন। তাঁর *Ideals of the East* গ্রন্থখানি সেকালে এদেশের চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করে। তাছাড়া দুর্বল, পদানত চীনের আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সেযুগে যে চেষ্টা ও আন্দোলন চলেছিল, তা ছিল পরাধীন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে আর এক আত্মিক শক্তি। বস্তুত, আমেরিকান দ্রব্য বর্জনের জন্য সে সময়ে চীন যে আন্দোলন চালিয়েছিল, তা বাংলার বিলাতী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে অ-বাঙালী প্রভাবও ছিল এক বিশেষ কার্যকরী শক্তি। রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির সামরিক ইতিহাস ও বীরত্ব-কাহিনী তৎকালে বহু বাঙালীর মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা সঞ্চার করে। ১৮৭৫ সনে কলিকাতার ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত "Rise of the Sikh Power" বক্তৃতা আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অধিনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর জীবনে সুরেন্দ্র-

নাথের ঐ বক্তৃতার প্রভাব স্বয়ং স্বীকার করেছেন। কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান (১৯০২-০৬) শুধু মারাঠা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় নি, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ নেতার নেতৃত্বেই মূলত পরিচালিত হয়েছিল। ১৯০৪-এর শিবাজী উৎসব উপলক্ষেই রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী" শীর্ষক কবিতা *(১০)। এই প্রসঙ্গে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিলক, লাজপৎ রায়, গোখ্‌লে, নৌরজী, টহলরাম গঙ্গারাম প্রভৃতি অ-বাঙালী রাষ্ট্রনেতাদের নেতৃত্বের দানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। টহলরামের নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনাকালে কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন: "তিনি লর্ড কার্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। যীশুর পূর্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টহলরাম আসিয়াছিলেন"* (১১)। তৎকালীন সরকারী রিপোর্টে পাঞ্জাব-অধিবাসী আর্য-সমাজী এই টহলরামকেই আক্রমণাত্মক "বয়কট"-দর্শনের প্রথম উদ্গাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের ফাইল নম্বর ৪৭৬।১৯৩ ও লাইব্রেরী নম্বর ৪৭ দলিলদ্বয় দ্রষ্টব্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১৯০৫-এর জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি রচনার পশ্চাতে অ-বাঙালী, অ-ভারতীয়, অ-এশিয়ান ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম ও আন্দোলনের দান নেহাত বড় কম নয়।

বিদেশী শক্তির অবদানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জাতীয় নেতৃত্বের দানও অবশ্য স্বীকার্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে বহু সৃষ্টিশীল, প্রতিভাসম্পন্ন জননায়কের আবির্ভাব ও সার্থক সমাবেশ ঘটেছিল। যে কোন আন্দোলনের ইতিহাসে নেতৃত্বের স্থান অতি উচ্চে। জনতার মনে অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও তা আন্দোলনের মধ্যে রূপায়িত না হতে পারে যোগ্য

* (১০) 'বঙ্গদর্শন': নবপর্যায়, আশ্বিন, ১৩১১ বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৪ সনে ঐ কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

* (১১) কৃষ্ণকুমার মিত্র: 'আত্মজীবনী' (১৯৩৭, পৃঃ ২৪৪-৪৯)

নেতৃত্বের অভাবে। বাংলা দেশের পরম সৌভাগ্য এই যে, উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে এদেশে বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী, স্বদেশপ্রাণ জননায়কের সমাবেশ ঘটেছিল। জননায়কগণও এক অর্থে সামাজিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি। তাঁরাও সামাজিক প্রভাবকে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠেন না। কিন্তু এ হলো সত্যের ভগ্নাংশমাত্র। মানুষের মনে যে অন্তর্নিহিত সৃষ্টিমূলক আবেগ রয়েছে,—যাকে বার্ণার্ড শ বলেছেন 'vital urge',—সেই আবেগ বা শক্তির তাড়নায় মানুষ প্রতিষ্ঠা করে সমাজের উপর আপন কর্তৃত্ব; সে সামাজিক গতি-প্রকৃতির রদ-বদল করে, সে সৃষ্টি করে ইতিহাসে নব অধ্যায়। নূতন সামাজিক আবেষ্টনী-গঠনে প্রতিভাবান নেতাদের সৃষ্টিশীল দৃষ্টি বা ব্যক্তিত্বের স্বরাজও একটি প্রধান শক্তি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ইত্যাদি মনস্বী পুরুষদের নেতৃত্ব স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার্য।

এইভাবে ঘটনা-স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলা দেশে উনবিংশ শতকের শেষে রাজনৈতিক চেতনা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ বিস্তার লাভ করে। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পথ বর্জন করে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে জাতি গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে দেখা দেয়। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার নেতৃবৃন্দ আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার কথা সজোরে প্রচার করেন ও জাতি গঠনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবার আশু প্রয়োজনও ঘোষণা করেন। মানসিক গঠনে বাঙালী জাতি তখন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। জানুয়ারী, ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫-এর আগষ্ট পর্যন্ত কার্জন ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, এশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান, বাগ্মিতা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের ভেতর এমন কয়েকটি ত্রুটি ছিল—যা তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলার পথে ছিল অন্তরায়-

স্বরূপ। তিনি ছিলেন একজন কূট সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। সাম্রাজ্যভুক্ত দেশীয় প্রজাপুঞ্জের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমর্থনের মূল্যেও তাঁর কোন আস্থা ছিল না। এক কথায় কার্জন ছিলেন পুরাদস্তুর স্বৈরতন্ত্রের উপাসক। ঐতিহাসিক রমেশ দত্ত কার্জনের চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন। ১৯০৫-এর বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে গোখ্‌লে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে কার্জন সম্পর্কে ঐ একই চিত্র অঙ্কিত করেছেন * (১২)।

ভারতে আগমনের ঠিক পূর্বে বিলাতের এক ভোজ-সভায় কার্জন ঘোষণা করেছিলেন যে, ইংরেজ জাতির বাণিজ্যিক বা সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ভারতবর্ষকে ব্যবহার না করে তিনি ঐ দেশের শাসন পরিচালনা করবেন ভারতীয় স্বার্থে। তিনি আরও বলেন যে, বাহুবলের সাহায্যে ইংরেজ জাতি একদিন যা অর্জন করেছে, তা তিনি রক্ষা করবেন ন্যায়ধর্মের সাহায্যে ("to retain by justice that which we may have won by the sword")। তাই কার্জনের আগমনবার্তায় এদেশবাসী প্রথমে নিদারুণভাবে খুসী হয়েছিল। কিন্তু কার্জন ভারতবাসীর সে আশা পূর্ণ করতে পারেন নি। বরং আঘাতের পর আঘাত দিয়ে তিনি তাদের ক্ষিপ্ত করে তোলেন, জাতির মনুষ্যত্বকে অপমান করে তাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেন। কার্জনের প্রথম আঘাত হলো কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট (১৮৯৯)। ১৮৭৬ সন থেকে বাংলা সরকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আবহাওয়ায় কিছু-পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন-নীতি প্রবর্তন করে। এই মিউনিসিপ্যালিটিতে ৫০ জন ছিলেন কলিকাতার নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আর ২৫ জন ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৭৬ সন থেকে বহু জনহিতকর কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ১৮৯৯ সনে কার্জন এর স্বাধীনতায় দিলেন এক প্রচণ্ড আঘাত। আইনের বলে তিনি কলিকাতার

* (১২) *The Indian National Congress*, Vol. I, pp. 790-793.

নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি-সংখ্যা হ্রাস করে দিলেন ৫০ থেকে ২৫-এ অর্থাৎ সরকার মনোনীত প্রতিনিধিদের সমান সমান। চেয়ারম্যান থাকলেন সরকারী প্রতিনিধি। কাজেই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির শাসনে আসল ক্ষমতা চলে গেলো সরকারের হাতে *(১৩)। কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কার্জনের এই স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে তখন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কার্জন সকল প্রতিবাদ করলেন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য। কার্জনী শাসনের প্রথম নমুনা পাওয়া গেল!

কার্জনের দ্বিতীয় আঘাত হলো ইউনিভার্সিটীজ্ অ্যাক্ট (১৯০৪) বা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন! জুন, ১৯০২ সনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত (জানুয়ারী, ১৯০২) বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেশে এক তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয়। বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, ডন ইত্যাদি পত্রিকায় দিনের পর দিন সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। কমিশনের একমাত্র হিন্দু সদস্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার স্থানে স্থানে আপত্তি জানিয়ে তাঁর "Note of Dissent" রিপোর্টের পরিশিষ্টে প্রকাশ করেন। এতৎসত্ত্বেও কার্জন দেশের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ১৯০৪ সনে ঐ কমিশন-রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন। ১৮৫৭ সন থেকে এদেশবাসী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যেটুকু অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল, সেটুকুও হরণ করা হলো কার্জনী আইনের দ্বারা। কার্জন জানতেন বাঙালীর এই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও স্বাধিকার অর্জনের আগ্রহ ইংরেজী শিক্ষার ফল। শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে ভারতবাসীর স্বাধীনতাস্পৃহা দমন করা সম্ভব নয়। ১৯০৪-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বেসরকারী প্রভাব লুপ্ত হলো—কায়েম হলো অতিবেশী সরকারী

* (১৩) R. C. Dutt : *The Economic History of India in the Victorian Age* (London, 1904 ; pp. 457-458)

কর্তৃত্ব* (১৪)। বাংলা দেশ তৎকালে শিক্ষায়-দীক্ষায় ভারতের মধ্যে অগ্রণী ছিল। এইজন্য কার্জনের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতিক চালের বিরুদ্ধে এখানেই সবচেয়ে বেশী প্রতিবাদ ওঠে—প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হলে সবচেয়ে বেশী বিক্ষোভও দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে ১৯০৫-এর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে কার্জনের অভিভাষণ (শনিবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কার্জন সেদিন বলেছিলেন : "I hope I am making no false or arrogant claim when I say that the highest ideal of truth is to a large extent a Western conception. I do not thereby mean to claim that Europeans are universally or even generally truthful, still less do I mean that Asiatics deliberately or habitually deviate from the truth. The one proposition would be absurd, and the other insulting. But undoubtedly truth took a high place in the moral codes of the West before it had been similarly honoured in the East"* (১৫)। অর্থাৎ "সত্যের উচ্চতম আদর্শ প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য আদর্শ—একথা বললে মনে হয় না কোনো মিথ্যা বা উদ্ধত দাবি তোলা হবে। এর দ্বারা আমি বলতে চাই না যে, ইউরোপবাসীরা সার্বজনিকভাবে বা এমনকি সাধারণভাবে সত্যনিষ্ঠ ; আর এর থেকেও আমি কম মনে করি যে এশিয়াবাসিগণ ইচ্ছাকৃত-ভাবে বা স্বভাবক্রমে সত্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট। এই দুইয়ের একটি ধারণা হলো অসম্ভব, আর একটি হলো অপমানজনক। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে সত্যের আদর্শ সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই পশ্চিমা নীতিবোধে ঐ আদর্শ সগৌরবে স্বীকৃত হয়েছিল।"

* (১৪) Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee : *A Phase of the Swadeshi Movement* (Calcutta, 1953, pp. 20-23).

* (১৫) University of Calcutta : *Convocation Addresses*, Vol. III, 1899-1906 (1914, p. 981)

সভাস্থ বিদ্বৎমণ্ডলীর অনেকেই কার্জনের এই প্রকার উক্তিতে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হন। উক্ত সভায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। বাংলার প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, কার্জনের মুখে প্রাচ্যবাসীর অসংগত নিন্দা শুনে নিবেদিতা ক্ষিপ্ত হন ও সভাশেষে গুরুদাসবাবুর বাড়ী গিয়েই কার্জনের লেখা "Problems of the Far East" বইখানা সংগ্রহ করে আনেন। তাঁরই উৎসাহে সোমবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় (পৃঃ ৫, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভ) "Lord Curzon in Various Capacities" নামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এখানে কার্জনের সমাবর্তন বক্তৃতার একটি অংশ ও "Problems of the Far East" গ্রন্থ থেকে আর একটি অংশ (পৃ ১৫৫-৫৬) উদ্ধৃত করে দেখানো হয় যে, কার্জন নিজেই মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত। অমৃতবাজারের ১৩ তারিখের রিপোর্ট ১৬ই ফেব্রুয়ারী "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিকে "A Liar Discoursing on Truth" নামে প্রকাশিত হয়* (১৬)। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর পর তিনটি প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কার্জনের সমাবর্তন অভিভাষণের তীব্র সমালোচনা করে। ১৫ তারিখের প্রবন্ধে অমৃতবাজার উক্তি করে: "Lord Curzon marred his otherwise brilliant Convocation speech by some irrelevant and unnecessarily offensive remarks". ১৭ তারিখের প্রবন্ধে অমৃতবাজার ভারতবাসীর উচ্চ নৈতিক আদর্শ সপ্রমাণের নিমিত্ত স্যার জর্জ বার্ডউড, ফ্রেডারিক পিনকট্, স্যার ম্যালকম্, স্যার চার্লস্ ইলিয়ট্, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি মনীষীদিগের ভারত সম্পর্কে মতামত উদ্ধৃত করে। এরপর কলিকাতা টাউন হলে ১০ই মার্চ, ১৯০৫ তারিখে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাসবিহারী ঘোষ তীক্ষ্ণ-

* (১৬) কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত Romesh Ch. Dutt's *Paper Cuttings*, Vol. II. দ্রষ্টব্য।

ভাষায় ঐদিন যে মন্তব্য করেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "Lord Curzon with brief little authority of 5 years' Viceroyalty in India, robed in Chancellor's gown, had the audacity to challenge the ideal of truth of India—nay, of Asia—which has produced Gautama Buddha, Mohammed and even Jesus—men who may not have taught us how to conquer and how to rule, but certainly men who have taught us how to live and how to die" অর্থাৎ "পাঁচ বছরের জন্য ভারতবর্ষ শাসনের সামান্য একটু ক্ষমতা পেয়ে আর উপাচার্যের সিংহাসনে বসে লর্ড কার্জন ভারতের সত্যনিষ্ঠা, এমনকি এশিয়ার সত্যনিষ্ঠাকেও অস্বীকার করবার মত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছেন। অথচ এই এশিয়া ভূখণ্ড শুধু গৌতম বুদ্ধ ও মহম্মদকেই জন্ম দেয় নি—যীশুখৃষ্টকেও জন্ম দিয়েছিল। এই সমস্ত মহাপুরুষগণ এশিয়াবাসীকে পররাজ্য দখল ও শাসনের শিক্ষা না দিতে পারলেও কিভাবে মানুষের মতন বাঁচতে হয় ও মানুষের মতন মরতে হয় সে শিক্ষা দিয়েছিলেন।" এইভাবে উক্ত সভায় কার্জনের সমাবর্তন বক্তৃতার তীব্র নিন্দা করা হয়। বম্বে ও মাদ্রাজেও অনুরূপ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় "প্রাচ্যের সত্যনিষ্ঠা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়, বৈশাখ, ১৩০২ বা এপ্রিল, ১৯০৫) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কার্জনের সমাবর্তন বক্তৃতার সমালোচনা করেন।

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, ভারতে কার্জনের শাসননীতি, বিশেষ করে শিক্ষা-নীতি, স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর তীব্র অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্থানে স্থানে কার্জনী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভও প্রকাশিত হতে থাকে।

এর পরবর্তী কার্জনী কশাঘাত হলো বঙ্গভঙ্গের সংকল্প। পলাশী যুদ্ধের সাত বছর পরে সংঘটিত হয় বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)। বক্সারে বিজয়লাভের

স্বদেশী আন্দোলন

ও

বাংলার নবযুগ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরই ইংরেজ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে (১৭৬৫)। উড়িষ্যা তখন অবশ্য রাষ্ট্রিকভাবে ছিল মারাঠাদের অধীন এবং ১৮০৩ সনে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু সীলেট, গোয়ালপাড়া, গারো হিল্স ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনা থেকেই বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৭৭৪ সন (অর্থাৎ যে বৎসর ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাংলার গভর্ণর থেকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল পদে উন্নীত হন, সে বৎসর) থেকে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত বাংলার লাটই ছিলেন ভারতের বড়লাট। ১৮৫৪ সনে বাংলার শাসনভার একজন স্বতন্ত্র 'লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌-গভর্ণর' বা ছোটলাটের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৮৬৮ সনে স্যার ষ্ট্র্যাফোর্ড নর্থকোট্‌ এই মর্মে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, অতিকায় বাংলা প্রদেশের যথার্থ শাসন একজনের পক্ষে ক্রমশই দুষ্কর হয়ে উঠ্‌ছে*(১৭)। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য তাই ১৮৭৪ সনে আসামকে বাংলা থেকে ছিন্ন করে এক স্বতন্ত্র চীফ্‌ কমিশনারের হস্তে অর্পণ করা হয়। নবগঠিত আসাম প্রদেশে সীলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই তিনটি বঙ্গভাষাভাষী জেলা সংযুক্ত হয়। বাংলার অঙ্গচ্ছেদের এই হলো প্রাথমিক ধাপ*(১৮)।

শাসনকার্যের সুবিধার উদ্দেশ্যে বাংলার আয়তন আরও সংকীর্ণ করার প্রয়োজন বৃটিশ সরকার পক্ষ অনুভব করতে থাকেন। ১৮৯১ সনে সরকারের উদ্যোগে এক পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। সভায় বাংলার ছোটলাট, আসাম ও ব্রহ্মদেশের চীফ্‌ কমিশনারদ্বয় ও কয়েকজন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রক্ষার উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রস্তাব করেন যে লুসাই পাহাড় ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হোক্‌। এই প্রস্তাব এইখানে এই

* (১৭) S. M. Mitra : *Indian Problems* (London, 1908, pp. 165-66).

* (১৮) S. N. Banerjea: *A Nation in Making* (London, 3rd Impression, 1927, p. 184).

আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর ১৮৯৬ সনে এই বিষয়ে আবার আলোচনা সুরু হয়। তৎকালীন আসামের চীফ্ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্তির জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেন। ওয়ার্ডের পরে আসামের কমিশনার নিযুক্ত হন স্যার হেনরী কটন। ভারত সরকার কটনকে ওয়ার্ড প্রস্তাবের সারবত্তা জিজ্ঞাসা করলে হেনরী ঐ প্রস্তাবকে অবিবেচনার ফল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তবে লুসাই পাহাড়কে আসামের অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন ও সেই মত কার্যকরী করা হয়।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের অনুকূলে পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ১৯০১ সালে। মধ্যপ্রদেশের চীফ্ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার তাঁর এক সরকারী পত্রে উড়িষ্যাকে বাংলা দেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাব তোলেন। বড়লাট লর্ড কার্জনও শাসনকার্যের সুবিধার্থে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এর পর স্যার এনড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হয়ে ১৯০৩ সালের প্রথমভাগে বঙ্গবিভাগের একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল ভারত সরকারের সেক্রেটারী রিজ্‌লী স্বাক্ষরিত বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর রিজ্‌লী স্বাক্ষরিত এক পত্রে বাংলা গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রস্তাব করা হয় যে, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে সংযুক্ত হোক্। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে এক তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের অধিবাসিগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠে—দুই মাসের মধ্যে প্রায় ৫০০ সভা ক'রে সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদের মধ্যে পশ্চিম বাংলারও সক্রিয় অংশ ছিল। প্রতিবাদের প্রচণ্ড বেগ লক্ষ্য ক'রে বড়লাট লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গে সফর দিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪)। স্বীয় মতের সপক্ষে পূ[illegible]কে, অনুগামী করবার আশায় তিনি ভ্রান্ত যুক্তি, ভয়, প্রলোভন যুগপৎ প্রদর্শন করেন। পূর্ববঙ্গ সফরের সময় কার্জন বঙ্গের

বঙ্গচ্ছেদের এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তা হলো ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও দার্জিলিং ব্যতীত রাজসাহী বিভাগ একত্র ক'রে এক ছোটলাটের অধীনে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ সংগঠন* (১৯)। পূর্ববঙ্গবাসীর মনোভাব লক্ষ্য ক'রে কার্জন নিরাশ হন। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর কার্জনকে নানাভাবে আপ্যায়িত করলেও বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেন। এই সময় কলিকাতায় যে আন্দোলন দেখা দেয় তাতে নব-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন (৫২।৪, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা) আশুতোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক স্মরণীয় অংশ গ্রহণ করে। ১৯০৪ সনের ১৮ই মার্চ সমস্ত বাংলার প্রতিনিধিগণ কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। "এমন সভা কেহ কখনও দেখে নাই। টাউন হলের দ্বিতলে সমস্ত লোকের স্থান না হওয়াতে একতলে দ্বিতীয় সভা করিতে হইয়াছিল।...পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন" (১৩ই জুলাই, ১৯০৫ সনের "সঞ্জীবনী" পত্রের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। নেতৃবৃন্দ সভার শেষে এক যুক্তিপূর্ণ আবেদনপত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। সরকার নিরুত্তর থাকায় এদেশবাসী মনে করে যে, বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনা বুঝি পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সে আশা যে কতদূর ভ্রান্ত তা অচিরেই বুঝা গেল।

স্যার হেনরী কটন আগাগোড়াই ছিলেন ভারতীয় জনমতের উপর শ্রদ্ধাশীল ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। ১৯০৪ সনের ৫ই এপ্রিল বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তিনি প্রকাশ্যভাবে বঙ্গভঙ্গ

*** (১৯) *Vide* Henry Cotton's Speech as Chairman at the Calcutta Town Hall Meeting (January 1905, as incorporated in Prithwis Chandra Roy's *The Case against the Break-up of Bengal* (Cal., Sept., 1905, Appendix B).**

প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। সেই সমালোচনা শুধু শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই ছিল না, তা বহুলাংশে বাঙালী ও আসামী স্থানীয় মনোভাবের উপরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমালোচনা প্রসঙ্গে হেনরী কটন লেখেন:—

"The idea of the severance of the oldest and most populous and wealthy portion of Bengal and the division of its people into two arbitrary sections has given such a shock to the Bengalee race, and has roused such a feeling amongst them as was never known before. The idea of being severed from their own brethren, friends and relations and thrown in with a backward province like Assam, which in administrative, linguistic, social and ethnological features widely differs from Bengal, is so intolerable to the people of the affected tracts that public meetings have been held in almost every town and market-place in East Bengal, and the separation scheme has been universally and unanimously condemned" * (20).

১৯০৪ সনের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক অবস্থা মোটের উপর প্রশান্ত থাকে। নূতন আলোড়ন দেখা দেয় নবেম্বর মাসে। ঐ সময় (নবেম্বর, ১৯০৪) এলাহাবাদের সুবিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'পাইওনিয়ার' প্রচার করে যে, "সমস্ত পূর্ববঙ্গ এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমস্ত উত্তর বঙ্গ, মালদহ ও আসাম" সহ এক নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। সরকারের অভিপ্রায় জানবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সভ্যগণ প্রশ্ন

* (২০) *Vide* Romesh Chandra Dutt's *Paper Cuttings*, Vol. II. 1903—1906 as preserved in the *Bangiya Sahitya Parishad*, Calcutta.

উত্থাপন করেন (ডিসেম্বর, ১৯০৪—জানুয়ারী, ১৯০৫)। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সরল উত্তর দেওয়া হয় নি। ১৯০৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বম্বেতে কংগ্রেস অধিবেশনকালে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ স্যার হেনরীর অধিনায়কত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করেন। ১৯০৫ সনের ১০ই জানুয়ারী বাংলার প্রতিনিধিগণ পুনরায় কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভায় মিলিত হন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্যার হেনরী কটন। সরকারী প্রস্তাবকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়। তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। ঐ সভা সরকারের নিকট এই মর্মে নিবেদন জানায় যে, যদি গভর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে কোন নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকেন, তবে ভারতসচিবের কাছে তা পাঠানোর পূর্বে যেন এদেশবাসীর অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই আবেদনে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করেনি।

ঐ বৎসরের মে মাসে বিলাতের বিখ্যাত ‘ষ্ট্যাণ্ডার্ড’ পত্রিকা প্রকাশ করে যে, ভারতসচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। এই সংবাদ সত্য কি না জানবার জন্য তৎক্ষণাৎ ভারত থেকে ইংলণ্ডে টেলিগ্রাম করা হয়। পার্লামেণ্টের সভ্য হার্বার্ট রবার্টস্ ভারতসচিবকে প্রশ্ন করলে ভারতসচিব উত্তরে বলেন যে, উক্ত প্রস্তাব তখনও বিবেচনাধীন রয়েছে * (২১)। বাংলার নেতৃবৃন্দ ভারতসচিবের নিকট তৎক্ষণাৎ দুই তিন লক্ষ লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন-পত্র প্রেরণের তোড়জোড় করেন। মাত্র ৫০।৬০ হাজার লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ হতে না হতেই রয়টার এদেশে টেলিগ্রাম করে সংবাদ দেয় যে, ভারতসচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে সম্মতি দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় “ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া” পুস্তকে (কলিকাতা, ১৯৪২—পৃঃ ৮৫) লিখেছেন: “১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই সংবাদপত্রে ঘোষিত হইল যে ভারতসচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করিয়াছেন।” বিবরণটি

* (২১) ‘সঞ্জীবনী,’ ১৩ই জুলাই, ১৯০৫ : প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সঠিক নয়। রয়টার প্রেরিত এই সংবাদ কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ দিনের 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকেও "বঙ্গের সর্ব্বনাশ" শীর্ষক শিরোনামায় এই সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল। উক্ত দিবসেই ৬০।৭০ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র বিলাতে ভারত-সচিবের নিকট প্রেরিত হয় ও বিলাতের ভারতবন্ধুদিগের নিকট ইংলণ্ডের পত্রিকাসমূহে বাঙালী জাতির গভীর অসন্তোষ প্রকাশের জন্য টেলিগ্রাম পাঠান হয়।

৭ই জুলাই শুক্রবার সিমলা থেকে সংবাদ আসে যে, আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও দার্জিলিং ব্যতীত সমস্ত রাজসাহী বিভাগ একত্রে "পূর্ব বাংলা ও আসাম" নামে এক নূতন প্রদেশে গঠিত হবে ও সেই প্রদেশের শাসনভার একজন স্বতন্ত্র ছোটলাটের উপর ন্যস্ত থাকবে। এই প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা ও রেভিনিউ বোর্ড স্থাপিত হবে। আপাততঃ এই প্রদেশ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন থাকবে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে নূতন চীফ্ কোর্ট স্থাপিত হবে। এই নবপ্রদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে ঢাকা শহরে।

৮ই জুলাই শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Council-এর) অধিবেশনকালে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ মজুমদার ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী নিজ নিজ বক্তৃতায় অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভূপেন বসু বাংলার ছোটলাট এন্‌ড্রু ফ্রেজারকে সম্বোধন করে বলেন, "মোগল বা পাঠান প্রভুত্বের সময়ে আমাদের জাতির এমন সর্বনাশ হয় নাই। আমাদের পক্ষে এমন বিপদ আর কখনও হয় নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্রে আমাদিগকে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আমলে আমরা সেই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছি।" ঐ দিনই আবার অপরাহ্নে ৩ ঘটিকায় ও ৬ ঘটিকায় কলিকাতায় দুই বিভিন্ন স্থানে দুই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিনিধিগণ তীব্রতেজে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে

যাবার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন * (২২)।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর "A Nation in Making" গ্রন্থে (পৃ: ১৮৬—৮৭) লিখেছেন: "The revised scheme was conceived in secret, and settled in secret, without the slightest hint to the public." সংগোপনে নির্ধারিত হয়েছে বলেই বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব প্রকাশিত হলে এদেশবাসীর মনে ক্ষোভের মাত্রা তীব্রতর হয়ে ওঠে। ৮ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাকালে অম্বিকাচরণ মজুমদারও বলেন:

"Sir, even the worst criminal has a right to be furnished with a copy of his indictment before he is condemned; but the Government have decided the fate of over 30 millions of His Majesty's innocent subjects even without a hearing" (২৩).

১৩ই জুলাই, ১৯০৫ সনে সঞ্জীবনী "আন্দোলনে উপেক্ষা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে: "লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে দ্বিতীয় আয়র্লণ্ড করিবেন। বঙ্গদেশ চিরদিন রাজভক্ত, বাঙালী চিরদিন নিরীহ, শিষ্ট, শান্ত ও আইনানুগত। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন যে বিষম শাল বাঙালীর প্রাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার যাতনায় বাঙালী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। বঙ্গদেশে মহা অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন বাঙালীর আন্দোলন উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এই উপেক্ষার ফল শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। বাঙালী নীরবে কখনও থাকিবে না।" ঐ দিনই সঞ্জীবনী "কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ" শীর্ষক আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মারফৎ সমগ্রভাবে বিদেশী বর্জনের জন্য জাতির কাছে আহ্বান উপস্থিত করে। সঞ্জীবনী লেখে:

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের

* (২২) 'সঞ্জীবনী', ১৩ই জুলাই, ১৯০৫: দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (২৩) **Prithwis Chandra Roy**: *The Case against the Break-up of Bengal.*

ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ বন্ধ হইবে। বাঙালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার জন্য মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে ততদিন তপশ্চর্য্যা করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী-দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতে পারিবে না।

"জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না।

"যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের আমোদে কেহ যোগ দিতে পারিবে না।"

এ হলো যেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সামগ্রিক বয়কট-যুদ্ধ ঘোষণা। বয়কটের মন্ত্র প্রচারে কৃষ্ণকুমার মিত্র অন্যতম প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, বয়কট-দর্শনের উৎপত্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা বা চেষ্টার ফল নয়। বাঙালী জাতির দীর্ঘদিনের ইংরেজ শাসন ও শোষণের পরিবেশে মানসিক ক্রমবিকাশের ফল। সমগ্র জাতির মনে বহুদিন ধ'রে ইংরেজের অবহেলা ও অবমাননার ফলে যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ভিতরে ভিতরে পুঞ্জিত হয়ে ওঠে, তারই অন্যতম বাহ্য প্রকাশ বয়কট-দর্শন—ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতার দর্শন। কোনো বিশিষ্ট নেতার নিছক প্রচারের ফলে এ-মনোভাব ও এ-দর্শন জন্মলাভ করেনি। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ***"A Nation in Making"*** গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৯) অবস্থার সঠিক বর্ণনাই দিয়েছেন যেখানে তিনি লিখেছেন :

"The teacher or the preacher may incite, but he cannot

create the nursing-ground from which the revolutionary draws his inspiration and support. The writings of the pamphleteers would have fallen upon barren soil, if the condition in France, political and economic, had not prepared men's minds for the acceptance of revolutionary ideas."

অবশ্য নেতৃত্ব বা প্রচারের গুরুত্ব কোনো আন্দোলনেই অস্বীকার করা চলে না। অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত অসন্তোষরাশিকে সংগঠন ও সক্রিয় করে তোলার দায়িত্ব অধিনায়কের। "It is the strength and competence of the *personnel* in the propaganda, i. e. the organizing capacity of the intellectuals, that constitutes the real soul and apology of revolutions"*(২৪)। "বয়কট" মন্ত্র প্রচারে কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও মতিলাল ঘোষ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন নিজ নিজ পত্রিকা মারফৎ। ১৩ই জুলাই "সঞ্জীবনী" যে 'বয়কট' ফতোয়া জারি করে, তাতে সর্বপ্রথম সাড়া দেয় বাগেরহাটের জনসাধারণ। ১৬ই জুলাই, রবিবার, ১৯০৫ সনে বাগেরহাটের জনসাধারণ স্থানীয় প্রবীণ উকিল দেবীবর চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক প্রকাশ্য সভায় "সঞ্জীবনী" নির্ধারিত বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবক বিহারীলাল রায় (উকিল) এই মর্মে ১৭ তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে যে পত্র লেখেন, তা "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিকে ২০শে জুলাই সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়।

১৬ই জুলাই অপরাহ্নে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বাংলার জননায়কগণ পাথুরিয়া ঘাটায়

* (২৪) **Benoy Kumar Sarkar:** ***The Futurism of Young Asia*** **(Leipzig, 1922, pp. 179-180)**

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রাজবাড়ীতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হন*(২৫)। উক্ত সভায় স্যার হেনরী কটনও উপস্থিত ছিলেন*(২৬)। মহারাজা স্বয়ং বড়লাট ও ভারতসচিবকে টেলিগ্রাম করে অনুরোধ জানান বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব স্থগিত রাখার জন্য। এর পর প্রায় প্রত্যহই 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান' বা ভারত-সভার গৃহে ও মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুরের বাড়ীতে নেতৃবর্গের সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতাতেই এইরূপ সভা ও সমালোচনা সীমাবদ্ধ ছিল না—বাংলার জেলায় জেলায় প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯শে জুলাই, ১৯০৫ সনে ভারত সরকার সিমলায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে*(২৭)। ২০শে জুলাই সিমলা থেকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক চূড়ান্ত প্রস্তাব বিশদভাবে প্রকাশ করা হয় ও ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগের দিন ধার্য হয়েছে। বাঙালী জাতির তুমুল আন্দোলন সত্ত্বেও ভারত সরকারের বঙ্গচ্ছেদ বিষয়ে অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে সমগ্র জাতি এই দুঃসংবাদ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"The announcement fell like a bomb-shell upon an astonished public...We felt that we had been insulted, humiliated and tricked. We felt that the whole of our future was at stake, and that it was a deliberate blow aimed at the growing solidarity and self-consciousness of the Bengalee-speaking population. Originally intended to meet administrative reqirements, we felt

* (২৫) 'সঞ্জীবনী', ২০শে জুলাই, ১৯০৫ : প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (২৬) *A Nation in Making*, p. 188

* (২৭) Vide : *Government Resolution on the Partition of Bengal* (Simla, July 19, 1905) as incorporated in *The Case against the Break-up of Bengal* (Calcutta, Sept. 1905).

that it had drawn to itself a political flavour and complexion, and if allowed to be passed, it would be fatal to our political progress and to that close union between Hindus and Mohamedans upon which the prospects of Indian advancement so largely depended" (*A Nation in Making*, p. 188).

২০শে জুলাইয়ের দুঃসংবাদ ঘোষিত হবার পরই জাতির অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—বাংলার শহরে মফঃস্বলে প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয়। ২০শে জুলাই তারিখেই আবার 'সঞ্জীবনী' মারফৎ কৃষ্ণকুমার মিত্র বিদেশী পণ্য বর্জন এবং ত্যাগ স্বীকার ক'রেও স্বদেশীদ্রব্যের ব্যবহারের জন্য এক "প্রতিজ্ঞাপত্র" প্রকাশ করেন। ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল নিম্নরূপ : "আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইতে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকারের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকে এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পের সহায় হউন।" ২১শে জুলাই শুক্রবার দিনাজপুরের জনসাধারণ স্থানীয় মহারাজার পৌরোহিত্যে এক প্রতিবাদ-সভার অনুষ্ঠান করে। প্রধান বক্তা ছিলেন ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ। তিনি জনসাধারণের কাছে সামগ্রিক "বয়কট" যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান*(২৮)। এই সময় বাংলার জেলায় জেলায় প্রতিবাদ-সভায় বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকে। ২৩শে জুলাই পাবনার জনসাধারণ তাঁতিবন্দের জমিদার জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক প্রকাশ্য সভায় স্বদেশের নামে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করে*(২৯)। জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, মাগুরা,

* (২৮) 'সঞ্জীবনী', ২৭শে জুলাই, ১৯০৫

* (২৯) 'সঞ্জীবনী', ৩রা আগষ্ট, ১৯০৫

বগুড়া, যশোহর, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ প্রতিবাদ-সভা জুলাই মাসের শেষদিকে অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে কলিকাতায় নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে প্রাত্যহিক সম্মেলনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করতে থাকেন। পরিশেষে সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর বাড়ীতে এক সভায় সার্বজনিকভাবে "বয়কট" প্রস্তাব গ্রহণ, প্রচার ও প্রয়োগের সপক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেতৃবর্গ ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউনহলে জাতীয় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। বাংলার সকল জেলা থেকে প্রতিনিধিগণকে এই সভায় উপস্থিত হবার জন্য আহ্বান করা হয়।

বাংলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট এক বিশেষ স্মরণীয় তারিখ। এই দিনই কলিকাতার টাউনহলে সমগ্র বাঙালী জাতির নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন ঘোষণা করেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় সভার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল। মধ্যাহ্ন হতে না হতেই সহস্র সহস্র যুবক ও ছাত্র কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হয় এবং রমাকান্ত রায় প্রমুখ নেতার পরিচালনায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে টাউনহলের অভিমুখে অগ্রসর হয়। টাউনহল লোকে লোকারণ্য। দোতলায় তিলার্ধ স্থান না থাকায় একতলায় আর এক সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেও তিলার্ধ স্থান না থাকায় সম্মুখস্থ বিস্তৃত ময়দানে তৃতীয় সভার অনুষ্ঠান হয়। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সমগ্র আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। এমন অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, জাতীয় ঐক্য ও চেতনাবোধ ইতঃপূর্বে আর কখনো এদেশে এমন প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় নি * (৩০)। এই বৈপ্লবিক উদ্দীপনার পরিবেশে সভার কাজ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় সুরু হয়। টাউনহলের দোতলার মূল সভায় পৌরোহিত্য করেন কাশীমবাজারের মহারাজা

* (৩০) সার্বজনিক সভায় "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র বোধ হয় ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ সনেই প্রথম ব্যবহৃত ও উচ্চারিত হয়েছিল।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, একতলার সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আর ময়দানের সভায় পৌরোহিত্য করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রের বৃদ্ধ সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ সেন বিদেশী দ্রব্য বর্জন সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠ করেন। অবিসংবাদিতভাবে সেই বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইভাবে বাঙালী জাতি বয়কট অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। এই সভার বিবরণ ৭ই আগষ্ট সোমবার রাত্রিতেই ইংলণ্ডে পৌঁছে ও পরদিন প্রত্যুষে বিলাতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। মঙ্গলবার পার্লামেণ্টের অধিবেশনকালে মিঃ হার্বার্ট রবার্টস্ বলেন: "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের হুকুম বাহির হওয়াতে বঙ্গদেশে অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয় আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেণ্টের অন্য সমস্ত আলোচনা স্থগিত থাকুক।" মিঃ রবার্টসের এই গুরুতর প্রস্তাব নিয়ে পার্লামেণ্টে ঐদিন এক তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হয়। মিঃ রবার্টস বলেন যে শুধু গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীদের মতানুসারে বঙ্গবিভাগ অনুচিত—এবিষয়ে বাঙালী জাতির মনোভাব সকলের আগে গ্রাহ্য * (৩১)। শুধু রবার্টস বা কটন নয়, এদেশেও অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে বঙ্গবিভাগের চূড়ান্ত সংবাদ ঘোষিত হলে এদেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি উত্থাপন করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালীন 'ইংলিশম্যান', 'ষ্টেটস্‌ম্যান', 'পাইওনিয়ার' প্রভৃতি পত্র এবিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিল। বিলাতের সুবিখ্যাত 'টাইম্‌স' পত্রিকায়ও জুলাইয়ের শেষের দিকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা প্রকাশিত হয় *(৩২)। এতৎসত্ত্বেও ভারতসরকারের

* (৩১) 'সঞ্জীবনী', ১৭ই আগষ্ট, ১৯০৫: প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (৩২) ১৯০৫ সনের ৩রা আগষ্ট "সঞ্জীবনী" পত্রে "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—বাঙ্গালী জাতির শক্তি নাশ" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে "সঞ্জীবনী" লেখে:

"টাইমস ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্র চিরদিনই লর্ড কার্জনের প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। লর্ড কার্জন এক সময়ে টাইম্‌সের একজন লেখক ছিলেন। বঙ্গের

মনোভাব অটল থাকে। তাই নিরস্ত্র বাঙালী জাতি নিরুপায় অবস্থায় 'বয়কট' অস্ত্র গ্রহণ করে প্রতিকারের শেষ অমোঘ উপায় হিসাবে।

৭ই আগস্টের সার্বজনিক সভার পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বয়কট-তরঙ্গ প্রবল বন্যার বেগে সমগ্র দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় ১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় সিমলা থেকে তারযোগে কলিকাতায় সংবাদ আসে যে, গভর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ঘোষণাপত্র ঐদিন 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশ করেছেন। ২রা সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতার পত্রিকাসমূহে এই সংবাদ প্রচারিত হয়। কার্জনের ঐ ঘোষণাপত্রে বলা হয়: (ক) ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অনুষ্ঠিত হবে; (খ) নূতন প্রদেশের নাম হবে 'ইষ্টার্ণ বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম'; (গ) আসামের বর্তমান চীফ কমিশনার

অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে টাইম্‌সে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের কয়েক ছত্র আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

'When Lord Curzon in 1901, separated the North-West Frontier Porvince from the Punjab the opposition to his proposal was mainly official. His action regarding Bengal has met with much more opposition of a different description, As matters at present stand, Assam contains scarcely three millions of Bengali-speaking population, whilst there are nearly 41 millions in Bengal who use that language. The effect of the new division of the province will be to split the Bengali population into two great sections, the larger of which will be under the newly constituted government, and to abolish the numerical preponderance hitherto enjoyed by the race in the greatest Indian province. The centre of Bengali interest, prosperity and political aspirations is in Calcutta, and it is impossible not to sympathize with the repugnance of their leaders for an arrangement which thus divides them under two separate governments.''

ব্যাম্‌ফাইল্ড ফুলার হবেন ঐ নূতন প্রদেশের প্রথম ছোটলাট ও (ঘ) এই নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ জেলা এবং আসাম * (৩৩)। সমগ্রজাতির সংঘবদ্ধ মতামতকে উপেক্ষা করে এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হলো। তারপর নূতন তেজ ও শক্তি নিয়ে বাঙালীর আন্দোলন ব্যাপকতর হতে লাগলো। প্রত্যক্ষদর্শী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: "বাংলার নিহিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করিল। কবি, বক্তা, চিত্রকর, সংবাদপত্রসেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা—যিনি যেরূপে পারিলেন, মাতৃসেবায়—মহাযজ্ঞে যোগ দিলেন। বাংলা তখন জাগিয়াছে। তাহার নূতন মূর্তি—সেই তেজে দীপ্ত—সংকল্পে দৃঢ় মূর্তি দেখিয়া বাঙালীর ও বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননি
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে!"*(৩৪)

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন বাংলার জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন বিশেষ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাদেশিকতার এমন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ভারতীয় ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নি। ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষ্যে ১৮৮৩ সনে এদেশে যে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়, স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতার সামনে তাও যেন তলিয়ে গেল। ১৯০৫-এর অন্দোলন শুধু কলিকাতা বা এমন কি বাংলার শহরে-মফঃস্বলেই সীমিত

* (৩৩) 'সঞ্জীবনী', ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

* (৩৪) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ: 'কংগ্রেস' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২৮, পৃঃ ১১১-১১৩)

ছিল না, এর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বম্বে প্রেসিডেন্সী, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ইত্যাদি অঞ্চলেও শ্রুত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে রক্ষিত দলিলে এর স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়।

৭ই আগষ্ট ১৯০৫ সনে কলিকাতার টাউন হলের সভায় স্বদেশী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক জন্মের অব্যবহিত পরেই বাংলার যুব সম্প্রদায় এই আন্দোলনে ক্রমশই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকে। "সঞ্জীবনী" পত্রে ৩রা আগষ্ট, ১৯০৫ সনে "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও ছাত্রদল" শিরোনামায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে :

"অঙ্গচ্ছেদের হুকুম প্রকাশ হওয়ার পর বঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে মহা উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

"যতদিন অঙ্গচ্ছেদের হুকুম রহিত না হয়, ততদিন ছাত্রমণ্ডলী চারি প্রতিজ্ঞায় আপনাদিগকে আবদ্ধ করিতেছেন।

"১ম প্রতিজ্ঞা।—যে সকল দ্রব্য স্বদেশে উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডজাত সে সকল দ্রব্য স্বয়ং ব্যবহার করিব না। অন্যকে সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিবৃত্ত করিব।

"২য় প্রতিজ্ঞা।—কোন প্রকাশ্য আমোদ প্রমোদে স্বয়ং যোগ দিব না, অন্যকেও এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

"৩য় প্রতিজ্ঞা।—অঙ্গচ্ছেদের হুকুম রহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থদান করিব।

"৪র্থ প্রতিজ্ঞা।—যতদিন জন্মভূমি পুনর্মিলিত না হয়, ততদিন শোকচিহ্ন ধারণ করিব।"

ছাত্রসমাজের সাগ্রহ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে আন্দোলনের তীব্রতা ও গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শহরে-মফঃস্বলে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রবলভাবে জনমত গঠিত হতে থাকে। নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও [illegible]তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারেন নি। বাংলার কয়কট আন্দোলনকে

জোরালো করবার উদ্দেশ্যে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তিই প্রদর্শিত হলো না, ধর্মের আশ্রয়ও গ্রহণ করা হলো। 'সন্ধ্যা', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকা বারংবার ঘোষণা করলো যে, বিলাতী লবণ ও চিনির মধ্যে শূয়োর ও গরুর হাড় অতি-সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত থাকে এবং তা ব্যবহার করলে এদেশবাসীর জাত ও ধর্ম বিনষ্ট হবে। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণ স্বদেশী আদর্শ প্রচারের নিমিত্ত তাঁদের দুইজন প্রতিনিধিকেও নিযুক্ত করেন। সুদূর পুরী শহরেও উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে একসভায় পুরীর একশত ভ্রাম্যমাণ সাধু ও শ্রমণ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা সারা ভারতে স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করবেন। ১৯০৫ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক কলিকাতায় কালীঘাটের মন্দিরের সামনে বিলাতী দ্রব্য ও বিলাতী সংশ্রব বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং ঐ উপলক্ষ্যে দেবীর উদ্দেশে বিশেষ পূজা ও হোমের অনুষ্ঠান সাধিত হয়। এইভাবে বাংলার জেলায় জেলায় বয়কট-স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করে। গোয়েন্দাবিভাগের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ৭ই আগষ্টের পর অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র বাংলা দেশে, এমনকি বাংলার বাইরেও ইংরেজ শাসন ও পণ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝড় বইতে থাকে। ফলে, বাংলার শহরে-মফঃস্বলে বিলাতী পণ্যের বিক্রয় লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। ১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা "ষ্টেটস্‌ম্যানে" প্রকাশিত এক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, পূর্ব বৎসরের তুলনায় ঐ বৎসর বিলাতী বস্ত্রের বিক্রয় কত শোচনীয়ভাবে পড়ে গেছে। ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বরে যেখানে যশোহর জেলায় বিক্রীত বিলাতী বস্ত্রের মূল্য ছিল ৩০,০০০ টাকা, ১৯০৫-এর সেপ্টেম্বরে তা ২,০০০ টাকায় এসে দাঁড়ায়। বগুড়া, ঢাকা, আরা, হাজারিবাগ, নদীয়া, মালদা, বর্দ্ধমান জেলায়ও ঐ একই দৃশ্য নজরে পড়ে। বিলাতী পণ্য বিক্রয়ের সবচেয়ে ভয়াবহ পতন ঘটে বরিশালে ও কুমিল্লায়। সমগ্র বাখরগঞ্জ জেলায় মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে বয়কট আন্দোলন যেভাবে সুগঠিত হয়েছিল, বাংলার অন্য কোন জেলায় তেমনটি আর দেখা যায় নি।

বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যুক্তপ্রদেশের ২৩টি জেলা থেকে, মধ্যপ্রদেশের ১৫টি জেলা থেকে, বম্বে প্রেসিডেন্সীর ২৪টি জেলা থেকে, পাঞ্জাবের ২০টি জেলা থেকে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ১৩টি জেলা থেকে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রগতির সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বাংলার বাইরে যেখানে-যেখানে বয়কট-স্বদেশী আন্দোলন লক্ষণীয় আকার ধারণ করে, সেখানে-সেখানে বাঙালীরাই প্রথমে সরকার-বিরোধী কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। উকিলী পেশার লোকেরা ও ছাত্রগণ সর্বত্রই এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আর এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় রেখা পড়ে বম্বে প্রেসিডেন্সীতে ও পাঞ্জাবে। বাল গঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রায় অবাঙালীদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন, আর বাঙালী মনস্বীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। বস্তুত, স্বদেশী আন্দোলনকে এক সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনে রূপ দিয়েছিলেন লাল-বাল-পাল এই তিন প্রতিনিধি-পুরুষ। এই সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের রাষ্ট্রিক সাধনাও সগৌরবে উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী আন্দোলন মূলত বাঙালীর সৃষ্টি। এই আন্দোলনের মধ্যে বাঙালীর ত্যাগ, তপস্যা ও সাধনা ছিল অতুলনীয়। স্বাদেশিকতার স্বপ্নে, ভাবে ও কর্মে তখন বাংলাই ছিল ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য। তৎকালে গোখ্‌লে যে বলেছিলেন, আজ বাংলার যা স্বপ্ন, তাই হবে আগামী কাল ভারতের ধ্যান—একথা সে সময় বাংলার পক্ষে বস্তুতই প্রযোজ্য ছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাংলার অতুলনীয় দানের বিষয়ে ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বেনারসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে গোখ্‌লে ও লাজপত রায়ের ভাষণেও সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়। লাজপত রায় সেসময় বলেছিলেন : **"We are perfectly justified in trying to become arbiters of our destiny and in trying to obtain freedom. I think the people of Bengal ought to be congratulated on being leaders**

of that march in the van of progress...And if the people of India will just learn that lesson from the people of Bengal, I think the struggle is not hopeless" * (৩৪ক) অর্থাৎ "আমাদের নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ও স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা তা সম্পূর্ণভাবেই সমর্থনীয়। আমি মনে করি উন্নতির এই বিজয় অভিযানে বাংলার নেতৃত্বের জন্য বাংলা সকলেরই ধন্যবাদার্হ।...ভারতবাসিগণ যদি বাংলার কাছ থেকে এই নবমন্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক বলে মনে হয় না।"

১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে সরকারী প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই সময় বাংলার শহরে-মফঃস্বলে ছাত্রদলনের ধূম পড়ে যায়। আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ও তীব্র গতিবেগ লক্ষ্য করে একদিকে যেমন ইংরেজ বণিক সমাজ ও তাদের তাঁবেদারেরা শঙ্কিত হয়, ইংরেজ সরকারও তেমনি ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১০ই অক্টোবর বাংলা সরকার ছাত্রদলনের উদ্দেশ্যে কুখ্যাত ও গোপন কার্লাইল সার্কুলার জারি করে। ছাত্র-সমাজকে রাজনৈতিক সভা বা বক্তৃতা থেকে ও পিকেটিং থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাই ছিল এই সার্কুলারের উদ্দেশ্য। বাংলার জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট উক্ত সরকারী সার্কুলার প্রেরিত হয় ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আবার সেই মর্মে সরকারী আদেশ স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষমণ্ডলীর নিকট প্রেরণ করেন। ২২শে অক্টোবর কলিকাতার 'ষ্টেট্সম্যান' পত্রিকায় এই কুখ্যাত সার্কুলারের ধারাগুলি প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ সমগ্র শহরে ও ক্রমে সমগ্র বাংলা দেশে তীব্র অশান্তি প্রজ্বলিত করে। কার্লাইল সার্কুলারের প্রথম কোপ পড়ে রংপুর জেলা স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উপরে। স্বদেশী সভায় যোগদান ও পথ দিয়ে চলতে চলতে 'বন্দেমাতারম্' মন্ত্র উচ্চারণের অপরাধে ঐ দুই বিদ্যালয়ের প্রায় দেড়শ ছাত্রকে ৫৲ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে বহিষ্কারের

* (৩৪ক) বর্তমান লেখকদের *India's Fight For Freedom* গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১২৫-২৬ দ্রষ্টব্য।

আদেশ জারি করা হয়। প্রথিতযশা উকিল স্বর্গত উমেশচন্দ্র গুপ্তের নেতৃত্বে রংপুরের জননায়কগণ সরকারের এই অপমান-জনক ও মনুষ্যত্বনাশক নীতির তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নির্যাতিত ছাত্রদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম বাস্তব মূর্তি হলো রংপুরের জাতীয় বিদ্যালয়। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রংপুরবাসীদের উন্নতির পথে এই দৃঢ় পদক্ষেপ এক গৌরবজনক কীর্তি। "বৈঠকে" বিনয় সরকার বলেছেন: "রংপুর হচ্ছে বাংলার শিক্ষা-স্বরাজের প্রবর্তক। সেখানকার উকিলেরা এই আন্দোলনের জন্য যারপরনাই উঁচু-দরের সৎসাহস আর স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছিলেন।"

বাংলা সরকারের কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে এই সময়েই আবার কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় "অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি" (৪ঠা নবেম্বর, ১৯০৫)। ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও জাপান-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার রমাকান্ত রায় ছিলেন এই সোসাইটির প্রাণ। সোসাইটির জন্ম হয়েছিল মূলত রাষ্ট্রিক কারণে—সরকারী সার্কুলারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এর কর্মধারা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রসার লাভ করে। জাতীয় শিক্ষার আদর্শকে প্রচণ্ড জাতীয় দাবিতে রূপান্তরিত করতে এই সোসাইটির কর্মিবৃন্দ বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। আর সেই দাবিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য তৎকালে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ডন সোসাইটি।

বস্তুত, অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব থেকেই ডন সোসাইটির ছাত্রগণ স্বদেশী শিক্ষার দাবি উত্থাপন করে। ১৯০৫ সনের নবেম্বর মাসে সরকারী নির্যাতনের মাত্রা পূর্বের থেকে বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুকূলে দেশের মধ্যে এক প্রচণ্ড জনমত গড়ে ওঠে। এমন সময় কলিকাতার সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে এক লক্ষ ও পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ কলিকাতায়

'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' গঠিত হয় ও আগষ্ট মাসে এর পরিচালনায় 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯০৫ সনের শেষদিকে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলার জননায়কগণের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। সরকারী কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও ষোলকলায়পূর্ণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আন্তরিক সমর্থন সুরেন্দ্রনাথ দিতে না পারায় তিনি ক্রমশই জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রিক অদর্শ নিয়েও ধীরে ধীরে বিরোধ দেখা দেয়। ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের ভেতর এই বিরোধ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসনের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে তৎকালে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের নাম দেওয়া হলো "মডারেট্" বা নরমপন্থী, আর যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো ভেঙে ফেলে ভারতের জন্য কামনা করেছিলেন পূর্ণ স্বরাজ, তাঁদের নাম হলো চরমপন্থী বা "ন্যাশন্যালিষ্ট"। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ফিরোজ শা মেটা, গোখ্‌লে প্রভৃতি ছিলেন নরমপন্থী বা মডারেট দলের নেতা ; বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী বা নব্যজাতীয়তাবাদী দলের নায়ক। মডারেট রাজনীতিকগণ ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শে ছিলেন সন্তুষ্ট। নব্যজাতীয়তাবাদীর দল দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশ শাসনে সংযুক্ত থেকে ভারতের যথার্থ কল্যাণ অসম্ভব। তাঁরা ভারতের জন্য চাইলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। তাছাড়া, মডারেটগণ ছিলেন আবেদন-নিবেদনের নীতি অনুসরণকারী। চরমপন্থী রাজনীতিকগণ জাতীয় মুক্তির জন্য এ পথকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে অস্বীকার করলেন। তাঁদের বিচারে নিরস্ত্র ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের অমোঘ অস্ত্র হলো আত্মশক্তির দ্বারা জাতীয় মুক্তির চেষ্টা আর সেই সঙ্গে "নিরস্ত্র প্রতিরোধ" * (৩৫) আন্দো-

* (৩৫) "**Passive resistance**"-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে অনেক লেখকই আজকাল "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" পরিভাষা প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু এই প্রয়োগ বিভ্রান্তিকর। বিপিনচন্দ্র পাল স্বদেশী যুগে "**Passive resistance**"-এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যেও টা

লনের সংঘবদ্ধ সুপ্রয়োগ। ১৯০৬ সনে স্বদেশী আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে আন্দোলনের আদি কারণ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন তলিয়ে যায়, ভারতের রাষ্ট্রিক চেতনায় প্রধান হয়ে ওঠে বাংলায় তথা ভারতের অন্য কোথাও বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল থাকা বিধিসঙ্গত কিনা। ভারতবাসীর সম্মুখে স্বরাজ-আদর্শ প্রচারের নিমিত্ত এই সময় যে দুটি নূতন সংবাদ-পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তার একটি হলো বাংলা "যুগান্তর", আর দ্বিতীয়টি হলো ইংরেজী "বন্দেমাতরম্"। "যুগান্তর" পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক, স্থাপিত হয় ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে, আর "বন্দেমাতারম্" ছিল দৈনিক পত্রিকা, প্রতিষ্ঠিত হয় ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে। উভয়েরই লক্ষ্য ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন, কিন্তু পথ ছিল ভিন্ন। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের মুক্তি এই ছিল "যুগান্তরের" চিহ্নিত পথ, আর "বন্দেমাতরমের" নির্দেশিত পথ হলো নিরস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি। উভয় পত্রিকার সঙ্গেই অরবিন্দের আত্মিক সংযোগ ছিল অতি-নিবিড়। অরবিন্দ কোনদিনই নিরামিশ জাতীয় রাজনীতির অনুগামী ছিলেন না। তবে "বন্দেমাতরম্" পত্রের সম্পাদক হিসাবে তিনি আইনানুমোদিত নিরস্ত্র অসহযোগ বা প্রতিরোধ আন্দোলনের একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন * (৩৬)।

হলো "Not non-active but non-aggressive" অর্থাৎ ওর মূল প্রকৃতি হলো অনাক্রমণাত্মক, কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়। তাই মনে হয় "নিরস্ত্র প্রতিরোধ" পরিভাষার প্রয়োগই বেশী যুক্তি-সঙ্গত।

* (৩৬) এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকদের *Bande Mataram and Indian Nationalism* (Cal., 1957) ও *Sri Aurobindo's Political Thought* (Cal., 1958) গ্রন্থদ্বয় এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ" (কলিকাতা, ১৯৫৬) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

স্বদেশী আন্দোলন

ও

বাংলার নবযুগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা

"বাংলার ঐক্য"

স্বদেশী আন্দোলনে যে কয়টি ভাবধারার বিবর্তন ঘটে, তা ১৯০৬ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে উজ্জলভাবে পরিস্ফুট। বাংলার ঐক্য, বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজ,—এই পঞ্চ আদর্শ ছিল তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রাণ।

কার্জন-ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির যে সুদৃঢ় ও ব্যাপক আন্দোলন তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবকে ব্যর্থ করা এবং বাংলার ঐক্য ও সংহতিকে সংরক্ষণ করা। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর মাসে রিজ্‌লী পত্র প্রকাশিত হবার পর থেকে বাংলাদেশে যে রাষ্ট্রিক আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, তাতে প্রধানত বা একমাত্র চিন্তা বা আদর্শই ছিল জাতীয় ঐক্যের সংরক্ষণ। ১৯০৫ এর ১৯শে জুলাই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক চূড়ান্ত পরিকল্পনা সিমলা থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এর পরেই বঙ্গভঙ্গ- বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা ও গতিবেগ সহসা পূর্বের থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কলিকাতায় ৭ই আগষ্ট টাউনহলে যে "বয়কট" প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তারও মূল কারণ হিসাবে অঙ্গচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রত্যাহার-দাবিই সজোরে উচ্চারিত হয়। ১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত কল্পিত মিলন-মন্দিরের সভায় ঐ আদর্শ আরও জোরের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল।

"বয়কট"

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা নিয়ে যে আন্দোলন বাংলা দেশে ১৯০৪-০৫ সনে গড়ে ওঠে, তাকে ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে। এক অসহায়,

নিরুপায় অবস্থায় নিরস্ত্র জাতি "বয়কটের" অস্ত্র হাতে গ্রহণ করে। "বয়কট" চিন্তা ১৯০৫-এর জাতীয় আন্দোলনের এক প্রকাণ্ড পরিভাষা। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রে "কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩ই জুলাই, ১৯০৫) যে "বয়কট" দর্শন প্রচারিত হয়, তা ছিল মূলত আত্মরক্ষার এক অমোঘ ব্যবস্থা। এমন কি, ৭ই আগষ্ট কলিকাতার সার্বজনিক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তারও মূল প্রকৃতি ছিল অনুরূপ। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবের গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বয়কট হলো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা—একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। এর একমাত্র লক্ষ্য হলো বাংলার অভিযোগের প্রতি বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বঙ্গভঙ্গ রদ করে ঐ অভিযোগ দূর করা হলে বয়কটও প্রত্যাহৃত হবে" * (১)।

১৯০৫-এর জুলাই-আগষ্ট মাসে যে "বয়কট" সংকল্প বাঙালী জাতি গ্রহণ করে, তার লক্ষ্য ছিল বিলাতী মাল বর্জন, বিলাতী চাকুরী বর্জন, ও বিলাতী সামাজিক সংস্রব বর্জন। কিন্তু এর মধ্যে বিলাতী পণ্য বর্জনের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান ঠাঁই পেয়েছিল। ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে বেনারস কংগ্রেসে গোখ্‌লে সভাপতির অভিভাষণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং "বয়কট"সম্বন্ধে বলেন যে, ওটা হলো নিরুপায় জাতির সর্বশেষ বিধিসঙ্গত ("legitimate") পন্থা। অনেকে তৎকালে বয়কটের ব্যবহারকে হিংসাত্মক বলে মনে করলেও বাঙালী জাতির কাছে ওটাই ছিল আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্র। আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বয়কটের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেসময়ই মন্তব্য করেন: "সরকার সমগ্র বাঙালী জাতির অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ও বয়কট করেছে। সরকারী বয়কটের পাল্টা জবাব হিসাবে জাতি গ্রহণ করেছে আর এক ধরণের বয়কট। তত্ত্বের দিক থেকে বয়কট মতবাদ যতই হিংসাত্মক মনে হোক্ না কেন,

* (১) *A Nation in Making, p. 192*

আমাদের পক্ষে এই বিশেষ অবস্থায় বয়কট দর্শন হলো জাতির আহত আত্ম-মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়"*(২)। সতীশচন্দ্র সেসময় আরও মন্তব্য করেন যে, সমানে সমানে লড়াই যেখানে সেখানে "বয়কটের" অর্থ একরূপ, আর সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগ্রামে "বয়কটের" অর্থ ভিন্ন ধরণের। ইংরেজের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির যে "বয়কট" ঘোষণা তার মধ্যে জাতিগত-বিদ্বেষ বা ইংরেজের বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিহিংসা-পরায়ণতা নেই, আছে ইংরেজ সরকারের কবল ও নিষ্পেষণ থেকে সমগ্র জাতির আহত আত্মমর্যাদা রক্ষার সুদৃঢ় প্রচেষ্টা। অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ সনের এপ্রিল মাসে "The Doctrine of Passive Resistance" সংক্রান্ত যে সকল ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যেও তিনি "বয়কট"-কে "act of hate" বলেন নি। তিনি বলেছিলেন, "বয়কট" হ'লো "an act of self-defence, of aggression for the sake of self-preservation. To call it an act of hate is to say that a man who is slowly murdered, is not justified in striking at his murderer"*(৩).

"বয়কট" দর্শনে বিলাতী মাল বর্জনের আকাঙ্ক্ষা সর্বপ্রথম ঠাঁই পেলেও এর প্রয়োগ শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ১৯০৬-০৭ সনে "বয়কটের" মর্মার্থ দাঁড়ালো বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী বিচারালয় বর্জন, বিদেশী স্কুল-কলেজ বর্জন ও বিদেশী শাসন বর্জন। এই চার-দফা বর্জন-নীতি শেষ পর্যন্ত "বয়কট" দর্শনে ঠাঁই পায়। জাতীয় স্বাধীনতার মন্ত্রপ্রচারক "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা ঘোষণা করে : "ভারতে ইংরেজ শাসনাধীনে আমাদের আর্থিক দুর্দশা, বৈদেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আমাদেরকে

* (২) "ডন ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত "The True Character of the Boycott in Bengal" প্রবন্ধটি (মে, ১৯০৬) দ্রষ্টব্য।

* (৩) *The Doctrine of Passive Resistance* (*p.* 82) পুস্তকখানির শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নিদারুণভাবে অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। তাই এক সংঘবদ্ধ ও নির্মম বৃটিশ পণ্য বর্জন-নীতি গ্রহণ করে আমরা চাই ভবিষ্যতের মত বৈদেশিক সম্পদ-শোষণকে অসম্ভব করে তুলতে। দ্বিতীয়ত, যে অবস্থায় এদেশে শিক্ষাপ্রদান করা হয়, এর ইচ্ছাকৃত দৈন্য ও দারিদ্র্য, এর বিজাতীয় প্রকৃতি, মাতৃভূমির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের অনাদর, সরকারী স্বার্থের প্রতি আনুগত্য সঞ্চারের প্রচেষ্টা—এতেও আমরা অসন্তুষ্ট। তাই সরকারী স্কুলে বা সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ে আমরা আমাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠাতে অস্বীকার করি। তৃতীয়ত, ইংরেজের বিচার পদ্ধতিতে, এর সর্বনেশে আর্থিক অপচয়ে, এর পাশবিক কঠোরতায়, এর পক্ষপাতিত্বদোষে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এর অপব্যবহারেও আমরা অসন্তুষ্ট। তাই আমরা সংঘবদ্ধ-ভাবে বিদেশী বিচারালয়গুলিকে বর্জন করতে চাই। চতুর্থত, আমরা বিদেশীর শাসনযন্ত্র পরিচালনায়, এর যথেচ্ছচারিতায়, এর নির্মম নিষ্পেষণে ও সেই নিষ্পেষণের কাজে পুলিশ শক্তির অপব্যবহারে অসন্তুষ্ট; তাই এক্ষেত্রেও আমরা সংঘবদ্ধ বর্জননীতি অবলম্বন করে যথেচ্ছচার শাসনযন্ত্রকে অকেজো করে দিতে চাই" *(৪)। অর্থাৎ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা তৎকালে "বয়কটের" যে ব্যাখ্যা প্রদান করে, তা হলো বিদেশীর বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক বর্জন-নীতির অনুসরণ। ১৯০৫-এর যুবক বাংলার "বয়কট" পরিভাষাই ১৯২০-২১ সনে গান্ধীজীর "নন্-কো-অপারেশন" বা অসহযোগ দর্শনের আত্মিক গোড়াপত্তন করেছিল * (৫)।

"স্বদেশী"

"বয়কটের" পরবর্তী ধাপ হলো "স্বদেশী"। বস্তুত, এই দুই চিন্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর্থিক স্বাদেশিকতার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিন যাবৎই

* (৪) শ্রীঅরবিন্দের *The Doctrine of Passive Resistance* (pp. ৩৫-38) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* (৫) বিনয় সরকারের *The Futurism of Young Asia* (pp. 345-51) ও *Creative India* (pp. 560-61) এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

ধীরে ধীরে জাতির অন্তরে সঞ্চারিত হতে থাকে। অন্ন-সমস্যা দিনে দিনেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ে। শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ অবলম্বন ছাড়া আর্থিক দুর্গতি মোচন যে অসম্ভব এ চিন্তাও বহুলোকের মনকে ভাবিয়ে তোলে। ফলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন, প্রচার ও প্রসারের সপক্ষে একটা আন্দোলনও দেশের ভিতরে সীমাবদ্ধ আকারে গড়ে ওঠে। ১৯০১ সনে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের অঙ্গরূপে স্বদেশজাত শিল্পের প্রদর্শনী উন্মোচনেরও বন্দোবস্ত করা হয়। স্বদেশী শিল্পের অন্যতম আদি পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর কর্মপ্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই যোগেশ চৌধুরীই স্বদেশী আন্দোলন সুরু হবার বহু পূর্বেই কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটে "ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে সকল প্রকার স্বদেশজাত দ্রব্য মজুত রাখা হতো ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাও ছিল। বড়বাজারের কে, বি, সেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর পরিচালক কুঞ্জবিহারী সেনও প্রাক্-স্বদেশী যুগে স্বদেশী বস্ত্রের এক মস্তবড় প্রচারক ছিলেন।

বিংশ শতকের সূচনায় স্বদেশী শিল্প প্রচারের কাজে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সদা-জাগ্রৎ প্রহরীর মত দণ্ডায়মান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটি" (১৯০২-০৭) প্রাক্-স্বদেশী যুগে স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবাদের এক অতি-প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় * (৬)। বর্তমান বিদ্যাসাগর

* (৬) শ্রীঅমিত সেনের "Notes on Bengal Renaissance" পুস্তকে (১ম সংস্করণ, ১৯৪৬, পৃঃ ৫১) ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ১৯০৩ সনের উল্লেখ আছে। উহা ভুল। উক্ত সোসাইটি ১৯০২ সনের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই 'ডন' পত্রিকা (১৮৯৭—১৯১৩) ঐ সোসাইটির মুখপত্র ছিল না। ১৯০৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত পত্রিকা সোসাইটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়। "Notes on Bengal Renaissance" পুস্তকের নবপ্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণেও ভুলগুলি অপরিবর্তিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, "বেঙ্গল কেমিক্যাল" প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা (পৃঃ ৫৮), রাজা সুবোধ মল্লিকের "জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে" অর্থদানের প্রতিশ্রুতি (পৃঃ ৫৮), "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" গোড়াপত্তন (পৃঃ ৫৮) প্রভৃতি বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত সনতারিখগুলিও ভ্রমাত্মক। অন্যান্য

কলেজের দোতালায় এর কার্যালয় অবস্থিত ছিল। সোসাইটির পরিচালনাধীন "স্বদেশী ষ্টোর্স" একমাত্র ১৯০৩-০৪ সনেই প্রায় ১০,০০০ টাকার মত স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে। নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে,—যেমন স্বদেশী দোকান প্রতিষ্ঠা করে, একদল প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রকে স্বদেশী ভাবে উদ্বুদ্ধ করে, শিল্প বিষয়ক বক্তৃতা ও স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে, আর সর্বোপরি 'ডন ম্যাগাজিনে' অর্থশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করে—সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটির মাধ্যমে বাংলার শহরে-মফঃস্বলে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্বেই বহু ব্যক্তির মনে আর্থিক স্বাদেশিকতার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। সেই যুগে যুবকদের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ডন সোসাইটির তুল্য দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান এদেশে আর ছিল না। বিহারের রাজেন্দ্র প্রসাদ (বর্তমান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট) সতীশচন্দ্রকে তৎকালে এক পত্রে লিখেছিলেন : "As the only institution of its kind we naturally expect much from it···The Dawn Society is a unique institution and is doing a service to the community for which it cannot be too grateful to you" (Vide *Dawn Magazine*, Nov., 1905)। এই প্রসঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে কেদারনাথ দাশগুপ্তের উৎসাহে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের" কর্ম-প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, তৎকালে বহুবাজার ও লালবাজারের সংযোগ-স্থলে আর একটি স্বদেশী শিল্পের বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। নাম "ইউনাইটেড বেঙ্গল ষ্টোর্স"। এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন আব্দুল হালিম গাজ্‌নাভি। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ১৯০৫-এর পূর্ব থেকেই স্বদেশী শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু তা

প্রসঙ্গ সম্বন্ধে ঐ পুস্তকে বহু তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তিও বর্তমান। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ" গ্রন্থে (১৯৫৬) ডন সোসাইটি সংক্রান্ত বিষয়ে বর্ণিত ঘটনাবলীও নির্ভরযোগ্য নহে।

সত্ত্বেও ১৯০৫ সনে স্বদেশজাত শিল্পের প্রতি দেশবাসীর দরদ ছিল অনেকটা লোকদেখানো ও কৃত্রিম। প্রত্যক্ষদর্শী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন: "The Swadeshi Movement, although appreciated in theory, and recognised by every intelligent, thinking Bengali as offering the only hope for Bengali salvation, still received but scant, practical support. The people seemed to sink under the weight of ancient habits and were consequently unable to shake off the stupor and translate thoughts into action."

এ হলো প্রাক্‌-১৯০৫ সনের বাস্তব অবস্থা। এমন দিনে বিধাতার রূঢ় আঘাত হিসাবে এলো কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা। জাতির লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব ও আহত মর্যাদাকে বাঁচাবার জন্য এক নব চেতনার উদ্বোধন ঘটে। যে স্বদেশী মনোভাব দীর্ঘদিন যাবৎ ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে শক্তি সঞ্চয় করছিল, তা সহসা অভূতপূর্ব আকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৯০৫ সনে। "বয়কট" দর্শনের প্রচার ও প্রয়োগ রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্যে গৃহীত হলেও আর্থিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুত, "বয়কট" আন্দোলন স্বদেশী শিল্পের ক্রমবর্ধমান গতিকে সহসা ত্বরান্বিত করে দেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ যে "স্বদেশী সমাজ" (জুলাই, ১৯০৪) প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেখানেই বোধ হয় বাঙালী জাতি "স্বদেশী" মন্ত্রের প্রথম পরিচয় পায়। কিন্তু ঐ "স্বদেশী" শব্দটা যে "একটা বিপুল পারিভাষিক শব্দে পরিণত হবে,"তা কেউই বোধ হয় তখন ভাবতে পারেনি। ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "স্বদেশী ধুয়া" শার্ষক যে প্রবন্ধ "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশ করেন, সেখানেও "স্বদেশী" শব্দ বিপ্লবী পরিভাষায় পরিণত হয় নি। এমন কি ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্টের সার্বজনিক সভায়ও "স্বদেশী" পরিভাষা সজ্ঞানে কায়েম করা হয় নি। প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার বলেন যে, বোধ হয় ৭ই আগষ্টের "কয়েকদিন পরে সুরেন ব্যানার্জির 'বেঙ্গলী' দৈনিকে একটা ছোট্ট সম্পাদকীয়

দেখলাম। সেই টিপ্পনীর নাম ছিল 'দি স্বদেশী মুভমেণ্ট'"* (৭)। দেখতে দেখতে 'স্বদেশী' শব্দ রূপান্তরিত হলো জাতীয় আন্দোলনের এক প্রকাণ্ড পারিভাষিক হিসাবে।

স্বদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সজ্ঞান ও সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও প্রসার,—প্রয়োজন হলে ত্যাগ স্বীকার করেও,—এই মনোভাব ঠাঁই পেয়েছিল 'স্বদেশী' পরিভাষায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিন বাঙালী জাতি স্বদেশী শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে। 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'ডন', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'সন্ধ্যা', 'বরিশাল হিতৈষী' ইত্যাদি পত্রিকা দেশের সর্বত্র স্বদেশী ভাব প্রচারের কাজে এক অপূর্ব ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করে। বিলাতী কাপড়, বিলাতী চিনি, বিলাতী লবণ ইত্যাদি বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী কাপড় ও শিল্পসম্ভার ব্যবহারের জন্য দেশের সর্বত্র প্রবল আন্দোলন দৃষ্ট হয়। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ইংরেজ বণিক সমাজে ও ইংল্যাণ্ডে কি ভীষণভাবে দেখা দেয় তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহে—যেমন 'বেঙ্গলী', 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ', 'স্টেট্‌স্‌ম্যান্' প্রভৃতি পত্রে—আজও বর্তমান। স্বদেশী আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—শহরে-মফঃস্বলে জনসাধারণের জীবনেও ইহা বিস্তৃত ছিল। এই আন্দোলনে মুসলমান সমাজের আত্মিক সাড়াও যে বড় কম ছিল, তা মনে করলে নিতান্ত ভুল করা হবে। তৎকালীন মুসলমান সমাজ থেকে স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল নেতা আবির্ভূত হন, তাঁদের মধ্যে আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল হালিম গাজ্‌নাভী, ইয়ুসুফ খান বাহাদুর, মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাখরগঞ্জ জেলায় "জারীগানের" মধ্য দিয়ে আলম, আকুব্বর, মফেজদ্দি প্রমুখ ব্যক্তি তৎকালে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্যভাবে স্বদেশী ভাব প্রচার করেন।

* (৭) "বিনয় সরকারের বৈঠকে", ২য় সংস্করণ, ১ম ভাগ, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৩৫৬

১৯০৫-০৬ সনে বাঙালী জাতি "স্বদেশী" পারিভাষিকে শুধু আর্থিক স্বাদেশিকতাই বুঝেনি। জাতির স্বদেশ-প্রাণ এই পরিভাষার মধ্যে মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম জনক ও অধিনায়ক সতীশচন্দ্র তাই লিখেছিলেন: "The Swadeshi Movement is thus a movement which is patriotic in the first instance and only economic or industrial in the second" * (৮)। ১৯০৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "জাতীয় শিক্ষা" বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনকালে যে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন, সেখানেও "স্বদেশী" শব্দ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯০৮ সনের ১৪ই জুন তারিখে "বন্দেমাতরম্" পত্রে (সাপ্তাহিক সংস্করণে) বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর "The Bed-Rock of Indian Nationalism" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন শুধু একটা আর্থিক বা রাষ্ট্রিক আন্দোলন নয়। এর পেছনে আছে একটা অত্যুচ্চ আদর্শবাদ যার লক্ষ্য শুধু আর্থিক স্বরাজ বা রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নয়—যার মূল লক্ষ্য এরও উপরে, ভারতীয় নরনারীর পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন * (৯)। স্বদেশী আন্দোলনের এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বোধ হয় গোখ্‌লেই বেনারস কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯০৫ সনে) তৎপ্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে প্রথম উল্লেখ করেন।

"জাতীয় শিক্ষা"

১৯০৫-এর জাতীয় আন্দোলনে যে কয়টি ভাবধারার বিবর্তন ঘটে, তন্মধ্যে "বাংলার সংহতি", "বয়কট" ও "স্বদেশীর" পাশে "জাতীয় শিক্ষার" আদর্শও

* (৮) "ডন ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত সতীশচন্দ্রের "The True Character of the Swadeshi in Bengal" (May, 1906) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

* (৯) এই প্রসঙ্গে লেখকদের *Bande Mataram and Indian Nationalism* পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য। স্বদেশী যুগে "বন্দেমাতরম্" পত্রে প্রথম প্রকাশিত ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ লিখিত বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ উক্ত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

ছিল উল্লেখযোগ্য। সুপ্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার অসারতা ও ব্যর্থতার ফলে দেশবাসীর মনে বহুদিন থেকে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে থাকে, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন তারই স্বাভাবিক পরিণতি।

ঊনবিংশ শতকে এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, তার ত্রুটি ছিল বহুবিধ। প্রথমত, এ শিক্ষা ছিল একান্তভাবেই পুঁথিগত। বিদ্যার সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ ছিল যৎকিঞ্চিৎ। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাশক্তি স্ফুরণের চেয়ে সেই বিদ্যাশিক্ষার আবহাওয়ায় বড় ঠাঁই পেতো কোনো রকমে পরীক্ষা-পাশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ। যে পরিমাণে শক্তি ও সময় ব্যয়িত হতো, সে পরিমাণে বিদ্যাশিক্ষা হতো না, আর যেটুকুও বা বিদ্যাশিক্ষা হতো, তা জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হতো না। দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্যবহারিক বা কারিগরী শিক্ষাদানের কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী ও সম্মান লাভের পরেও শিক্ষার্থীদের সাংসারিক ক্ষেত্রে বরণ করতে হতো নিদারুণ আর্থিক নৈরাশ্য। তৃতীয়ত, এই শিক্ষা স্বদেশ-প্রীতি বা জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে সহায়তা না করে বরং ছাত্রদের মনে বিজাতীয় ও বিদেশীয় ভাবের প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ সৃষ্টি করতো। বিদেশী শাসনযন্ত্র পরিচালনার উপযোগী ও সহায়ক ইংরেজের অনুগত এক কেরাণীগোষ্ঠী সৃষ্টি করাই ছিল এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য—সত্যকার মনুষ্যত্বের বিকাশ বা স্বদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে অনুরাগ জন্মানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে আমাদের দেশে যে জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ দেখা দেয়, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষায় তার স্বাভাবিক সাড়া ছিল যৎসামান্য। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ইংরেজী শিক্ষার আওতায় যাঁরা গড়ে উঠ্ছে, তাদের মনে না আছে নিয়মানুবর্তিতা, না আছে ধর্মভাব, না আছে তৃপ্তির স্বস্তি। এ শিক্ষার প্রভাবে যে কেরাণীর দল ক্রমবর্দ্ধমান হারে বেড়ে চলেছে, সরকারের সকল চাকুরীর দুয়ার তাদের সম্মুখে খুলে ধরলেও তাদের সন্তুষ্ট করা যাবে না।

এদিকে ইংরেজী শিক্ষায় লালিত ও পুষ্ট যে সম্প্রদায় তার সঙ্গে জন-

স্বদেশী আন্দোলন
ও
বাংলার নবযুগ
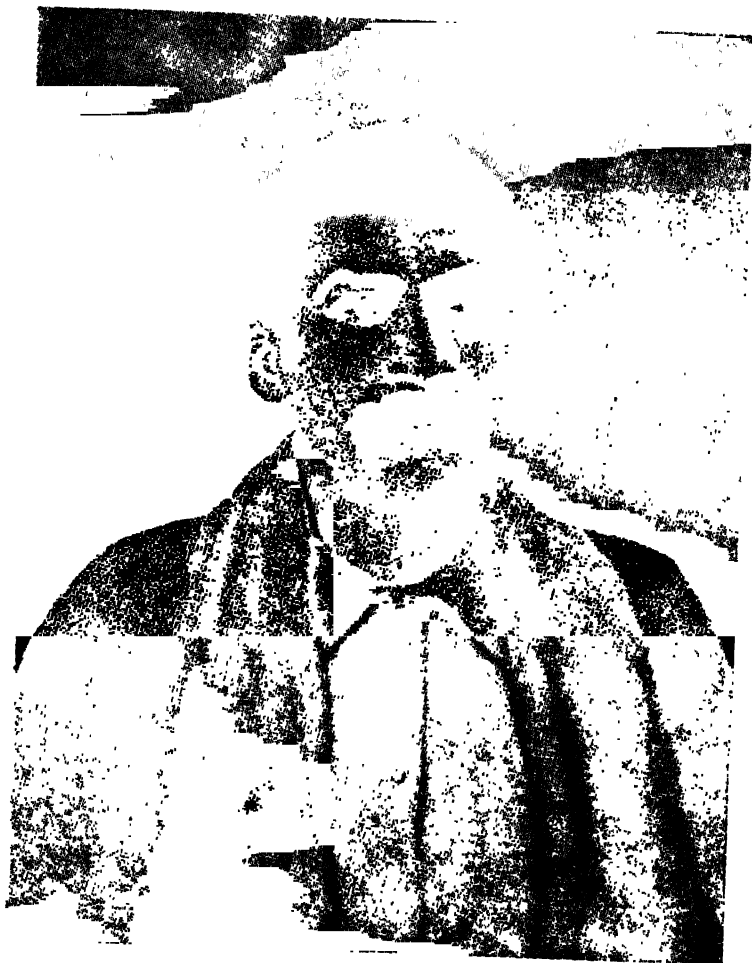
অরবিন্দ ঘোষ

সাধারণের সৃষ্টি হয় এক দারুণ ব্যবধান। ইংরেজী শিক্ষার পূর্বে এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল, সরকারী নীতির ফলে তা উপেক্ষিত ও ক্রমে অবলুপ্ত হ'তে থাকে ; অথচ তৎপরিবর্তে জনসাধারণকে নূতন আলো দেবার ব্যবস্থাও এদেশে দেখা দিল না। এর পরিণতি হয় এই যে, জনসাধারণের জীবন থেকে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বহুদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারী শিক্ষা-নীতির এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সম্পর্কে আমাদের দেশে যে কয়জন মনীষী গত শতকের শেষভাগেই গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকেন, তাঁদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির নাম প্রথমেই স্মরণীয়। স্যার র‍্যালে পরিচালিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাজকর্ম সুরু হলে (জানুয়ারী-জুন, ১৯০২) এই চিন্তানায়কগণ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এই বিশিষ্ট পরিবেশে প্রকাশিত হয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'A Note of Dissent', ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'Note on University Reform' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ('নিউ ইণ্ডিয়া', মার্চ-মে, ১৯০২), বিপিন পালের 'The Revised Scheme of Primary Education in Bengal' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ('নিউ ইণ্ডিয়া', ১৯০২) এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'An Examination into the Present System of University Education and a Scheme of Reform' শীর্ষক সুদীর্ঘ রচনা* (১০)। সতীশচন্দ্র 'জাতীয় শিক্ষা'র এই আকাঙ্ক্ষা কেবল লেখালেখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, একে বাস্তবে সার্থক রূপদানেরও প্রচেষ্টা করেছিলেন ডন সোসাইটি স্থাপন করে (জুলাই, ১৯০২)। বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার ত্রুটিগুলি দূর করে ছাত্রগণকে ব্যবহারিক শিক্ষাদান,

* (১০) এই প্রবন্ধটি ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে ১৯০২ সনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল। পরে 'ডন' মাসিকের তিন সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন ১৯০২) উহা ছাপা হয়।

তাদের নৈতিক চরিত্র-গঠন ও তাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করাই ছিল এই সোসাইটির মূল লক্ষ্য। এক কথায় ডন সোসাইটি ছিল সরকারী শিক্ষার পরিপূরক স্বদেশ-সেবার কর্মশালা। ১৯০৫-এর রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পরিবেশে জাতীয় শিক্ষার যে আন্দোলন আনুসঙ্গিকভাবে দেখা দেয়, তার আত্মিক পূর্বপুরুষ হলো এই ডন সোসাইটি। ১৯০২-০৫ এর মধ্যে প্রায় শ' পাঁচেক যুবক এই সোসাইটিতে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয় ও নূতন নূতন চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। ডন সোসাইটির ছাত্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছেন: "ডন সোসাইটি ও সতীশচন্দ্র মুখার্জীর সান্নিধ্যে আসায় আমার অন্তরে যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাই আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত করে" ('যুগান্তর', ৬ই নবেম্বর, ১৯৫৭)। মনীষী বিনয় সরকারও লিখেছেন, ডন সোসাইটি ও "সতীশবাবুর আবহাওয়ায় পড়েছিলাম বলে জীবন ধন্য হয়েছে।" ডন সোসাইটিতে যে সকল কৃতবিদ্য তরুণ শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরাই অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নিষ্ঠাবান কর্মী ও সেবকরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হলে দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্লাবন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। বিলাতী পণ্য বয়কটের সংকল্প গৃহীত হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের দাবিও উচ্চারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন এম. এ. পরীক্ষা বয়কট দাঁড়িয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কটের প্রথম ধাপ। এই বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলনে ডন সোসাইটির ছাত্রগণই ছিলেন বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী। মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ডন সোসাইটির সতীশ মুখার্জী ও এটর্ণী হীরেন দত্ত। সে সময় হীরেন দত্ত একদিন এম. এ. পরীক্ষার্থীদের এক সভায় বলেছিলেন: "ভাঙ্গো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কায়েম করো স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়। আমি তার হব চাকর।...শ্যামের বাঁশরী বেজেছে। গোপিনীরা যে যেখানে আছে সেখান থেকেই ছুটে আসবে"* (১১)। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার যে আন্দোলন এভাবে দেখা

*(১১) 'বিনয় সরকারের বৈঠকে', পৃঃ ৩১৪।

দেয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৫) সরকারের ছাত্র-নির্যাতন নীতির ফলে তা আরও পরিপুষ্টি লাভ করে। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির ছাত্রগণ এই সময় আবার জাতীয় শিক্ষার দাবিতে ইন্ধন জোগাতে থাকে। উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলদীঘীর গোলামখানা" আখ্যা প্রদান করে।

ছাত্রদলনের প্রথম আগুন জ্বলে ওঠে রংপুরে (অক্টোবর-নবেম্বর, ১৯০৫)। দুটি বিদ্যালয় থেকে শতাধিক ছাত্রের বহিষ্কারের আদেশ জারী হয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় কায়েম হলো রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় (৮ই নবেম্বর, ১৯০৫)। এই সকল ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে দারুণ সমস্যা সেদিন জাতির সামনে উপস্থিত হয়, তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নেতৃবর্গ স্থাপন করলেন কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১১ই মার্চ, ১৯০৬) নামক বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। আর এই পরিষদের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হলো "দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ এণ্ড স্কুল" (১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬)। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই জাতীয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। বস্তুত, যে মনস্বীর অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে, তিনিই হলেন ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র। "দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ" ছাড়াও বাংলাদেশে ও ভারতের নানা প্রান্তে সে সময় বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে দিন বাংলাদেশে এমন কোনো নেতা প্রায় ছিলেন না যিনি এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যোগদান করেন নি। অ-বাঙালী নেতাদের মধ্যে তিলক ও লাজপত রায় জাতীয় শিক্ষার পূর্ণ সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কলিকাতায় ন্যাশন্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যে আবেগের ভাষায় অভিব্যক্ত করেছিলেন, তা আজও আমাদের মনে সম্মোহন সৃষ্টি করে। "আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়ার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালীর মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয়,

বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয় বিদ্যা-ব্যবস্থা আকার গ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালীর হৃদয়ের ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন…আমাদের বহু দিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে।…

"অনেক দিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিত লাভ অছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে, তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

"আমি আপনাদের কাছে সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলা দেশে যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যেন আমরা না ভুলি।…আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে—আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি"* (১২)।

'জাতীয় শিক্ষা' পরিভাষায় স্বদেশী আন্দোলনের এক বিপুল আকাঙ্ক্ষা মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীনে যে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তার মূল বিষয় হলো জাতীয় স্বার্থে ও জাতীয় কর্তৃত্বে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা—"To impart Education—Literary as well as Scientific and Technical—on National Lines and exclusively under National Control." এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, জাতীয় শিক্ষা

* (১২) "ডন ম্যাগাজিনের" সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৬ সনের সংখ্যাটি দ্রষ্টব্য।

পরিষদ হলো যথার্থ বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। এর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোনো বিভাগের কোনো সম্পর্ক ছিল না—সাংস্কৃতিক স্বরাজের কর্মকেন্দ্র হিসাবেই এর জন্ম। জাতীয় শিক্ষার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো—টেকনিক্যাল শিক্ষার সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। প্রাথমিক বিভাগ থেকে ম্যাট্রিকের সমান ক্লাশ পর্যন্ত (Fifth Standard Class) এই ব্যবস্থার জের চলেছিল। এমন কি কলেজ বিভাগেও টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় বিশেষত্ব হলো—স্কুল বিভাগে ভাষা, সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাগুলির সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। এর চতুর্থ বিশেষত্ব ছিল কলেজ বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যে শিক্ষাদান ও গবেষণার বন্দোবস্ত। পঞ্চম বিশেষত্ব হলো—কলেজ বিভাগে পালি, হিন্দী ও মারাঠী এবং যুগপৎ স্কুল ও কলেজ বিভাগে সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা। এছাড়া, উচ্চতর গবেষণার সুবিধার জন্য কলেজ বিভাগে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখাবারও ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কায়েম করানোর লক্ষ্য ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সপ্তম বিশেষত্ব। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলো স্কুল বিভাগের নিম্নতম শ্রেণী থেকে কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সবকিছু শেখাবার জন্য বাংলা ভাষাকেই বাধ্যতামূলক ও সার্বজনিক বাহন হিসাবে গ্রহণ। ইংরেজী ছিল বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা। শিক্ষা পরিষদের আর একটি লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব কম পরীক্ষা গ্রহণ ও যথাসম্ভব কম সময়ে নিম্নতম হ'তে পরিষদের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত (এম. এ. ক্লাসের সমান) শিক্ষা প্রদান। প্রাইমারী বিভাগে ছিল তিন বছরের কোর্স, মাধ্যমিক বিভাগে সাত বছরের কোর্স (প্রথম পাঁচ বছরের কোর্স ছিল ম্যাট্রিকের সমান ও পরের দুই বছরের কোর্স ছিল আই. এ. ও আই. এস্‌সি. ক্লাসের সমান) এবং কলেজ বিভাগে চার বছরের কোর্স (বি. এ. অনার্স ও এম. এ. ক্লাসের সমান ক্লাস)। প্রত্যেক বিভাগের পাঠ সমাপ্ত হলে একবার

ক'রে জাতীয় পরিষদের পরিচালনায় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। তবে প্রথম প্রথম কয়েক বছর ম্যাট্রিকের সমান ক্লাসের শিক্ষান্তেও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এছাড়া, পরিষদের আবহাওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে—বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, নীতি-শাস্ত্র, শিল্প, কলা ইত্যাদি বিষয়ে—গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র-গঠনও এই শিক্ষা-প্রণালীর আর একটি উল্লেখযোগ্য আদর্শ। মোটের উপর, ছাত্রদের সত্যকার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, তাদের মনে যথার্থ জ্ঞান-স্পৃহা সঞ্চার এবং জাতীয় চেতনার পূর্ণ বিকাশই ছিল এই 'জাতীয় শিক্ষার' গোড়ার কথা। পরিষদ-প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ন্যাশন্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসে (১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬ সনে) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, এই শিক্ষার এক প্রধান লক্ষ্য : "to train students intellectually and morally so as to mould their character according to the highest national ideals; and on its technical side, to train them so as to qualify them for developing the natural resources of the country and increasing its material wealth". এই বিশেষত্বগুলির কথা এক সঙ্গে চিন্তা করলে স্বদেশী যুগের শিক্ষা-বিপ্লবের মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক পুরাদস্তুর যুগান্তর সাধিত হয়। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে পরিষদ-প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষার সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হলে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে এক অভিনব গুরুত্ব লাভ করে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রস্তাবটি এই মর্মে গৃহীত হয় যে, "That in the opinion of the Congress the time has arrived for people all over the country earnestly to take up the question of National Education for both boys and girls and organise a system of education—Literary, Scientific and Technical—

suited to the requirement of the country on national lines and under national control."

পরবর্তীকালে কোনো কোনো লেখক ও গবেষক স্বদেশী যুগের 'জাতীয় শিক্ষার' আদর্শকে প্রগতিবিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মের কুসংস্কারগুলি পুনরুদ্ধারই নাকি এই 'জাতীয় শিক্ষা'র লক্ষ্য এরূপ মন্তব্যও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। সমালোচকদের এরূপ মতামত যে কিরূপ ভ্রান্ত, জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলির কথা চিন্তা করলেই তা সহজে প্রতীয়মান হয়। ১৯০৫-০৬ সনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐরূপ প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের কোথাও চালু ছিল না। স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় জাতীয় শিক্ষার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯০৭-১৪ সনে প্রদত্ত আশুতোষের কনভোকেশান্ বক্তৃতাগুলি পড়লেই এবিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনা যে কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তা জানা যায়। স্বতন্ত্র বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগীয় পঠন-পাঠন ও উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের উদ্বোধন, পালি, পারসী, হিন্দী, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত, নিম্নতম শ্রেণী হ'তে বি. এ. পাস পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের রীতি, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের পরিচালনায় বিদ্যালয় বিভাগেও টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রচলন এবং পরিশেষে নবপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টা জাতীয় পরিষদ্ প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষার সাফল্যই ঘোষণা করে।

(৫)

"স্বরাজ"

স্বদেশী আন্দোলনের পঞ্চম আদর্শ ছিল 'স্বরাজ'। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বয়কট-স্বদেশীর মন্ত্র উচ্চারণ করে যে জাতীয় আন্দোলন প্রথমে দেখা দেয়, তার মধ্যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৯০৬

সনের ভারতীয় রাষ্ট্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ কালে 'লণ্ডন টাইম্‌সে'র ভারতীয় সংবাদদাতা ভ্যালেনটাইন চিরোল মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলার ভৌগোলিক সংহতি রক্ষার চেয়েও আজ বড় প্রশ্ন জাতির সাম্‌নে দেখা দিয়েছে: আর তা হলো, বাংলা তথা ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হবে কিনা সে প্রশ্ন। ভারতে ইংরেজ শাসনের নৈতিক বৈধতায় ভারতবাসীর এ জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ অভিনব।

১৯০৫-০৬ সনের পূর্বে বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে মুক্তভারতের আদর্শ তৎকালীন রাজনীতিবিদ্‌দের চেতনায় ঠাঁই পায় নি। উনবিংশ শতকের শেষভাগে, এমন কি বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও, ভারতে ইংরেজ শাসনের নৈতিক অধিকারে আস্থাপোষণ ছিল এদেশবাসীর স্বভাবধর্ম। বৃটিশ শাসনের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী নেতাগণ তখন আন্দোলন চালাতেন। আবেদনের সহজ পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল তাঁদের দস্তুর। ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি নিয়ে করুণা ভিক্ষার গ্লানি ও লজ্জা তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে। ১৯০২ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান। তিনি বলেছিলেন, "We plead for the permanence of British Rule in India." এমন কি, স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম চরমপন্থী নেতা বিপিন চন্দ্র পালও প্রাক্-১৯০৫ সনে অনুরূপ মতই পোষণ করতেন। বিপিন পালের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রকাশের সময় থেকেই (১২ই আগষ্ট, ১৯০১) তাঁর বিপ্লবী রাষ্ট্রদর্শন প্রচারিত হ'তে থাকে। উক্তি ভুল। ১৯০১ সনে 'নিউ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিক প্রথম প্রকাশের দিন বিপিন পাল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করে যে প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সম্পর্কীয় সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যার উপরে স্থান দিয়েছিলেন।

তিনি লিখেছিলেন : "And though never wishing to ignore any question, whether political, social or religious, affecting the interests of New India, we desire to make a persistent agitation of our present-day economic and educational problems, our speciality"*(১৩). আবার ১৯০২ সনে স্যার হেনরী কটনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছিলেন, ভারতবাসী যে এদেশে ইংরেজ শাসনকে "irrevocable necessity" বলে মেনে নিয়েছে, তার কারণ ইংরেজ জাতি এদেশের অনেক উপকার সাধন করেছে ('নিউ ইণ্ডিয়া', ৭ই আগষ্ট, ১৯০২—'Loyalty in India' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ঐ বছরেই কলিকাতায় প্রথম শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায়ও বিপিন পাল অনুরূপ মন্তব্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, "And we are loyal, because we believe in the workings of the Divine Providence in our national history···And as long as Britain remains at heart true and faithful to her sacred trust, her statesmen and politicians need fear no harm from the upheaval of national life in India, of which this movement, and movements of its kind, are such hopeful signs" ('নিউ ইণ্ডিয়া', ২৬শে জুন, ১৯০২) অর্থাৎ "আমরা যে ইংরেজের প্রতি অনুগত তার কারণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আমরা ঈশ্বরের বিধানে বিশ্বাস করি; এবং যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ জাতি তার উপর ন্যস্ত এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন

* (১৩) কিন্তু ১৯০৬—০৮ সনে চরমপন্থী দলের রাষ্ট্রিক আদর্শ ছিল ঠিক বিপরীত। 'Political freedom is the very life-breath of a nation; to attempt social reform, educational reform, industrial expansion, the moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom is the very height of ignorance and futility'. (শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত *The Doctrine of Passive Resistance* গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য)।

থাকবে, সে পর্যন্ত আমাদের কোনো আন্দোলন থেকে ইংরেজ রাজনীতিকদের ভয় পাবার কিছুমাত্র কারণ নেই"*(১৪)।

কিন্তু এই সার্বজনিক ভারতীয় দৃষ্টির আমূল পরিবর্তন ঘটে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। কংগ্রেস-পরিচালিত রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা যে ইতঃপূর্বে হয় নি তা নয়। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বনের মন্ত্র ইতঃপূর্বেই প্রচার করেছিলেন। আরও জোরের সঙ্গে কংগ্রেসী নীতির সমালোচনা করেছেন অরবিন্দ ঘোষ ১৮৯৩-৯৪ সনে 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত "নিউ ল্যাম্পস্ ফর্ ওল্ড্" ও "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে। "নিউ ল্যাম্পস্ ফর্ ওল্ড্" প্রবন্ধমালার প্রথমটিতে (৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩) অরবিন্দ লিখেছিলেন: "আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। দুই বৎসর পূর্বে (১৮৯১ সনে) তা আমি করতে পারতাম না। আমি তখন কংগ্রেসের অনুরক্ত ছিলাম।···কিন্তু এক অন্ধ যদি আর এক অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়েই গর্তে পড়ে—এই আশঙ্কায় আমি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য লেখনী ধারণ করেছি।" অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেন: "মিঃ ফিরোজ শা' যেটা আদালতে ওকালতি করার পদ্ধতি কংগ্রেস সভায় আমদানী করেছেন। কংগ্রেস যে আমাদের একত্রে বসে কাজ করতে শিখিয়েছে, তা ঠিক নয়।

* (১৪) উদ্ধৃত অংশটি বিপিন পালের *Swadeshi and Swaraj* (1954) গ্রন্থে সন্নিবেশিত The Shivaji Festival—II শীর্ষক বক্তৃতার শেষাংশ। বক্তৃতাটি প্রথমে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশিত হয়ে পরে *The New Spirit* (১৯০৭) পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়। ১৯০৭ সনে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চরমপন্থী নেতা বিপিন পালের মডারেটিষ্ট মনোভাব ১৯০২ সনের ঐ বক্তৃতার শেষাংশে পরিস্ফুট হওয়ায় গ্রন্থকার কর্তৃক উক্ত অংশটি *The New Spirit* পুস্তকে বর্জিত হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে তৎকালে অংশটি বাদ দেওয়ার হয়ত প্রয়োজন ছিল; পরিতাপের বিষয় এই যে, ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত "স্বদেশী ও স্বরাজ" পুস্তকে উক্ত অংশটি অনুরূপভাবেই বাদ পড়েছে। তাছাড়া, প্রকাশের সন তারিখ নিয়েও উভয় বইয়েই ভুল রয়েছে—২৬শে জুলাই ১৯০২-এর পরিবর্তে ২৬শে জুন, ১৯০২ সন হবে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকদের *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* (কলিকাতা, ১৯৫৮) পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।

কংগ্রেস আমাদের একত্রে কথা বলতে শিখিয়েছে মাত্র" (দ্বিতীয় প্রবন্ধ, ২১শে আগষ্ট, ১৮৯৩)। তৃতীয় প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখেছিলেন : "কংগ্রেসের আদর্শ ভুল, কর্মপদ্ধতি ভুল, নেতারা একেবারে নেতৃত্বের অযোগ্য" (২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩)*(১৫)। ১৯০১ সনে কংগ্রেসী-নীতির সমালোচনা করে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে (১১ই নবেম্বর, ১৯০১) যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি কংগ্রেসকে "Three days' wonder"—'তিন দিনের বিস্ময়' রূপে চিহ্নিত করেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, বছরের পর বছর কয়েকটি প্রস্তাব পাশ ভিন্ন কংগ্রেস আন্দোলনের অন্য কোন লক্ষ্য নেই *(১৬)। কিন্তু এই জাতীয় সুর তখন পর্যন্ত ছিল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা নেতা বিশেষদের সমালোচনা মাত্র।

পক্ষান্তরে, ১৯০৫-এর আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক রূপান্তরিত অবস্থা যখন জাতির প্রাণে জেগে উঠেছে এক নূতন উন্মাদনা,এক নূতন ভাবুকতা। সেই আবেষ্টনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সুরু হলো এক অভিনব সংগ্রাম। বাংলার সেই অভিনব উদ্দীপনা লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—"তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী।" তিনি আরও গাইলেন—

* (১৫) শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" (১৯৫৬, পৃ ৬৩-৮৪) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

* (১৬) হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখেছিলেন : "It is only when November opens into December that the 'leaders' are seen busy collecting subscriptions and enlisting volunteers···They vanish with the 'three days' wonder' and the enthusiasts of one year are, as a rule, nowhere the next···Nothing has been done to make the Congress ideas filter down to the masses. The peasants are as ignorant of the parrot cry of politics to-day as they were before the birth of the Congress," পত্রখানির শেষে 'নিউ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক পত্র-লেখকের মতামতকে যাতে পাঠকবর্গ সম্পাদকের মতামত বলে ভুল না করেন এজন্য তাঁদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

"তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে !"

সেই বিপ্লবের দিনে বাংলার সংগ্রামী মনোভাব পরিস্ফুট হলো চরমপন্থী নেতৃবর্গের কণ্ঠে ও কলমে। নূতন নূতন ভাবধারা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ ছিন্ন করে পরিপূর্ণ মুক্তির আদর্শ উজ্জ্বল মূর্তিতে দেখা দেয়। এই নব্য রাজনীতিক আদর্শ প্রচারের কাজে তৎকালে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাংলা দেশে বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায় ছিলেন সর্বপ্রধান। ১৯০৬-০৮-এর যুগে পরিপূর্ণ স্বরাজের আদর্শ খুব জোরের সঙ্গে প্রচারিত হলো বিপিন চন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিকে, (প্রধানত) অরবিন্দ-সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম্' দৈনিকে, ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রে এবং 'বিপ্লবী' যুবকদের 'যুগান্তর' পত্রিকায়। দিনের পর দিন নেতাগণ ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধিকারের আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন নিজ নিজ দৈনিকে ও সাপ্তাহিকে। কিন্তু যে-পত্রিকায় এই নূতন রাষ্ট্র-দর্শন সবচেয়ে বেশী সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রচারিত হয়েছিল, তা হলো অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা (৬ই আগষ্ট, ১৯০৬—অক্টোবর, ১৯০৮)। ১৯০৫-এর শেষাশেষি বাংলার রাষ্ট্রিক রঙ্গমঞ্চে নব্য রাজনীতিক দল (New Party) বা চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়। সেই সময় থেকেই এই দলের একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু অর্থাভাব হেতু তখনই কোনো কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। বরিশাল যজ্ঞভঙ্গের পর (এপ্রিল, ১৯০৬) নব্য রাজনীতিক দলের মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ বর্ধিত হ'লে "বিপিনচন্দ্র কাহাকেও একপ্রকার না জানাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন"* (১৭)। বিপিন পালের

* (১৭) বিপিন পালের জামাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দেবের লেখা "বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার জন্ম-বৃত্তান্ত" শীর্ষক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সুরেশবাবু ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন : "কালীঘাটের শ্রীহরিদাস হালদার ও শ্রীহট্টের শ্রীক্ষেত্রমোহন সিংহ দুই জনে ৪৫০৲ টাকা দিলেন। পত্রিকা

সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৯০৬-এর ৬ই আগষ্ট। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অরবিন্দ ঘোষ হলেন এই পত্রিকার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও পরিচালক। 'বন্দে মাতরম্' পত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক যুগান্তর সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বরাজের মন্ত্র এই পত্রিকা এত জোরের সঙ্গে প্রচার করে যে তার প্রভাব তৎকালে কম-বেশী সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি বিদেশেও অনুভূত হয়েছিল।

প্রধানতঃ এই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা তথা ভারতে নব্য রাজনীতিক দলের অভ্যুদয় ঘটে। সরকারী চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ার ঢেউ-এ চরমপন্থী রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই পুষ্ট হতে থাকে এবং ১৯০৬-০৮ সনে স্বদেশী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য পারিভাষিকে পরিণত হয়। ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আদর্শ সমগ্র দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি মডারেট নেতা দাদাভাই নৌরজীও ১৯০৬-এর কলিকাতা কংগ্রেসে 'স্বরাজের' মন্ত্র প্রচার করেন তাঁর সভাপতির ভাষণে। নৌরজী বলেছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য হ'লো "Self-government or Swaraj like that of the United Kingdom or the Colonies." নৌরজী ইংলণ্ডের মত স্বরাজের কথা বললেও তিনি আসলে

ছাপাইবার ভার নিলেন তদানীন্তন 'প্রদীপ' পত্রিকার ও ক্লাশিক প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। প্রেসের অফিস ছিল তদানীন্তন করপোরেশন ষ্ট্রীটের উপর; ওয়েল্সলী ষ্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যস্থলে বাড়িটী অবস্থিত ছিল।" ১৯০৬এর ৭ই আগষ্ট বয়কট আন্দোলনের জন্ম-তারিখে পত্রিকা প্রকাশের দিন স্থির ছিল। ইতিমধ্যে সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ৭ই আগষ্ট। "বিপিনচন্দ্রের নিজের জন্মভূমির এই সম্মিলনে উপস্থিত থাকিবার আহ্বান তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না এবং 'বন্দে মাতরমের' প্রথম সংখ্যা হাতে নিয়া ৬ই আগষ্টের প্রাতে চাট-গাঁ মেলে যাত্রা করিয়া ৭ই আগষ্টের সুরমা উপত্যকা সম্মিলনে যোগদান করিলেন।

"এই অবস্থায় দৈনিক পত্রিকার জন্ত প্রবন্ধ লিখিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে ভাবিতে হইল। ৫ই আগষ্টের বিকালে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন। অরবিন্দের স্বীকৃতি নিয়া বিপিনচন্দ্র নিশ্চিন্তমনে শ্রীহট্ট যাত্রা করিলেন।"

মডারেটদের মত ঔপনিবেশিক স্বাধীনতাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নৌরজী কল্পিত স্বরাজে বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা ভারতের যথার্থ কাম্য নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি লাভই ভারতের লক্ষ্য। তাঁরা চেয়েছিলেন "Unqualified Swaraj for India" অথবা "Entire removal of British rule from India." কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে কি সামাজিক সংস্কার, কি শিক্ষামূলক সংস্কার, কি আর্থিক প্রগতি, কি নৈতিক উন্নয়ন কোনো কিছুর চেষ্টা করা নিছক রাজনীতিক অজ্ঞতার পরিচায়ক। বৃটিশ শাসনের সততা ও ন্যায়ধর্মে যাঁরা ১৯০৫-০৬ সনের ঘটনাবলীর পরেও আস্থাবান ছিলেন, সেই নরমপন্থী রাজনীতিকদের প্রতি 'বন্দেমাতরম্' পত্রের পরিচালক-গোষ্ঠীর শ্লেষ ছিল অন্তবিহীন। ১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দেমাতরম্' পত্রে "The Coming Trial of Strength" নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তা ৩রা মে, ১৯০৮ সনে উক্ত পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণেও মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধে অরবিন্দ মডারেটদের চরিত্র ও রাষ্ট্রিক নীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—"A sort of aggregate of petitioning and self-help, loyalism and revolutionary aspirations, patriotism and self-seeking, active support of Boycott and fear of the results of Boycott, Swadeshi enthusiasm and Anglophile habit, liking for National Education and preference for Government education, such is Bengal Moderatism—a monstrosity formless, unspeakable, indefinable, without a fixed principle which it can call its own."

১৯০৫-০৮ সনে নব্য রাজনীতিক দল যে স্বরাজের আদর্শ প্রচার করেন, তার লক্ষ্য শুধু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নয়, ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের

পরিপূর্ণ উদ্বোধনই ছিল তার লক্ষ্য। ভারতের স্বাধীনতা তাঁরা কামনা করেছিলেন সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মুক্তির প্রাথমিক সোপান হিসাবে। এই বিষয়ে অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দেমাতরম্' পত্রে লিখলেন: "The return to ourselves is the cardinal feature of the national movement. It is national not only in the sense of political assertion against the domination of foreigners, but in the sense of a return upon our old national individuality"* (১৮)। বিপিন পালও তাঁর "The Bed-Rock of Indian Nationalism" প্রবন্ধে একই মন্ত্র প্রচার করেন। তিনি বললেন, ভারতের জাতীয় আন্দোলন কেবলমাত্র আর্থিক বা রাষ্ট্রিক আন্দোলন নয়। এর লক্ষ্য আরও মহৎ, উদ্দেশ্য আরও বৃহৎ। তিনি এই আন্দোলনকে 'আধ্যাত্মিক আন্দোলন' ('spiritual movement') বলে চিহ্নিত করেছিলেন* (১৯)।

স্বরাজ ভারতের কাম্য, কিন্তু সেই স্বরাজ আসবে কোন পথে? নব্য রাজনীতিক দল দীর্ঘদিন অনুসৃত আবেদন-নিবেদনের পথ বর্জন করে সন্ত্রাসবাদের পথ না মাড়িয়েও এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন। তা হলো অসহযোগ বা বয়কট বা নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথ। এর মর্মকথা হলো ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে চালাতে হবে সর্বাঙ্গীণ অসহযোগ। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এই নূতন দর্শনের নাম দিয়েছিলেন 'Doctrine of Passive Resistance' বা নিরস্ত্র (নিষ্ক্রিয় নয়) প্রতিরোধ নীতি। নিরস্ত্র ও অসহায় ভারতবাসীর পক্ষে প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ শাসকের সঙ্গে সামরিক অভিযানে জয়লাভের

* (১৮) 'বন্দেমাতরম্' সাপ্তাহিক সংস্করণ, ১৯শে এপ্রিল, ১৯০৮ সনের সংখ্যাটি দ্রষ্টব্য।

* (১৯) বর্তমান লেখকদের *Bande Mataram and Indian Nationalism* (কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃষ্ঠাঃ ৮৮-৯৬) পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।

আশা দুরাশামাত্র। এই গভীর সত্য উপলব্ধি করেই তাঁরা নিরস্ত্র ও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী জাতির সামনে উপস্থাপিত করেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে হলে চাই জনসাধারণের ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রামী মনোভাব। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠনের আবেদন তাই নব্য রাজনীতিক দলের নেতারা জানালেন বারংবার। কেবল 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' বলে চীৎকার করলেই স্বরাজ এসে দেখা দেবে না। স্বরাজ লাভের পূর্বে স্বরাজকামী মানুষ সৃষ্টি প্রয়োজন। নির্ভীক ও স্বার্থত্যাগী সৈনিক ছাড়া স্বাধীনতা-যুদ্ধ ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করেই মহত্তম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। ১৯০৭-০৮ সনে যখন দেশের ভিতরে সরকারী নির্যাতন উত্তরোত্তর বেড়ে চলে ও জাতির মনে দ্বিধা, সংশয় দেখা দেয়, তখন বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের অগ্নিগর্ভ বাণী জাতীয় জীবনে এক নূতন আশা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে* (২০)। ১৯০৭ সনে বিপিন পাল মাদ্রাজে যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, তার ফলে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত নব্য রাজনীতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল* (২১)।

নিরস্ত্র প্রতিরোধের পাশাপাশি আর একটি বিশিষ্ট ধারাও স্বদেশী আন্দোলনে লক্ষণীয় ছিল, তা হলো সন্ত্রাসবাদের অভিব্যক্তি। সন্ত্রাসবাদের অর্থ সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। বাংলা দেশে তৎকালে সন্ত্রাসবাদের প্রধান প্রচারকদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ কর্মবীরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বিপ্লবী যুবকদেরই মুখপত্র ছিল বাংলা 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক (১৯০৬—১৯০৮)। সন্ত্রাসবাদের আদর্শ এই পত্রিকায় প্রচারিত হতো। ১৯০৭ সনে 'যুগান্তর' পত্রিকা "সিডিসন ও বিদেশী রাজা" শীর্ষক

* (২০) এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা লেখকদের *Sri Aurobindo's Political Thought* পুস্তকে (১৯৫৮) পাওয়া যায়।

* (২১) 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণে (৫ই জানুয়ারী, ১৯০৮ সনে) আর সুব্রিয়ার নামক দক্ষিণ ভারতবাসীর মুদ্রিত পত্র দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধে লেখে : "ভারতবাসী বুঝিয়াছে স্বাধীনতাই তাহার সকল আপদের মহৌষধ ; সুতরাং রুধিরের সাগরে সন্তরণ করিয়াও সে লক্ষ্য সাধন করিবে" * (২১)। ১৯০৮ সনে "অকাল বোধন" নামক যে কবিতা 'যুগান্তরে' (৩০শে মে, ১৯০৮) প্রকাশিত হয়, তা সেযুগে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ :

"না হইতে মাগো বোধন তোমার
ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট।
জাগো রণচণ্ডী ! জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণ তট ॥

... ...

নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে
বিনাশ করিব অসুরের দলে
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।
জাগো রণচণ্ডী ! জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণ তট।"

এই সন্ত্রাসবাদের ভাবধারা বিকাশে ও কর্মনীতি নির্ধারণে নব্য রাজনীতিক নেতা অরবিন্দের দানও অতি-উল্লেখযোগ্য। নিরস্ত্র জাতির জন্য তিনি প্রয়োজন মত বিপ্লবের পথও নির্দেশ করেছিলেন। 'বন্দেমাতরমে'র অরবিন্দ 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ' দর্শনের উদ্গাতা ; 'যুগান্তরে'র অরবিন্দ বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদে বা বোমা দর্শনে বিশ্বাসী। ১৯০৮ সনে সরকারী চণ্ডনীতির প্রচণ্ড তাণ্ডব সুরু হলে 'বন্দেমাতরমে'র অরবিন্দও 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ' আন্দোলনে অনেকটা আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বোমার মামলায় জড়িত হয়ে জেলে যাবার ঠিক পূর্বে ২৯শে এপ্রিল তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রে "নিউ কন্‌ডিশান্‌স্"

* (২১) "যুগান্তর" পত্রিকা (৩০শে জুলাই, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য।

(New Conditions) বা "নূতন অবস্থা" নামে যে স্মরণীয় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, তার শেষাংশে বিপ্লবী অরবিন্দের মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছিল* (২২)।

* (২২) *Bande Mataram and Indian Nationalism* গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য। "New Conditions" প্রবন্ধটি 'বন্দেমাতরম'র সাপ্তাহিক সংস্করণে ৩রা মে, ১৯০৮ সনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের এক প্রধানতম নায়ক ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত দিক থেকে যে আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময় করেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ভাবের গভীরতায় ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যে এযুগে তাঁর সমকক্ষ বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না।

বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অলৌকিক প্রতিভার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে তেজোদৃপ্ত স্বদেশাত্মা অক্লান্ত সাধনায় নিমগ্ন ছিল, আমরা অনেক সময় সে দিকটার প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখি না। আমাদের দেশে যে সময় রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তা উন্মেষের সবেমাত্র সূচনা, রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও যৌবন কেটেছিল সেই আবহাওয়ায়। ঘরে ঠাকুর পরিবারে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সান্নিধ্যে তিনি পেয়েছিলেন একটি একান্তভাবে নিজস্ব জাতীয় পরিবেশ ; ঘরের বাইরে হিন্দুমেলা (১৮৬৭—৮০), ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান্ (১৮৭৬), ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রভাবেও গড়ে উঠেছিল তাঁর ভাবপ্রবণ ও জাতীয় চিত্ত। তাই প্রথম থেকেই তাঁর কবিপ্রতিভা স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে দেখা দেয় তীব্র জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ-প্রেম, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংগীতে, কবিতায় ও প্রবন্ধে। ১৮৭৫-৭৭-সনের হিন্দু বা জাতীয় মেলার প্রত্যেকটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের সম্মোহিত করেন। ১৮৭৭ সালের মেলায় দিল্লী দরবার উপলক্ষ্যে রচিত যে-কবিতা তিনি আবৃত্তি করেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন :

"হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার

পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে ?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব
আরেক তান"* (১)।

বৃটিশ শাসন-শৃঙ্খলিত হতচেতন ভারতবাসীর বেদনায় কবির অন্তর বিগলিত। ক্ষমতামদোন্মত্ত শাসকজাতির বিরুদ্ধে তিনি দেশবাসীকে দেশাত্মবোধের মন্ত্রে আহ্বান করেছেন এই কবিতায় * (২)। ১৮৮৬ সনে কলিকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গঠিত এই মহাসভায় তরুণ কবি দেখেছিলেন অনাগত ভবিষ্যতের জ্যোতির্ময় স্বপ্ন। কবি রচনা করলেন "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" সংগীত আর তা' গাইলেন ১৮৮৬ সালের কংগ্রেসে। এর পর ১৮৯৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসেও তিনি স্বরচিত গান গেয়েছিলেন "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী।"

শতাব্দীর প্রস্তুতি ও ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে উনিশ শতকের শেষপাদে এদেশে এক উগ্র জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, তিলক, লাজপত, অরবিন্দ প্রভৃতি ছিলেন সেই জাতীয়তাবাদেরই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। আমাদের এই বাংলাদেশই তখন ছিল

* (১) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত" (কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃঃ ১০১-১০২) দ্রষ্টব্য।

* (২) বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, রামমোহনের কথা বাদ দিলে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রথম জনক বিবেচনা করা যেতে পারে। "উভয়েই কেবল বাঙ্গলায় নহে—সমগ্র ভারতে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা—তাঁহারাই প্রথমে ভারতবর্ষকে এক দেশ ও ভারতবাসীকে এক জাতি কল্পনা করিয়াছিলেন" (হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস ও বাঙ্গালা" পুস্তক, পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য)।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জননী ও জন্মভূমি * (৩)। যে সময় সুদূর মার্কিন মুলুকে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে বজ্র-নিনাদে ঘোষিত হ'ল ভারতবাসীর জয়গান, যে সময় আজন্ম ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত অরবিন্দের লেখনীতে প্রচারিত হ'ল কংগ্রেসের মডারেট রাজনীতির তীব্র সমালোচনা, সেই সময় শিক্ষা-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকেও বের হ'ল তৎকালীন সুপ্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতির তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা। ১৮৯৩ সালে 'সাধনা' মাসিকে "শিক্ষার হের-ফের" নামক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "এক তো ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দ-বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন প্রকার মিল নাই। তাহার 'পরে ভাব-বিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।

"চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।...কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ।...আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না" * (৪)। তাছাড়া, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার

* (৩) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনে বাংলার অবদানের কথা সে যুগে বহু অবাঙালী রাজনীতিবিদ্ সানন্দে স্বীকার করেছেন। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ১৯০৫-এর বারাণসী কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: "The public life of this country has received an accession of strength of great importance, and for this all India owes a deep debt of gratitude to Bengal." উক্ত কংগ্রেসেই লালা লাজপত রায়ও অনুরূপ মন্তব্য করেন। ১৯০৭ সালে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিহারের দীপনারায়ণ সিং। বক্তৃতাকালে তিনিও বাংলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন: "I feel convinced, every Bihari will endorse me when I assure you that we have nothing but unqualified admiration for the great services Bengal has rendered and is rendering in the cause of the Motherland."

* (৪) 'সাধনা', চৈত্র, ১২৯৯ বা মার্চ-এপ্রিল, ১৮৯৩

সুব্যবস্থা না থাকায় এ-শিক্ষা ছাত্রদের সাংসারিক জীবনেও নিদারুণ ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আরও একটি কথা। তৎকালে দেশের আবহাওয়ায় অনুরণিত স্বদেশী ভাবের সঙ্গে এ শিক্ষার সংযোগ ছিল যৎসামান্য। সকল দিক থেকেই তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধের প্রতিকূল এবং প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয় বিবেচিত হওয়ায় এর আমূল সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই আশু প্রয়োজনীয়তার দিকে দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে তৎকালে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অনুকরণে গুরু-শিষ্যের আনন্দময় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটি বিদ্যায়তন খোলার আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের। বিদ্যালয় পরিচালনে অভিজ্ঞতানিপুণ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সাহায্যে তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে "ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে"র প্রতিষ্ঠা করেন (৫)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন—কোনও কালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল"* (৬)। ১৯০২ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মাধ্যমে (জানুয়ারী-জুন, ১৯০২) শিক্ষা-সঙ্কোচন নীতি অবলম্বন করলে এদেশের বহু শিক্ষাব্রতী জননায়ক শিক্ষা-সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিপিনচন্দ্র পাল এই সময় তাঁর

* (৫) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সে সময় সিমলা স্ট্রীটের এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একটি ছোট পাঠশালা খুলেছিলেন (১৯০১)। রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনার জন্য তাঁর তৎকালীন বাসস্থান ১৮, বেথুন রো-তে আসা-যাওয়া করতেন। উপাধ্যায়ের ক্যাথলিক শিষ্য বি, অনিমানন্দ প্রণীত *The Blade* গ্রন্থ (পৃঃ ৯৩-৯৪) এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

* (৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্মপরিচয়", পৃঃ ১২৬

'নিউ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিকে এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'ডন' মাসিকে (এপ্রিল-জুন, ১৯০২) "An Examination into the Present System of University Education and a Scheme of Reform" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং 'ডন সোসাইটি' (জুলাই, ১৯০২) নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টায় ব্রতী হন * (৭)।

শিক্ষা-সংস্কারের যে প্রয়াস এতদিন সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল, স্বদেশী আন্দোলনের (আগষ্ট, ১৯০৫) বিপুল প্লাবনে তা' বৃহত্তর পটভূমিতে জাতীয় শিক্ষার দাবিতে রূপান্তরিত হ'ল। বিলাতী পণ্য-বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৫); আর এই বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলন থেকেই কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে জন্ম নেয় জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন (অক্টোবর-নবেম্বর, ১৯০৫)। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের এক প্রধান মন্ত্রণা-গুরু। শিক্ষা-সংস্কারের যে প্রয়োজনীয়তা বহুদিন থেকে তাঁকে চিন্তিত ও ভাবিত করে তুলেছিল, তাকে এখন বাস্তবক্ষেত্রে সার্থক করে তোলার সম্ভাবনায় তিনিও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। জাতীয় কর্তৃত্বে ও জাতীয় স্বার্থে এক নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলনই ছিল এই শিক্ষা-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত হবার (২২শে অক্টোবর, ১৯০৫) অব্যবহিত পরে পটলডাঙ্গার মল্লিক বাড়ীতে এক বিরাট ছাত্রসভায় (২৭শে অক্টোবর) রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন কলেজের প্রায় এক হাজার ছাত্র। ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকারী দলননীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তৃতা করেন ছাত্র-নেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। তিনি

* (৭) ডন সোসাইটি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লেখকদের *The Origins of the National Education Movement* গ্রন্থে (১৯৫৭) সন্নিবিষ্ট আছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রদের পক্ষে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগও বরণীয়, কিন্তু স্বদেশ সেবার মহাব্রত থেকে তাদের বিরত হওয়া কোনক্রমেই চলবে না। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন থেকে ছাত্রদের এই জাতীয় মহাসংকল্পকে সম্বর্ধনা জানান। তিনি বলেন: "আমাদের দেশে শিক্ষার ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধ। সুতরাং ছাত্রেরা যে সকল সময় সকল বিষয়ে শিক্ষাগুরুদিগের অনুবর্তী হইয়া চলিবে, তাহা সম্ভবপরও নহে, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে।...ছাত্রেরা যদি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকেন, তবে সে আনন্দেরই কথা। এই স্বদেশী আন্দোলন যে কৃত্রিম, সে কথা তো কেহ বলিতে পারিবে না। আজ যে ছাত্রেরা উন্মত্ত, জনসাধারণ উত্তেজিত এবং বৃদ্ধেরাও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, সকলে মিলিয়া দেশকে এক মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।...সুতরাং আজ যে গবর্ণমেণ্টের পরওয়ানায় আপনাদের তরুণ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোন ঠাণ্ডা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাই না। আমি এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে এক। আপনারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া—শুধু যোগ দিয়া নয়, বয়স্কদের মধ্যেও ইহা সঞ্চারিত করিয়া—বিধাতার হুকুম পালন করুন, প্রবীণেরা তাহাতে কোন বাধা দিবেন না।...কর্তৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনা বোধ করিয়া যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের চাকরী ও গবর্ণমেণ্টের সম্মানের আশা বিসর্জন দিয়া স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে। আজকার এই অবমাননা যে নূতন, তাহা নহে; অনেকদিন হইতেই ইহার সূত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উচ্চ শিক্ষার উপর গবর্ণমেণ্টের অনুকূল দৃষ্টি নাই; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবুও আমরা তাঁহাদের হাতে শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া শান্ত থাকিতে পারিব না।...গবর্ণমেণ্ট নিজের

বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপমান করিয়াছেন, তাহা নিজেকেই অপমান করা। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইলে আমরা দূরে গিয়া নিজেদের বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিব। আমরা ভারি দুর্ব্বল, ভারি অসহায়, এই ভাবিয়াই আমরা এতদিন আমাদিগকে এরূপ অশক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আর আমরা ভয় পাই না। গবর্ণমেণ্ট নিজের জিনিষ চূর্ণ করুন, আমরা এই অপমানের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতের সরস্বতীকে আবার ভারতের নিজের মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিব" *(৮)। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা সেদিন ছাত্রদের প্রাণে অভূতপূর্ব আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

এর পর ২রা নবেম্বর 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী' ক্লাবে সদস্য ও ছাত্রদের এক সান্ধ্য-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি যোগদান করেন। সভায় রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র শিক্ষা ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, "গবর্ণমেণ্ট যদি দুই দিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনো ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। ছাত্রেরা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন যে তাঁহারা সত্য সত্যই গবর্ণমেণ্টের সম্মান এবং চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কিনা। যদি তাঁহারা যথার্থই প্রস্তুত হইয়া থাকেন তবে নেতৃবর্গ নিঃসন্দেহে তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন" *(৯)। জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ যে কত আন্তরিক ও দৃঢ় ছিল, এই সকল বক্তৃতা ও সমালোচনা তার স্পষ্ট প্রমাণ।

* (৮) "শিক্ষার আন্দোলন" (কেদারনাথ দাসগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত, ডিসেম্বর, ১৯০৫, পৃঃ ঙ-ছ)

* (৯) "শিক্ষার আন্দোলন", পৃঃ ৪-৫

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের আর এক প্রধান কর্ণধার ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ডন সোসাইটি প্রথম থেকেই এই শিক্ষা আন্দোলনে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ব্যাপারে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল অতি নিবিড় ও আন্তরিক সংযোগ। ইতঃপূর্বে, সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে, ডন সোসাইটির এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং স্ব-রচিত অনেকগুলি গানও গেয়েছিলেন। 'বৈঠকে' বিখ্যাত চিন্তানায়ক বিনয় সরকার বলেছেন, এই গানগুলি ছিল যথাক্রমে :—

(১) "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
এ অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননি !"

(২) "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।"

(৩) "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।"

রবীন্দ্রনাথ ডন সোসাইটির ঐ সভায় শুধু গানই করেন নি, "সেই সঙ্গে ডন সোসাইটির ছোকরাদেরকে গানের সাকৃরেত করে নিয়েছিলেন। তাঁর তৈরী স্বদেশী গান শেখাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। কয়েক সপ্তাহ ধ'রে তাঁর অন্যতম বড়-চেলা অজিত চক্রবর্তী নিয়মিত এসে আমাদেরকে গান শিখিয়ে যেতেন। মেট্রোপলিটান কলেজে চোআঁড় গলায়, গাধার গলায়, ফাটা গলায়, মিহি গলায়, সর্দি গলায় অ-সুরেরা সুর সাধনা করৃত"* (১০)। ডন সোসাইটির আর এক পাণ্ডা-ছাত্র ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জীও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন, "অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলনের নেতৃত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন ও তাঁর অনুপম জাতীয় সঙ্গীতরাজি সৃষ্টি করে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত রাখেন। প্রত্যেক দিন বিকালে তিনি অজিত চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে উপস্থিত হতেন ও তাঁর

* (১০) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১৯৪২, পৃঃ ৩০০)

রচিত কবিতাগুলিতে সুর সংযোগ করতেন"* (১১)।

এদিকে, কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে যখন দেশের ছাত্রসমাজ ভয়ঙ্করভাবে ক্ষিপ্ত ও বিদ্রোহী, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন পরীক্ষা (এম, এ, ও পি, আর, এস, নবেম্বর, ১৯০৫) বর্জনে যখন তারা অনমনীয় দৃঢ়তায় অটল, সেই সময় রংপুরের ছাত্রগণের উপর এসে পড়ে সরকারী নিষ্পেষণের আর এক প্রচণ্ড কষাঘাত। কার্লাইল সার্কুলার অমান্য করার অপরাধে বহিষ্কৃত রংপুরের শতাধিক ছাত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করেন। তাঁদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা কল্পে প্রতিষ্ঠিত হ'ল রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়। ভারতের স্বরাজ-আন্দোলনের ও শিক্ষা-বিপ্লবের ইতিহাসে এ এক অতি-স্মরণীয় ঘটনা।

শতাধিক বহিষ্কৃত ছাত্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্যপন্থা নিরূপণের সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে এক অতি-গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি করে। কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে কলিকাতায় স্থাপিত হয় "অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি"। "অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি" (৪ঠা নবেম্বর, ১৯০৫) জন্ম নিয়েই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে প্রসারিত ও জনপ্রিয় করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। অন্যদিকে, স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণের দায়িত্ব ও ব্রত গ্রহণ করে ডন সোসাইটি। রংপুরে ছাত্র নির্যাতনের পরেই ডন সোসাইটিতে ৫ই নবেম্বর এক জরুরী ছাত্রসভা আহুত হয়। সভায় প্রায় দুই সহস্র ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ছাত্রগণের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

* (১১) "*The Origins of the National Education Movement* গ্রন্থের ভূমিকায় রাধাকুমুদবাবু লিখেছেন :

"The leadership of this revolt was soon assumed by Rabindra Nath Tagore who fostered it and kept up its fire by his great literary creation of national songs, a unique poetry of patriotism. These patriotic poems he composed and came to set to music with Ajit Chakravarty every evening in the hall of the Metropolitan Institution where the Dawn Society was located."

আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর প্রলোভন পরিত্যাগ করে ছাত্রগণ যদি জাতীয় শিক্ষালাভের জন্য যথার্থ আগ্রহান্বিত থাকেন, তবে নেতৃবর্গ এ বিষয়ে অগ্রসর হতে বাধ্য হবেন। এক্ষেত্রে ছাত্রদিগের দৃঢ় মনোভাবই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পথে প্রাথমিক সোপান। তবে এই বৃহৎ উদ্যোগের প্রথম স্তরে আশানুরূপ ফললাভ যে না-ও হতে পারে, সে বিষয়েও তিনি ছাত্রদের অবহিত করেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে যুবকদিগের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন ছাত্রও ঐ আলোচনায় যোগদান করেন। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তাঁহার বিশ্বাস যে, ছাত্রগণ সংকল্পে দৃঢ় থাকিলে নেতারা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। নেতৃগণের মধ্যে এখনও কাহারও কাহারও সন্দেহ আছে যে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রগণ তাহাতে প্রবেশ করিবেন কি না। ছাত্রেরা সভা করিয়া, নেতাদিগের নিকট ডেপুটেশান পাঠাইয়া বা সতীশবাবুর প্রস্তাবিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।...আজ যে সকল ছাত্র গবর্ণমেণ্টের কৃত অপমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যে কুসুমাস্তৃত পথ রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদিগকে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাত্রেরা কি তাহাতে প্রস্তুত আছেন? আজ জোয়ারের সময় তাঁহারা যে আত্মদানের সংকল্প গ্রহণ করিবেন, ভাঁটার সময় যেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হন। যদি তাঁহারা এই সংকল্প রক্ষা করিতে পারেন, তবে এই দিন বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে"* (১২)। কবিগুরুর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়েছে।

৫ই নবেম্বর, ১৯০৫ সনে ডন সোসাইটির ঐ আলোচনা সভায় রবীন্দ্রনাথ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সভায় ছাত্রদের ঐকান্তিক আগ্রহ

* (১২) "শিক্ষার আন্দোলন", পৃঃ ১০-১৩

ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করে নেতৃবর্গ স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগপর্ব সুরু করেন।

১৬ই নবেম্বর 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশানে' অনুষ্ঠিত নেতৃবর্গের প্রথম মন্ত্রণা-সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, এই সভায় রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে সভার কাজকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে সহায়তা করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-পদ্ধতি ও পাঠক্রম রচনার জন্য যে দুইটি কমিটি (Provisional Education Committee, Nov. 10 এবং Ways and Means Committee, Dec. 10, 1905) গঠিত হয়েছিল, উভয়টিতেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম প্রধান সদস্য। কিন্তু পাঠক্রম রচনার মূল দায়িত্ব এসে পড়েছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান নেতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার লিখেছেন: "পাঠক্রম-রচনা ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে সতীশচন্দ্রের প্রায়শঃ আলোচনা চল্‌ত শিক্ষাবিদ্ গুরুদাস ব্যানার্জীর সঙ্গে; তাছাড়া তিনি একারণে কখনও কখনও ব্রজেন শীল, রামেন্দ্র ত্রিবেদী ও রবি ঠাকুরের সঙ্গেও আলোচনা করতেন"* (১৩)। অর্থ সংগ্রহের কাজেও সতীশচন্দ্রকে প্রধান ঝুঁকি বহন করতে হয়েছিল।

* (১৩) বিনয় সরকারের *Education for Industrialisation* পুস্তক (১৯৪৬, পৃঃ ৭৫) দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে "রবীন্দ্র-জীবনী" প্রণেতা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি তথ্যগত ভুলের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। "রবীন্দ্র-জীবনী"তে (২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৯, পৃঃ ১৩১) তিনি লিখেছেন: "রাজনৈতিক নেতাদের ও শিক্ষা পরিষদের ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতি যেভাবে চলিতে লাগিল তাহা রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তিনি দেখিলেন যে, উদ্যোক্তাদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কোন নূতন পরিকল্পনা দিবার মতো লোক নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রেও বাক্‌সর্বস্বতা ছাড়িয়া নূতন পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা, চেষ্টা বা শক্তি কাহারো নাই।...জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি দেখিলেন যে, সদস্যদের মধ্যে কাহারো শিক্ষা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা নাই"। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও সতীশচন্দ্র মুখোপধ্যায়েরা মতো নেতাদের

সতীশচন্দ্রের সংগঠনী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা' ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ সনে ডন সোসাইটির ছাত্রদের সম্মুখে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের এক ভাষণে সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, "আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, সতীশবাবু তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে ডন সোসাইটি জড়িত রহিয়াছে একথা বলা যাইতে পারে। এতদিন সভাসমিতিতে ঝড়ের মুখে যাঁহারা তরণী চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন উহাকে ঘাটের মুখে আনিয়াছেন একথা বলিতে পারা যায়। এখন ইহাকে সফলতা দেওয়ার ভার আপনাদের উপর।" রবীন্দ্রনাথ উক্ত বক্তৃতায় আরও বলেন: "সতীশবাবু যে সময় ডন্ সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা-সম্পর্কীয় এই National Movement-এরও তখন সূত্রপাত হয় নাই। এমন দিনে সতীশবাবু দূরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরের উৎসাহ উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহৎ লক্ষ্য মাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সভা সাময়িক কোন বৃহৎ উত্তেজনা উদ্দীপনার মুখে তৈয়ার হয় নাই, আপনারা সেই সভার আকর্ষণে এখানে মিলিয়াছেন। এতদিন ধীরে ধীরে ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন তাহা পল্লবিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।··· স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের হৃদয় আপনাদের এই সোসাইটির দিকে আসিবে, ইহার শিকড়ের কাছে রস সঞ্চার হইবে, আপনারা আশার সঙ্গে

শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে লেখক পরিপূর্ণভাবে অবহিত থাকলে এমন অনৈতিহাসিক ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা বোধ করতেন। ঐ একই বিষয়ে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর "Evolution of Swadeshi Thought" প্রবন্ধে অনুরূপ ভুল করে রেখেছেন। তাঁর ঐ প্রবন্ধ নবপ্রকাশিত *Studies in the Bengal Renaissance* পুস্তকে সন্নিবিষ্ট আছে। তাতে তিনি লিখেছেন," জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম রবীন্দ্রনাথেরই কল্পনায় আর শিক্ষাপরিষদের পাঠক্রমও তাঁরই রচনা" (পৃঃ ২১৩)। অথচ ঐ শিক্ষা আন্দোলনে যিনি সর্বপ্রধান অধিনায়কের অংশ গ্রহণ করেন, সেই শিক্ষাব্রতী আচার্য সতীশচন্দ্রের নাম তাঁর রচনায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। এ কি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস না প্রচার-ধর্মী সাহিত্য?

অগ্রসর হইবেন। বড়র জন্য লোভ করিবেন না" * (১৪)। সতীশবাবুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডন সোসাইটির ছাত্রদের স্বদেশপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ, বিদ্যাবত্তা ও সংগঠনশক্তির উপর রবীন্দ্রনাথ গভীর আস্থা পোষণ করতেন। যে সময় দেশে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলেছে সেই সময়ই আবার রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থক পরিচালনার বিষয়েও মাঝে মাঝে সংশয়ী ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করলেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীল ও ভাবপ্রবণ মন স্বভাবতই ধাবিত হয়েছিল সংগঠনের দিকে। বাইরের সভা-সমিতি বা বক্তৃতা অপেক্ষা তিনি গঠনমূলক কাজের উপর জোর দিতেন অনেক বেশী। এই কারণে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তিনি একদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন। প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দেখেছিলেন তাঁর কল্পনায় লালিত "স্বদেশী সমাজের" (১৯০৪) পূর্বাভাষ। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যেই বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকে, এ ধারণা ছিল তাঁর বরাবরের। হঠাৎ উত্তেজনার মুখে বৃহৎ কর্ম স্বরু করা সহজ ; কিন্তু প্রথম উত্তেজনা স্তিমিত হলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সকল বৃহৎ প্রচেষ্টা দুর্বল ও ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে তিনি বহুলাংশে নির্ভর করতে পেরেছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সেবী, স্বদেশ-প্রাণ সতীশ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ডন সোসাইটির উপর। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস যে অমূলক ছিল না, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ডন সোসাইটির ছাত্র বিনয় সরকার লিখেছেন, "১৪ই নবেম্বর (১৬ই নবেম্বরের সভা আহ্বান করে আশুতোষ চৌধুরীর ফতোয়া জারি) থেকে ১৪ই আগষ্ট (বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠার দিবস) পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের ইতিহাস প্রকারান্তরে সতীশ মুখার্জীরই জীবনেতিহাস।...আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গোড়ার দিকে (১৯০৬-০৮) ছিল ডন সোসাইটির বৃহদ্ সংস্করণ" * (১৫)।

* (১৪) "দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন্", মার্চ, ১৯০৩
* (১৫) *Education for Industrialization*, পৃঃ ৭৫-৭৬

১১ই মার্চ, ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ বা দি ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন নামে বাংলার বহু প্রতীক্ষিত স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলাভ করে। বিরানব্বুই জন সদস্য সম্বলিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের এক প্রধান সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় জুলাই, ১৯০৬ সনে। ইহা ছিল কতকটা টেষ্ট পরীক্ষার মত। বিদ্যা-বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার পরিমাপে কোন ছাত্রকে কোন ক্লাশে ভর্তি করা চলে, তা' নির্ধারণ করাই ছিল এই পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম-কালেই এর পাঠক্রম বিজ্ঞাপিত হয়। তবে প্রথম টেষ্ট পরীক্ষায় তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠক্রম অনুসারেই প্রশ্নপত্র রচিত হয়েছিল। উক্ত পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বাংলার প্রশ্নপত্র রচনা করেন। অন্যান্য প্রশ্ন-কর্তাদের মধ্যে শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে জড়িত দেশের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তির নামই নজরে পড়ে,—যেমন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখার্জী, গুরুদাস ব্যানার্জী, আশুতোষ চৌধুরী, অরবিন্দ ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, গৌরীশঙ্কর দে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সৈয়দ মহিরুদ্দিন আমেদ, মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ খান প্রভৃতি।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীনে ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬ সনে জন্মলাভ করে 'দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল'। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ন্যাশন্যাল কলেজের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের জয়ধ্বনি তুলে এক আবেগময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন: "আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে—আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।" এইভাবে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের জন্মে বিজয়-সম্বর্ধনা জানিয়ে এবং এই প্রতিষ্ঠানের গুরু দায়িত্বভার সতীশচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে আত্মগোপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অরবিন্দ ঘোষ ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত

স্বদেশী আন্দোলন

ও

বাংলার নবযুগ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

করলেও কলেজের কাজকর্ম অপেক্ষা রাজনীতিতে উগ্র মতবাদ প্রচারেই তিনি অধিকতর সক্রিয় ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

এই সময় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে 'নরম' ও 'গরম' (Moderate ও Extremist) দলের আবির্ভাব হয়েছিল। গরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এবং অরবিন্দ ঘোষ পূর্ণ স্বরাজের সপক্ষে জোর প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। 'নিউইণ্ডিয়া', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' ছিল এই গরম দলের মুখপত্র। ইংরেজ-ঘেষা নরমপন্থীদের উপর তাঁদের শ্লেষ ও কটাক্ষেরও অন্ত ছিল না। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও এই বিভেদ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষা-সংস্কারে উগ্রপন্থী নেতৃবর্গ স্থাপন করেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্, আর নরমপন্থী নেতাগণ পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি' (Society for the Promotion of Technical Education, জুন, ১৯০৬)। সামগ্রিক শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের জন্ম হয়। কিন্তু কেবলমাত্র কারিগরী শিক্ষা প্রদানের জন্যই স্থাপিত হয়েছিল 'কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি'। সতীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস ব্যানার্জী, হীরেন দত্ত প্রভৃতি ছিলেন প্রথম দলভুক্ত, আর দ্বিতীয় দলের প্রধান নেতা ছিলেন তারকনাথ পালিত। রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে এ প্রকার বিভেদ ও দলাদলিতে রবীন্দ্রনাথের কবি-মন আহত হয়েছিল সন্দেহ নেই। তাই তিনি ১৯০৬-এর শেষাশেষি প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে তাঁর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্রাকারে ও নীরবে গঠনমূলক কার্যের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুরাট কংগ্রেসের (ডিসেম্বর, ১৯০৭) অব্যবহিত পরে পাবনায় অনুষ্ঠিত (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি যে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে এই মতবাদ সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন : "দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত

কার্যের ভার এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীটিকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই স্বায়ত্ত সম্মেলনের চর্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।...তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও।...এই কার্যে খ্যাতির আশা করিবে না; এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা, অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য ও প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকুমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব"* (১৬)।

*(১৬) প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ" (২য় সংস্করণ, ১৯৪৭, পৃঃ ৮৫-৮৬) দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

যুগ-প্রবর্তক বিপিনচন্দ্র

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) জন্ম-শতবার্ষিকী ১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিংশ শতকের নবীন উষায় যে বাগ্মী ও মনস্বীর বজ্রকণ্ঠকে আশ্রয় করে নব ভারতের স্বরাজ-মন্ত্র দিগ্‌দিগন্তে উচ্চারিত হয়েছিল, বিদেশী শাসকের নির্মম নিপ্পেষণের মধ্যেও যাঁর স্বরাজ-সাধনা ছিল অক্লান্ত ও অফুরান, দারিদ্র্যের দুঃসহ ব্যথার মধ্যেও যিনি স্বদেশের কল্যাণ চিন্তায় সতত নিমগ্ন ছিলেন, সেই বিপিন পালের সত্যকার পরিচয় একালের বাঙালী সমাজেই বা কয়জন জানেন? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসে যে বিশিষ্ট স্থান বিপিনচন্দ্রের প্রাপ্য, আমরা তা এখনও তাঁকে দিতে পারি নাই* (১)।

বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কোনো বড় আন্দোলনের নেতৃত্বের অধিকারী হতে গেলে যে দু'টি বিশেষ সদ্‌গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, সে দুইয়েরই অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে। একদিকে ছিল তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্র-দর্শন, অপরদিকে ছিল নিজের চিন্তা ও অনুভূতি বহুজনের মধ্যে পরিবেষণের সুদুর্লভ ক্ষমতা। তৎকালে বিপিনচন্দ্রের তুল্য অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন জননেতা বাংলা দেশে, তথা ভারতে, আর ছিল না। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের হেফাজতে রক্ষিত

* (১) বর্তমান লেখকদের "বন্দেমাতরম্ ও বিপিনচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধ ("যুগবাণী", শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৫৮) দ্রষ্টব্য।

সমসাময়িক পুলিশ রিপোর্টেও অনুরূপ অভিমত লিপিবদ্ধ দেখতে পাই* (২)। স্বদেশী আন্দোলনের আর একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি অরবিন্দ ঘোষও বিপিন-চন্দ্রকে সে-যুগের প্রধানতম রাজদ্রোহী ("arch-seditionist") বলে বিশেষিত করেছিলেন। একই কারণে "বৈঠকে" বিনয় সরকারও বলেছেন: "আমার বিচারে সে যুগের আসল নেতা বিপিন পাল। ১৯০৫ সনের আগষ্ট হ'তে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাতকে তাতিয়ে তোলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে। বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুন্‌লে যুবক বাংলার জন্ম হ'ত না। বিদ্যায়, দার্শনিকতায়, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে, বিপ্লব-যোগে, কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল। তার সঙ্গে গলার আওয়াজ জোরালো ছিল ব'লে বিপিন পালের কীর্তি। একমাত্র গলাবাজি করে কেহ দেশ মাতাতে পারে না"* (৩)।

স্বদেশী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক জন্মের (৭ই আগষ্ট, ১৯০৫) পূর্বেই বিপিনচন্দ্র পাল বাংলার জাতীয় জীবনে এক উল্লেখযোগ্য আসন অধিকার করেন এবং "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ ক'রে (১২ই আগষ্ট, ১৯০১ সন থেকে) ভারতবাসীর বিবিধ সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বলিষ্ঠ রূপ দিতে থাকেন। পত্রিকার প্রথম পর্বে বিপিনচন্দ্রের আলোচনায় ভারতের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলিই প্রধান ঠাঁই পেয়েছিল। যাঁরা মনে করেন বিপিনচন্দ্র পশ্চিম মুল্লুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই ভারতবাসীর সামনে উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করতে থাকেন, তাঁরা একেবারে ভ্রান্ত। ১৯০১-০৩ সনের যুগে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র ছিলেন "মডারেটিষ্ট" বা নরমপন্থী। ভারতে ইংরেজ শাসনের নৈতিক বৈধতায় তখন

* (২) **"The chief of the itinerant demagogues was Bipin Chandra Pal who did more to inflame the minds of the masses against the Government than any one else."**—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে রক্ষিত **File No. 117/13** দ্রষ্টব্য।

* (৩) "বিনয় সরকারের বৈঠকে", ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৩৩১ দ্রষ্টব্য।

তাঁর আস্থা ছিল সীমাহীন আর এদিক থেকে বিচার করলে ১৯০১-০৩ সনের বিপিনচন্দ্র পালকে সহজেই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শা' মেটা, গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে এবং দাদাভাই নৌরজীর গোত্রান্তর্গত করা চলে। তাঁদের ন্যায় বিপিনচন্দ্রও তৎকালে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেও ভারতের সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার বিমোচন সম্ভব। তাই ১৯০১-০৩ সনে তাঁর কণ্ঠে বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের জয়গান* (৪)। প্রাক্‌-স্বদেশী যুগের বিপিনচন্দ্র ১৯০৫-পরবর্তী বিপিনচন্দ্র থেকে অনেকখানি পৃথক।

১৯০৩ সনের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব-সমন্বিত রিজ্‌লী সার্কুলার প্রকাশিত হ'লে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে তুমুল আলোড়ন দেখা দেয় এবং তাতে বিপিনচন্দ্র পালের গৌরবজনক ভূমিকাও নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ কণ্ঠে নিয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র। তাঁর মানসলোকের এই পরিবর্তন অবিলম্বে "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯০৪ সনের জানুয়ারী মাসে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবানুষ্ঠানকালে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তার শেষাংশে নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লিখিত ছিল—"...the repressive tendencies of modern British Imperialism have worked together to kill the old idealism of the British administrators in India, and the old faith of the people in their saving mission and power" অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ-নীতি ভারতস্থিত ইংরেজ শাসকদের পুরাণো আদর্শবাদকে মেরে ফেলেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসনের পবিত্র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এদেশবাসীর আস্থাকেও

* (৪) এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান লেখকদের *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* (কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ১১-১৭) শীর্ষক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বিনষ্ট করেছে *(৫)। ১৯০৪ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে এক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র ভারতবাসীর স্বরাজ-কামনাকে আরও তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন * (৬)। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতের স্বরাজ-আদর্শ প্রচারে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে বাদ দিলে বিপিনচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়।

১৯০৫-এর ১৯শে জুলাই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষিত হ'লে জাতীয় আন্দোলনে একদিকে দেখা দেয় ব্যাপ্তি ও গভীরতা এবং অপরদিকে জনবিক্ষোভের বিক্ষিপ্ত ধারাগুলিকে গঠনমূলক পথে পরিচালনার প্রয়াস। জুলাই মাসের শেষাশেষি পূর্ববঙ্গে "সোনার বাংলা" নামে বহুল প্রচারিত একটি পুস্তিকা অসংখ্য মানুষের মনে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এক সময়ে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা বিশ্বাস করতেন যে, উক্ত পুস্তিকা বিপিনচন্দ্রের রচনা, কিন্তু পরবর্তী রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ পুস্তিকার লেখক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব * (৭)। ঐ পুস্তিকার মধ্যে ছিল

* (৫) উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১৯-২০ দ্রষ্টব্য।

* (৬) **"The belief that England will of her own free will help Indians out of their long-established civil servitude and establish those free institutions of Government which she herself values so much was once cherished, but all hope has now been abandoned.**

"What India really wants is a reform in the existing constitution of the State, so that the Indians will govern themselves as other nations do, follow the bent of their own national genius, work out their own political destiny, and take up their own legitimate place, as an ancient and civilised people among the nations of the world" (Bipin Chandra in *New India*, Dec. 21, 1904).—এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃঃ ২১-২২ দ্রষ্টব্য।

* (৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত **I. B. Records : L. No. 476/193** ও **File No. 477 of 1907** দ্রষ্টব্য।

বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার জন্য এক দুর্জয় আহ্বান। বাঙালী জাতির সুপ্ত রাষ্ট্রিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে তৎকালে ব্রহ্মবান্ধবের মত বিপিনচন্দ্রও বিশেষ তৎপর ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন সুরু হওয়ার (৭ই আগষ্ট, ১৯০৫) অব্যবহিত পরেই বিপিনচন্দ্র পাল বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রধান অধিনায়কের ভূমিকায় আবির্ভূত হন। প্রথমে 'জাতীয় শিক্ষা'র দাবি ও পরে 'স্বরাজে'র আদর্শকে কেন্দ্র করে সে সময় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যে চরমপন্থী (Extremist) দলের আবির্ভাব ঘটে, বিপিনচন্দ্র হলেন সেই দলেরই প্রধান প্রতিনিধি ও সেনাপতি। ১৯০৫ সনের শেষাশেষি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রদর্শন ক্রমশই নরমপন্থী হতে থাকে; অরবিন্দ ঘোষ বরোদার চাকুরী বর্জন করে তখনও বাংলার রাজনীতিতে এসে প্রকাশ্যে যোগদান করেননি। এমন দিনে বিপিনচন্দ্রই বাংলার রাষ্ট্রিক রঙ্গমঞ্চে অধিকার করলেন প্রধানতম অধিনায়কের আসন। সেই অনন্যসাধারণ গৌরবের আসনে তিনি তারপরও অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে তাঁর বাগ্মিতা জন-মানসে যে সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল, পুরাণো যুগের লোকেরা আজও তা সবিস্ময়ে স্মরণ করে থাকেন।

বিদেশী পণ্য বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করেই বাঙালী জাতি ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বাংলার ঐক্য, বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা (এবং পরে স্বরাজের) স্বপ্ন ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনায় ভেসে ওঠে। বিপিনচন্দ্র হলেন নূতন রাজনৈতিক দর্শনের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা ও প্রচারক। কলিকাতার স্থানে স্থানে বক্তৃতা করে ও শহরে-মফঃস্বলে সুপরিকল্পিত সফর চালিয়ে তিনি অপ্রত্যাশিত সাফল্যের সঙ্গে জনগণকে নূতন রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করলেন। ১৯০৫-এর শেষভাগে সরকারী নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় যখন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন ও জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রশ্ন নিয়ে বাংলার যুবসমাজ এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণীর দ্বারা যেভাবে জাতির উৎসাহ-বহ্নি প্রজ্জলিত রেখেছিলেন তার প্রায় তুলনা নেই। ২৪শে নবেম্বর কলিকাতার

'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী'র মাঠে ছাত্রসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন : "তোমরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না। আবার দ্বিধা করিতেছ কেন? আজ আবার তাদের (নেতৃবর্গের) মত জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তখন কোন্ নেতার হুকুমে করেছিলে? সেদিন গোলদীঘীতে যখন নিজেরা বলেছিলে, 'আমরা গোলামখানা ছাড়বো', তখন কার কথা শুনে বলেছিলে?...আজ যদি এই 'রাজার মাঠে' দাঁড়িয়ে তোমরা দৃঢ়ভাবে বল, 'আমরা এখানে দাঁড়ালাম, ওখানে আর যাব না, যেখানে To let লেখা হয়েছিল, সেখানে আর আমরা যাব না,' দৃঢ়ভাবে একথা যদি তোমরা বলতে পার, তবে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হবেই হবে। অন্য পন্থা নাই। এ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে কি দেখতে পাও? এই দেখতে পাও যে, এই শিক্ষার আন্দোলন প্রথম political আন্দোলন, তারপর educational আন্দোলন। কার্লাইল সার্কুলারের, লায়ন সার্কুলারের তাড়নায় এবং 'বন্দে মাতরমে'র অবমাননায় এর উৎপত্তি।...পড়াশুনা কিসের? যখন বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, তখন কি তোমরা বই খুলে পড়? গ্রামে যখন মড়ক লাগে, তখন কি কেউ একজামিনের ভাবনা ভাবে? বরিশালের খবর শুনে আমরা যে বুড়ো আমাদেরই রক্ত গরম হয়ে ওঠে, মুখে ভাত যায় না, রাত্রে ঘুম হয় না, আর তোমরা কি এমনই অমানুষ হয়েছ যে, তোমরা আজ একজামিন নিয়ে ব্যস্ত! তোমাদের যৌবনের সে উদারতা, যৌবনের সে দেবভাব, যৌবনের সে বিশ্বপ্রেম আজ কোথায়?...পড়াশুনা ছেড়ে দল বাঁধ, মুখে বল 'বন্দে মাতরম্' আর প্রাণে মায়ের অভয় নিয়ে যাও বরিশালে যাও, যাও মাদারিপুরে যাও, যাও ফরিদপুরে যাও। যেখানে গুর্খা গিয়াছে সেখানে যাও, যেখানে গুর্খা যায় নাই সেখানেও যাও; গিয়ে গ্রামে গ্রামে 'বন্দে মাতরমে'র রব তুলে দাও" * (৮)।

* (৮) কেদারনাথ দাসগুপ্ত সংকলিত "শিক্ষার আন্দোলন" পুস্তক (ডিসেম্বর, ১৯০৫, পৃঃ ৭-৮) দ্রষ্টব্য।

১৯০৫-এর শেষ দিকে বাংলার রাজনীতিতে চরমপন্থী দল উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী' ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, রজতনাথ রায়, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র ছিলেন এই গোষ্ঠীর প্রধান রাজনৈতিক নেতা। ১৯০৬-এর প্রথম দিকে বড়লাট মিণ্টোকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের প্রশ্ন নিয়ে 'মডারেট'ও 'একস্‌ট্রিমিষ্ট'দের নীতিগত বিভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় থেকেই চরমপন্থী দলের একটি ইংরেজী মুখপত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মডারেট নেতৃবর্গ—যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মতিলাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ্ প্রভৃতি—স্ব স্ব পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বয়কট-স্বদেশীর সপক্ষে প্রচারকার্য করে চলেছিলেন। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক স্বরাজ বা স্বাধীনতার আদর্শ তাঁদের চিন্তায় তেমন বিশেষ ঠাঁই পায় নি। বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিক নব্যজাতীয়তাবাদী দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও ইংরেজী দৈনিকের অভাব মোচনে ছিল অসমর্থ। এমন কি, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' (১৯০৪ সনে প্রথম প্রকাশিত) পত্রিকা ও বিপ্লবী যুবকদলের 'যুগান্তর' (১৯০৬ সনের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত) সাপ্তাহিকও নব্যরাজনীতিক দলের নীতি ও আদর্শ (নিরস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ লাভের আদর্শ) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধারাবাহিক প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হলো না। এই সময় বাংলা দেশে সরকারের দমন-নীতি ও ছাত্র-পীড়ন পূর্ণবেগে সুরু হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান সরকারী নির্যাতনের পটভূমিতে চরমপন্থীদলের রাষ্ট্রিক সাধনা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে ও ইংরেজী দৈনিক প্রকাশের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। বরিশাল যজ্ঞভঙ্গের (এপ্রিল, ১৯০৬) পর এই জাতীয় পত্রিকা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা এক প্রত্যক্ষ দাবিতে পরিণত হলো। অথচ পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে বিরাট আর্থিক ঝুঁকি অবশ্যম্ভাবী, তা কে বহন করবে তখন পর্যন্তও সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা

নেই। পত্রিকা সম্পাদনের গুরু দায়িত্ব কিভাবে পালন করা যেতে পারে তাতেও অনিশ্চয়তা ছিল বড় কম নয়। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখনও অরবিন্দ ঘোষ উদিত হননি। এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি ১৯০৬ সনের গোড়ার দিকে একবার বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার (১১ই মার্চ, ১৯০৬) পর তিনি কিছুদিন বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন এবং বরিশাল কনফারেন্সে যোগদানের পর আবার বরোদায় প্রত্যাবর্তন করেন।

"এই সময় বিপিনচন্দ্র কাহাকেও একপ্রকার না জানাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। কালীঘাটের শ্রীহরিদাস হালদার ও শ্রীহট্টের শ্রীক্ষেত্রমোহন সিংহ দুইজনে ৪৫০৲ টাকা দিলেন। পত্রিকা ছাপাইবার ভার নিলেন তদানীন্তন 'প্রদীপ' পত্রিকার ও ক্লাসিক প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী। প্রেসের অফিস ছিল তদানীন্তন করপোরেশন ষ্ট্রীটের উপর ; ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যস্থলে বাড়ীটি অবস্থিত ছিল। বিহারীলালের সঙ্গে ব্যবস্থা হইল যে তিনি দৈনিক বিক্রয়ের আয় হইতে ছাপার ব্যয় আদায় করিবেন"*(৯)।

১৯০৬-এর ৭ই আগষ্ট বয়কট আন্দোলনের বাৎসরিক জন্ম তারিখে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা (পত্রিকার নামকরণে তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়) প্রকাশের দিন স্থির হয়। ইতোমধ্যে সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ধার্য হয়েছে ৭ই আগষ্ট* (১০)। বিপিনচন্দ্র তাঁর জন্মভূমির ঐ সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হন। এই কারণে তিনি ৭ই আগষ্টের পরিবর্তে ৬ই আগষ্ট 'বন্দে

* (৯) বিপিনচন্দ্র পালের জামাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দেবের "'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার জন্ম-বৃত্তান্ত" শীর্ষক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (১০) তৎকালীন "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" গভর্ণমেন্টের পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে সম্মিলনী ১১-১২ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মাতরমের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন ও উহার এক কপি হাতে নিয়ে ঐ দিনই প্রাতে চাটগাঁ মেলে শ্রীহট্ট অভিমুখে রওনা হন। সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীতে তিনিই একমাত্র কলিকাতার প্রতিনিধি ছিলেন।

বিপিন পালের অনুপস্থিতিতে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইতঃপূর্বেই অরবিন্দ ঘোষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসে-ছেন (জুলাই, ১৯০৬)* (১১) ও সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অতিথিরূপে তাঁর ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থিত বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। বিপিনচন্দ্র ৫ই আগষ্ট বিকালে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে 'বন্দে মাতরমের' জন্য দিনে একটি করে প্রবন্ধ লিখে দিতে তাঁকে অনুরোধ জানান ও অরবিন্দের সম্মতি নিয়ে নিশ্চিন্তমনে শ্রীহট্ট যাত্রা করেন। বিপিন পাল সিলেট হতে কুমিল্লা (আগষ্ট ২০), শিলচর (আগষ্ট ২১-২২), কুমিল্লা (আগষ্ট ২৬-২৮), মাহেষপুর, যশোর (আগষ্ট), চট্টগ্রাম (সেপ্টেম্বর), ঢাকা (সেপ্টেম্বর ৬-৭), ময়মনসিং (সেপ্টেম্বর ৮), কুমিল্লা (সেপ্টেম্বর ১১-১২), খুলনা (নবেম্বর ৯) প্রভৃতি বহু স্থান পর্যটন করেন। বিপিনচন্দ্র যখনই যেখানে গিয়েছেন, তখনই তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছিল স্বরাজের মন্ত্র এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, বিলাতী পণ্য বর্জন, স্বদেশীর প্রসার ও বৃটিশ শাসনযন্ত্রকে বিকল করে তোলার জন্য সর্বাঙ্গীণ অসহযোগ বা নিরস্ত্র প্রতিরোধের দাবি। গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় স্বদেশী আদালত গড়ে তোলার কথা তিনি বলেছেন, স্বদেশী শিল্পের উন্নয়ন ও বহুল প্রসারের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্য তিনি আন্দোলন চালাতে বলেছেন। আর সেই স্বাধীনতার মহাসমরের যারা হবে সৈনিক, তাদের মধ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন **volunteer movement**। রাজনৈতিক সমিতি ও ক্লাব স্থাপন করে

* (১১) কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রণীত *Sri Aurobindo* (কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ: ১২৯) দ্রষ্টব্য।

তিনি অঞ্চলে অঞ্চলে আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ করতে চেয়েছেন ও দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মাহুতি দেবার জন্য জনগণকে ডাক দিয়েছেন। এক কথায় যে নূতন ভাব, চিন্তা, দর্শন, আদর্শ ও নীতির দর্পণ ছিল 'বন্দে মাতরম্', সেই ধারারই সর্বপ্রধান প্রচারক হলেন স্বয়ং বিপিনচন্দ্র। তাঁর মধ্যে একদিকে ছিল প্রচারকের নিষ্ঠা ও ধর্মের আবেগ, অন্যদিকে ছিল দার্শনিকের চিন্তা ও রাষ্ট্রবিদের কৌশল।

অরবিন্দ ঘোষের সুযোগ্য পরিচালনায় অল্পদিনের মধ্যেই 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা এদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু 'বন্দে মাতরমের' বহুল প্রচার সত্ত্বেও এর অর্থাভাব ঘোচেনি। ২৩শে সেপ্টেম্বর অরবিন্দ ঘোষ পত্রিকার কর্মচারীদের মাহিনা বাবদ ৩০০ টাকার একটি চেক্ প্রদান করেন ও ঐদিনই 'বন্দে মাতরমের' জন্য একটি জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব করা হয়*(১২)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিপিন পালের অনুপস্থিতিতে অরবিন্দ ঘোষই 'বন্দে মাতরমের' মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ও ঐ পত্রিকার মধ্যমণি-রূপে কাজ করতে থাকেন। প্রথম দুই মাস 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা 'সন্ধ্যা' অফিস থেকে প্রকাশিত হতো। ৮ই অক্টোবর তারিখে ঐ পত্রিকার কার্যালয় ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এর পর ১৮ই অক্টোবর এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পত্রিকা বর্ধিত আকারে ১লা নবেম্বর থেকে ২।১ ক্রীক রো হতে প্রকাশিত হবে; বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ হবেন এর যুগ্ম সম্পাদক, কিন্তু পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকবে না। এতদিন পর্যন্ত (আগষ্ট-অক্টোবর) 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় বিপিন পালের নামই সম্পাদক হিসাবে ছাপা হতো। সম্পাদকের নামবিহীন অবস্থায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশের এই নূতন পরিকল্পনার পশ্চাতে 'ডন সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবও লক্ষণীয়। এই সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের আবহাওয়ায় অরবিন্দ ঘোষ সতীশ

*(১২) শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ১৯০৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসের অপ্রকাশিত "রোজ-নামচা" দ্রষ্টব্য।

মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। দেশ-মাতৃকার পূজার আয়োজন যেখানে, সেখানে পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকলে সেবার আদর্শ ব্যহত হতে পারে, এই ছিল সতীশবাবুর ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি তাঁর 'ডন' মাসিকে সম্পাদকের নাম ছাপতেন না এবং অধিকাংশ সময়েই 'ডনে' ও অন্যান্য পত্রিকায় বিনা নামে প্রবন্ধ লিখতেন। সম্ভবত একই কারণে অরবিন্দ ঘোষও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা থেকে সম্পাদকের নাম তুলে দিতে চেয়েছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রে সম্পাদকের নাম না থাকার পেছনে অবশ্য এই নৈতিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক কারণও বর্তমান ছিল* (১৩)।

'বন্দে মাতরমের' নব-সংস্করণ প্রকাশ প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র দেব তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছেন: "সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে সকলে সমবেত হইলেন। সেখানে তাঁরা ছয় হাজার টাকা তুলিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং উপাধ্যায় মহাশয় 'সন্ধ্যা' প্রেসে পত্রিকাখানি ছাপিয়া দিবেন দুই মাসের জন্য এই অঙ্গীকার করিলেন প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পানের পক্ষ হইতে। এই ছয় হাজার টাকা চাঁদা সভাস্থলেই স্বাক্ষরিত হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ, রজতনাথ রায় ও সুবোধচন্দ্র মল্লিক জনে এক হাজার টাকা দিবেন; কুমারকৃষ্ণ দত্ত, শরৎচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ হালদার ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জনে পাঁচ শত টাকা দিবেন। বাকী দুইজনের নাম মনে নাই।" কিন্তু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, নবেম্বর মাস থেকে 'বন্দে মাতরমের' আর্থিক দায়িত্ব মূলত সুবোধচন্দ্র মল্লিককেই বহন করতে হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মামলায় সুবোধ মল্লিকের সাক্ষ্য (সেপ্টেম্বর ২, ১৯০৭) থেকেও জানা যায় যে, অক্টোবর মাসে তিনি 'বন্দে মাতরম্' কোম্পানীর ডিরেক্টর নিযুক্ত

* (১৩) 'ইতিহাস' ত্রৈমাসিকে (মে, ১৯৫৩) উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের "জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

হন এবং ১৯০৭-এর জুলাই পর্যন্ত ঐ পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন* (১৪)।

'বন্দে মাতরমে' সম্পাদকের নাম না থাকায় ও নূতন প্রস্তাবে বিপিন পালের সম্মতি না থাকায় ২৪শে অক্টোবর থেকে তিনি পত্রিকা অফিসে আসা বন্ধ করেন, কিন্তু তখন পর্যন্তও পত্রিকায় লেখা দিতে থাকেন* (১৫)। এই সময় আরও স্থির হয় যে, পত্রিকার একই পাতায় সংবাদ ও বিজ্ঞাপন পাশাপাশি পরিবেষণ করা হবে, কারণ এতে অর্থাগমের সম্ভাবনা। এই সিদ্ধান্তেও বিপিনবাবুর ছিল ঘোরতর আপত্তি। তাঁর মতে এর ফলে পত্রিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ৩১শে অক্টোবর তিনি পত্রিকা অফিসে এসে এই বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ জানান* (১৬)। যাই হোক, এ প্রকার মতান্তরের মধ্যেও 'বন্দে মাতরম্' ১লা নবেম্বর (১৯০৬) ২।১, ক্রীক রো থেকে নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ যুগ্ম-সম্পাদকরূপে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, যদিও কারও নামই ১লা নবেম্বরের পর আর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। একদিকে প্রচারকার্যের তাগিদ ও অন্যদিকে কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে 'বন্দে মাতরমের' জনক বিপিন পাল ক্রমশই ঐ পত্রিকা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ১৭ই ডিসেম্বরের 'বন্দে মাতরমে' প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে বিপিন পাল ঐ পত্রিকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন* (১৭)।

'বন্দে মাতরমের' সঙ্গে বিপিন পালের বাহ্যিক যোগাযোগ ছিন্ন হলেও

* (১৪) 'বেঙ্গলী' সেপ্টেম্বর ৩, ১৯০৭—'বন্দেমাতরমের' মামলা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

* (১৫) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ১৯০৬-এর অক্টোবর মাসের অপ্রকাশিত 'রোজ্-নামচা' দ্রষ্টব্য।

* (১৬) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ১৯০৬ সনের অক্টোবর মাসের অপ্রকাশিত 'রোজ্-নামচা'।

* (১৭) 'বন্দেমাতরম্', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭—'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের রায় দ্রষ্টব্য।

আত্মিক সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয় নি। যে নব্য রাজনীতির (Extremism) প্রচারক ছিলেন তিনি, 'বন্দে মাতরম্' ছিল সেই ভাবধারারই বিরাট মুখপত্র। কাজেই যে বাণী বজ্র নিনাদে ঘোষিত হতো বাগ্মী বিপিন পালের কণ্ঠে, সেই বাণীই দিনের পর দিন প্রচারিত হতো 'বন্দে মাতরমের' পত্রে-পত্রে। বিপিন পাল ১৯০৭-এর জানুয়ারী মাসে আবার প্রচারকার্যে বহির্গত হন এবং রংপুর (জানুয়ারী ১৮), দিনাজপুর (জানুয়ারী ২০), এলাহাবাদ (ফেব্রুয়ারী ২), কাশী (ফেব্রুয়ারী ৪), হবিগঞ্জ (ফেব্রুয়ারী ১২-১৭), কুমিল্লা (ফেব্রুয়ারী ২১), নোয়াখালী (ফেব্রুয়ারী ২৫), ভোলা (ফেব্রুয়ারী ২৭), বরিশাল (মার্চ ১-৪), ঝালকাঠি (মার্চ ৫), ঢাকা (মার্চ ৭-৯), নারায়ণগঞ্জ (মার্চ ১০), বদরপুর (মার্চ ১২), শিলচর (মার্চ ১২-১৩), বদরপুর (মার্চ ১৫), কটক (এপ্রিল ৯), ভিজেগাপটম (এপ্রিল ১১-১৪), রাজমুণ্ড্রী (এপ্রিল ২৩), মাদ্রাজ (এপ্রিল ৩০) প্রভৃতি স্থানে বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজের উপর বহু বক্তৃতা করেন। ৭ই মার্চ ঢাকায় এক বিরাট জনসভায় তিনি স্বরাজের অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন :

"Swaraj means freedom of a nation from the thraldom of any external influence and complete control over its own affairs."

স্বরাজ লাভের উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকায় ৯ই মার্চের এক সভায় বিপিনচন্দ্র পাল বলেন :

"ফিরিঙ্গীদের জব্দ করতে হলে চাই বয়কট ; কারণ বয়কটের দ্বারাই এদেশে ফিরিঙ্গীদের ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করে তোলা ও তাদের আর্থিক শোষণ বন্ধ করা সম্ভব। এমনকি দরকার হলে গবর্ণমেণ্টকে কর দেওয়াও আমাদের বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন বৃটিশের শাসনযন্ত্রকে পঙ্গু করে ফেলার জন্য জেলায় জেলায় জেলা-বোর্ড ও সমিতি গড়ে তোলা, জনগণের আইন-আদালত খাড়া করা ও অন্যান্য ব্যাপারেও স্বাবলম্বন অভ্যাস করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের চাই শরীর-চর্চা, বিদ্যাভ্যাস ও নৈতিক উন্নতির জন্য

বিদ্যালয় এবং শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন। এইভাবে যেদিন আমরা যথেষ্টরূপে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারব, সেদিনই কেবল আমাদের পক্ষে আবেদন-নিবেদনের পথ বর্জন করা সম্ভব হবে।" বিপিন পাল আরও বলেন, "ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার বিপ্লবীরা যে-যে পথে অগ্রসর হয়ে তাদের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছিল, আমাদেরও সেই পথে অগ্রসর হতে হবে। তিনি জাপান, চীন ও পারস্যের আন্দোলনের নজির দেখিয়ে জনগণের প্রাণে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন"* (১৮)।

যে সময় বিপিনচন্দ্র প্রচারকার্যে এত বেশী ব্যস্ত সে সময় অরবিন্দ ঘোষও পুনঃ পুনঃ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে (নবেম্বর, ১৯০৬ থেকে মার্চ, ১৯০৭) বিশ্রামের জন্য কয়েকবার দেওঘর গমন করেন। অরবিন্দের অনুপস্থিতিকালে 'বন্দে মাতরমের' সম্পাদকমণ্ডলীর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপর ঐ পত্রিকা পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। ৮ই এপ্রিল (১৯০৭) অরবিন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর* (১৯) আবার পূর্ণোদ্যমে পত্রিকা-পরিচালনে আত্মনিয়োগ করেন। ২৭শে জুনের 'বন্দে মাতরমে' "Politics for Indians" নামক একটি প্রবন্ধ এবং ২৬শে জুলাই-এর কাগজে 'যুগান্তরের' কয়েকটি রাজদ্রোহ-মূলক প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশের জন্য 'বন্দে মাতরমের' সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ হেমচন্দ্র বাগচি ও মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়,—যথাক্রমে আগষ্ট ১৬, ১৯ ও ২১ তারিখে। এই উপলক্ষ্যে যে মামলার উৎপত্তি তার শুনানী সুরু হয় ২৬শে আগষ্ট। 'বন্দে মাতরম্' অফিস খানাতল্লাসীর সময় 'নিউ ইণ্ডিয়া' অফিস থেকে ২৬শে মে, ১৯০৭ তারিখে বিপিন পাল কর্তৃক 'বন্দে মাতরমের' কোন এক ব্যক্তির নিকট লিখিত একখানি চিঠি পাওয়া যায়। এই পত্রের সূত্র ধরে বিপিন পালকেও ২৬শে আগষ্ট প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ডাকা

* (১৮) তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের পুলিশের রিপোর্ট—Abstract Nos. 11-12 of 1907 and Appendices XXIV and XXV দ্রষ্টব্য।

* (১৯) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের এপ্রিল, ১৯০৭-এর অপ্রকাশিত 'রোজ্-নামচা' দ্রষ্টব্য।

হয় সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য। কিন্তু বিপিন পাল কোর্টে এই মামলায় কোন অংশ গ্রহণ করতে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করেন ও তার কারণ প্রসঙ্গে বলেন :

"Since this prosecution was started I honestly believed that it was unjust and injurious to the cause of popular freedom."

অর্থাৎ জনসাধারণের নাগরিক স্বাধীনতার পথে এই মামলা কণ্টকস্বরূপ।

মামলার দ্বিতীয় দিন ২৯শে আগষ্ট বিপিন পাল অনুরূপভাবেই দৃঢ়কণ্ঠে কোর্টের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে যে "Contempt of Court" চার্জ আনা হয়, তার ফলে ১০ই সেপ্টেম্বর তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এ, এন, সিংহের কোর্টে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৮ ও ১৭৯ ধারানুযায়ী বিপিন পালের ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঐ সময় 'বেঙ্গলী' কাগজে "An Explanation" নামে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকের নিকট লিখিত বিপিনচন্দ্রের এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। কোর্টে বিপিনচন্দ্রের আচরণ অনেকের মনে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছিল, তা' দূরীকরণের জন্য তিনি উক্ত পত্র লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন :

"It is no doubt the duty of every member of society to help the administration of justice for the preservation of the social order and the furtherance of social well-being; but when any prosecution is calculated to frustrate these ends the duty of the individual must necessarily on the self-same ground be different. I honestly believe that prosecutions like that of the 'Bande Mataram' are calculated to stifle freedom of thought and speech in the country and interfere with the civil advancement of the people. Nor are they likely to promote the interests of the public peace. I have therefore conscientious

objections to take any part in such prosecutions. This is why I declined to be sworn in or affirmed as a witness for the prosecution in the 'Bande Mataram' case".

মামলার শেষ দিন (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) কোর্টে বিপিন পালের পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জন দাস এক বিবৃতি পাঠ করেন। 'বেঙ্গলী' পত্রে বিপিনবাবু যেভাবে স্বীয় আচরণ সমর্থন করেছিলেন, এই বিবৃতিতেও তাঁকে অনুরূপভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেখা যায়* (২০)।

প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে ও পরে বক্সার জেলে ছয় মাস অতিক্রান্ত করে ৯ই মার্চ, ১৯০৮ সনে বিপিন পাল আবার মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী এই শুভ দিবসের প্রতীক্ষায় দিন গুণ্‌ছিল। ৯ই মার্চের কয়েক দিন পূর্ব থেকেই এই বীর নেতার যথোপযুক্ত সম্বর্ধনার জন্য ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হয়। 'বন্দে মাতরম্' পত্রে অরবিন্দ ঘোষ এই সময় বিপিন পালকে "the prophet of a great political creed," "their well-loved apostle and teacher" বলে চিহ্নিত করলেন ও দেশবাসীর নিকট আনন্দ উৎসবের দ্বারা এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য আহ্বান জানালেন * (২১)। দক্ষিণ ভারতেও,—যেখানে মাত্র এক বৎসর পূর্বে বিপিনচন্দ্র নব-ভাবের ফোয়ারা ছুটিয়েছিলেন সেখানেও,—অনুরূপ উৎসবের আয়োজন চলতে থাকে। এই উপলক্ষ্যে ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে "বিপিনচন্দ্র স্বাগত সংঘ" নামক কমিটির সেক্রেটারী 'বন্দে মাতরমের' সম্পাদককে এক পত্রে জানান :

"So, in commemoration of his restoration to us (his loving countrymen), it seems expedient that the occasion should be celebrated in rejoicings, festivities and feeding the poor, in

* (২০) 'বেঙ্গলী' আগষ্ট ২৭, ৩০ ; সেপ্টেম্বর ৪, ৫, ১১, (১৯০৭) এবং 'বন্দে মাতরম্' দৈনিক, আগষ্ট ২৮, ৩১ (১৯০৭)-এর সংখ্যায় 'বন্দে মাতরম্' মামলার বিবরণী পাওয়া যাবে।

* (২১) 'বন্দে মাতরম্' সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৮ই মার্চ, ১৯০৮—"A Great Opportunity" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

which way only the country rightly recognises his disinterested devotion to her cause"* (২২).

দক্ষিণ ভারতে নব্য রাজনৈতিক আদর্শের (Extremism-এর) প্রচার ও প্রসারে বিপিনচন্দ্রের বিপুল প্রভাবের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে শ্রীবৈকুণ্ঠম্ থেকে সুব্বিয়ার নামক জনৈক দক্ষিণ ভারতবাসী 'বন্দেমাতরমের' সম্পাদককে কয়েক মাস পূর্বে এক পত্রে লিখেছিলেন :

"All these changes are due to our Bengal's inspired hero Bipin Chandra and to your National Organ, Bande Mataram."

৯ই মার্চ বিপিন পালের কারাগার থেকে মুক্তি লাভের এই শুভ দিনটিতে বাংলা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, বরোদা প্রভৃতি স্থানে দেওয়ালীর ন্যায় আলো ও বাজির উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বহু স্থানে স্কুল-কলেজ, দোকান-পসার পর্যন্ত বন্ধ থাকে। কোন কোন স্থানে ঐদিন দরিদ্র ভোজন করান হয় ও শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। বক্সার থেকে কলিকাতা পর্যন্ত সারা পথে প্রতীক্ষমান দেশবাসী বিপিন পালকে ষ্টেশনে ষ্টেশনে মাল্য, অভিনন্দনপত্র ও টাকার তোড়া দিয়ে ভূষিত করে। বিপুল আনন্দ ও লোক-সমাগমের মধ্যে তাঁকে হাওড়া ষ্টেশনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর বিপিনচন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে এক অভ্যর্থনা সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকালে তিনি আবেগের ভাষায় বলেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্যে আজ যে এত সমাদর ও অভিনন্দনের আয়োজন, তার মধ্যে তিনি জনগণেরই উদ্বেলিত দেশপ্রেমের ব্যাপক প্রকাশ লক্ষ্য করছেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের এই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু ভারত-বাসীর মুক্তি ও মঙ্গল নয়, সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মুক্তিই ইহার কাম্য। তাঁর নিজের ভাষা হলো নিম্নরূপ :

"Remember this that the struggle in which we are engaged just now, is calculated not only to secure the highest

* (২২) 'বন্দে মাতরম' সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৮ই মার্চ, ১৯০৮।

good to our own country or nation, but to further equally the universal ends of the race. We are fighting not for ourselves, not for India alone, nor even for Asia, but for England, Europe and the whole world. The issues of this struggle involve the emancipation of India and the salvation of Humanity"*(২৩). কলেজ স্কোয়ারের সভার কয়েক দিন পর তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী প্রস্তাবিত ফেডারেশন হলের মাঠে আর একটি বিশেষ সভার আয়োজন করে বিপিনচন্দ্রকে পাঁচ হাজার টাকার এক তোড়া প্রদান করে। বিপিনচন্দ্র ঐ টাকা তাঁর প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন* (২৪)।

১৯০৮-এর ২রা মে অরবিন্দ ঘোষ বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হ'লে 'বন্দে মাতরম্' মণ্ডলীর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অনুরোধে বিপিনচন্দ্র পাল পুনরায় 'বন্দে মাতরম্' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মে থেকে আগষ্ট পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' মূলত তাঁরই পরামর্শে ও নির্দেশে পরিচালিত হয়। এই সময়ে তিনি 'বন্দে মাতরমে' যে সকল প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে "The Bed-Rock of Indian Nationalism" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ * (২৫)। ঐ প্রবন্ধদ্বয়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে "spiritual **movement**" বলে চিহ্নিত করেছেন, এবং ভারতের নিছক আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির ঊর্ধ্বেও যে আরও মহান্ উদ্দেশ্য এই আন্দোলনের পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখান।

১৯০৮-এর আগষ্ট মাসে বাংলার এই স্বনামধন্য অধিনায়ক বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে তিলকের আবেদনের সুপারিশের জন্য ও রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে খপর্দে সহ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন।

* (২৩) 'বন্দে মাতরম্', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ২২শে মার্চ, ১৯০৮।

* (২৪) 'বন্দে মাতরম', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৫ই এপ্রিল, ১৯০৮—"Bipinchandra's Reception Meeting" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (২৫) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত *'Bande Mataram' and Indian Nationalism* (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) পুস্তকে এই প্রবন্ধদ্বয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্র-দর্শন

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) ছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন কবি ও শিল্পী, ঋষি ও দার্শনিক, স্বদেশ-প্রেমিক ও বিপ্লব-সাধক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অরবিন্দের জীবনে উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের এক অপূর্ব মিলন ঘটেছিল। এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই অরবিন্দকে বলেছেন "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি"। গৌরবময় স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে লিখেছেন :

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।

বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চির প্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝঙ্কার—
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ

কোথা হ'তে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জ্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ-মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

('নমস্কার', ৭ই ভাদ্র, ১৩১৪)

১৯০৮ সনে অরবিন্দ রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত হন এবং তাঁর কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ইংরেজ বিচারপতি বিচক্রফ্‌টের (Beachcroft) আদালতে রুদ্ধ কক্ষে তাঁর বিচার আরম্ভ হয়। এই মামলায় অরবিন্দের কৌঁসুলি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। মামলা যখন চলছিল সেই সময় দেশবন্ধু অরবিন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "যখন সমস্ত তর্ক বিতর্কের অবসান হবে, যখন উত্তেজনা ও আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং যখন আর তিনি এই মাটির পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন না, তারও বহু পরে মানুষ বলবে, তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমের কবি, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদের ঋষি এবং মানবতার পূজারী। তাঁর দেহাবসানের বহু পরে, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সুদূর সাগর পারের দেশে দেশেও তাঁর বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'বে"* (১)।

নব্য ভারতের স্রষ্টা

যুগ ও পরিবেশের প্রভাব অতিক্রম করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়; কিন্তু যাঁরা অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, তাঁদেরই জীবনে প্রতিবিম্বিত হয় যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—যুগের ভাবনা। শুধু তাই নয়, ক্ষণপ্রতিভাধর মানুষই আবার যুগকে স্বীকার করেও হন যুগোত্তীর্ণ। মানুষ যে সামাজিক পরিবেশের একান্ত দাস নয়, মানুষ যে পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরের দ্বারা নূতন দুনিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম, প্রতিভাদীপ্ত মহামানবের জীবনই তার চরম সাক্ষ্য।

*(১) হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : দেশবন্ধু-স্মৃতি (কলিকাতা, ১৯২৬, পৃ: ১০০-১১৯)

প্রতিভার স্পর্শেই প্রাণ জাগে, সমাজ-জীবনে আসে পরিবর্তনের স্রোত, আরম্ভ হয় নবজীবনের অভিযান—নূতন ইতিহাস হয় রচিত। অরবিন্দের জীবন এই মহাসত্যের এক উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিপ্লব তরঙ্গের মধ্য দিয়ে যে উগ্র জাতীয়তা-বোধের প্লাবন দেশের বুকে নেমে এলো সেই জাতীয়তাবোধের বাণীমূর্তি ছিলেন অরবিন্দ। তাই অরবিন্দের জীবনেতিহাস নবজাগ্রৎ জাতীয় জীবনেরই ইতিবৃত্তে পরিণত হয়েছে।

ইংলণ্ডে ছাত্রজীবন

অরবিন্দের মানস ছিল অত্যন্ত জটিল ও রহস্যময়। পিতার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজী সভ্যতা-প্রীতি ও মাতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি গভীর আনুগত্য। তাঁর জীবনে যে একটা রোমান্টিক ও মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়, তা-ও সম্ভবতঃ তিনি মা'র কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন* (২)। পুরাদস্তুর বিলাতী ভাবাপন্ন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ চেয়েছিলেন তাঁর সন্তানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করে তুলতে। এই উদ্দেশ্যে ডাঃ কৃষ্ণধন অরবিন্দ ও তাঁর অন্যান্য পুত্রদের দার্জিলিং-এ লরেটো বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। তারপর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধন পুত্রদের নিয়ে সস্ত্রীক বিলাত গমন করেন। এই সময় অরবিন্দের বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। কৃষ্ণধন এক ইংরেজ পাদ্রী ড্রিয়েট্ (Drewett) এবং তদীয় পত্নীর উপর পুত্রদের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণধনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, তাঁর পুত্রগণ যেন বিলাতে কোন ভারতবাসীর সংস্পর্শে না আসে অথবা তারা যেন ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়। ড্রিয়েট দম্পতি কৃষ্ণধনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বে অরবিন্দ ভারতবর্ষ, ভারতবাসী, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির কোন পরিচয় লাভ করবারই সুযোগ পেলেন না।

* (২) বিপিনচন্দ্র পাল : Character Sketches (কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ৮২-৮৭)

এইভাবে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্য দিয়েই বিলাতে অরবিন্দের ছাত্র জীবনের প্রথম কয়েক বছর কেটে গেল * (৩)।

নব রূপান্তরের আরম্ভ

একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যাঁকে ইংরেজ বানাবার জন্য এতো তোড়-জোর, যাঁকে ভারতীয় প্রভাব হ'তে সযত্নে দূরে রাখবার এতো প্রয়াস, তাঁকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলাতী ভাবাপন্ন করা গেল না। তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রভাবই কার্যকরী হয়ে উঠলো। ১৮৮৫ সনে তের বছর বয়সে অরবিন্দ ম্যাঞ্চেষ্টার ত্যাগ করে লণ্ডনে এসে সেণ্ট পল বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানে অধ্যয়ন করবার সময়ই তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রতি তাঁর শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। আঠার বছর বয়সে তিনি লণ্ডন হতে এলেন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (৪)। এখানে ক্লাসিক্যাল ট্রাইপোজ্‌ নিয়ে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন ; ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ঐ দুই বিষয়েই তিনি পুরস্কার লাভ করেন। আই-সি-এস্‌ পরীক্ষায় তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সব চেয়ে বেশী নম্বর পাওয়ায় বিস্ময়ের সঞ্চার হলো। আশা হলো তিনি দেবদুর্লভ আই-সি-এস্‌-এর গৌরবময় চাকুরি নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু অদৃশ্য দেবতার অঙ্গুলি নির্দেশে তাঁর জীবনের গতিপথ অভাবিতরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে জীবন যাপন করা সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের সুপ্ত ভারতীয় চেতনা মুকুলিত ও বিকশিত হয়ে উঠলো। ইংলণ্ডে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের সংস্পর্শে এলেন এবং ভারতের নব জাতীয় জীবনের প্রতিভূ স্বরূপ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার কথা জানতে পারেন। তিনি দেখলেন দাদাভাই নৌরজীর সপক্ষে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রচার কার্য, দেখলেন তাঁর

* (৩) *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother* (পণ্ডিচেরী, ১৯৫৩, পৃঃ ৯)

* (৪) এ, বি, পুরানী : *Sri Aurobindo in England* (পণ্ডিচেরী, ১৯৫৬, পৃঃ ২)

পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হবার বিজয়-গৌরব। দাদাভাই নৌরজীর পূর্বে আর কোন ভারতীয় বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হবার গৌরব লাভ করতে পারেন নি। এই সব ঘটনাবলী অরবিন্দের চেতনাকে আন্দোলিত ও আলোড়িত করতে আরম্ভ করলো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রভাবও তাঁর জীবনে লক্ষণীয়। এই যুগে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা ছিল ভারতের জাতীয় জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার এক বিরাট স্তম্ভ বিশেষ। কৃষ্ণধন বাইরে পুরাদস্তুর সাহেব হ'লেও অন্তরে অন্তরে ছিলেন জাতীয়তাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি মাঝে মাঝে বিলাতে ছাত্রদের কাছে 'দি বেঙ্গলী' পাঠাতেন এবং সংবাদপত্রে বর্ণিত ভারতবাসীদের প্রতি ইংরেজের দুর্ব্যবহারের খবরগুলি চিহ্নিত করে দিতেন * (৫)। তাছাড়া অরবিন্দের নিকট লিখিত একাধিক পত্রেও তিনি অত্যাচারী ইংরেজ-শাসনকে ধিক্কৃত করেছেন। দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণধনই প্রকারান্তরে অরবিন্দকে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে সাহায্য করেছেন।

অরবিন্দের জীবনের মর্মমূলে ছিল জাতীয়তাবোধ। তাই অত্যন্ত সহজে ও অবলীলাক্রমে তিনি প্রথম জীবনের ইংরেজী প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে সক্ষম হন। পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনের সহিত সুপরিচিত হবার ফলে তিনি আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেন জাতীয়তাবাদের পথে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি এত বেশী ভারতীয় চিন্তা-ভাবনার দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন যে, সেই বয়সেই তিনি জাতীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় মজ্‌লিসে প্রদত্ত একাধিক বক্তৃতায় অরবিন্দের বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জাতীয়তাবোধের অন্যতম সাক্ষ্য হলো ১৮৯২ অথবা ১৮৯৩ সালে বিলাতের ভারতীয় ছাত্র সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'লোটাস্ অ্যাণ্ড ড্যাগার' নামক সমিতি। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকামী এই গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন অরবিন্দ। এইভাবে

* (৫) *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother*, পৃঃ ১৩.

স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হবার ফলে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, এমন কি আই-সি-এস্ হবার কোন মোহ তাঁর রইলো না * (৬)। তিনি পিতার মুখের দিকে চেয়ে সোজাসুজি চাকুরি প্রত্যাখ্যান করলেন না বটে, তবে সুকৌশলে এবং সুপরিকল্পনানুসারে তিনি অশ্বারোহণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন না এবং এইভাবে তিনি চাকুরি প্রত্যাখ্যানের সংকট এড়ালেন। স্বদেশের আবেদন তিনি শুনতে পেয়েছেন, বিদেশী সরকারের চাকুরী গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। জাতীয়তার নবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ১৮৯৩ সনে দেশে ফিরে এলেন। ইতোপূর্বেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণধন চেয়েছিলেন অরবিন্দকে সাহেব বানাতে, কিন্তু তিনি দেশে ফিরে এলেন একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশপ্রেমিক হয়ে।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার সময় হ'তেই অরবিন্দ কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্যে তিনি দেশের যথার্থ কল্যাণ দেখেছিলেন। উৎসাহে উল্লসিত হয়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে "জীবনদায়িনী নির্ঝর", "সংগ্রামের নিশানী" এবং ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও নীতির "মহামিলনের পবিত্র তীর্থ" বলে অভিহিত করেন। শিক্ষা-দীক্ষার রূপান্তরের মতো তাঁর রাজনৈতিক মতবাদেরও পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন কংগ্রেসী নীতির সমর্থক, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকাকে আর সমর্থন করতে পারলেন না। ফরাসী বিপ্লব-দর্শন তাঁকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করেছিল। তিনি ছিলেন বিপ্লবী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি উপলব্ধি করলেন কংগ্রেস দেশের মাটিতে শিকড় নিতে পারে নি, দেশের অতীত ঐতিহ্যের উপর তার প্রতিষ্ঠা হয় নি। তিনি অনুভব করলেন কংগ্রেসের ধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চার করতে হবে এবং জনসাধারণকে কংগ্রেসের মধ্যে এনে তাকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। বিলাতে থাকবার সময়ই (১৮৯২-৯৩) কংগ্রেসের সহিত অরবিন্দের এই আদর্শগত বিরোধের সূত্রপাত হয়।

* (৬) এ, বি, পুরাণী : *Sri Aurobindo in England*, পৃঃ ৩৭-৪১

ভারতে প্রত্যাবর্তন

১৮৯৩ সনে অরবিন্দ কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে আসবার পর তিনি প্রথমতঃ বরোদার গাইকোয়াড়ের অধীনে রাজস্ব বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন, তারপর তিনি বরোদা কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তখনও তিনি বাংলা জানতেন না। এইবার তিনি আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে এবং ভাবে ও ভাষায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বেদ উপনিষদ এবং মহাকবি কালিদাসের রচনাবলী পাঠ করলেন। তিনি যতই ভারতীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'তে লাগলেন ততই কংগ্রেসের সহিত তাঁর বিরোধিতা বাড়তে লাগলো। তিনি অনুভব করলেন কংগ্রেস বড় বেশী পাশ্চাত্যঘেঁষা, তার আদর্শ একান্তই সীমাবদ্ধ এবং তার অনুসৃত নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি চাইলেন কংগ্রেসকে বাগ্‌-সর্বস্বতা হ'তে উদ্ধার করতে, তাকে স্বাধীনতাযুদ্ধের একটা সত্যকারের কর্ম-পরিষদে রূপান্তরিত করতে। তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করলেন, আবেদন ও নিবেদনের ভিতর দিয়ে ভবিষ্য ভারত গড়ে উঠবে না —ভারতের মুক্তি সম্ভব হবে শুধু আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ইংরেজের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নয়—ইরেজের রাজনীতি ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী হ'তে পারে না। সাত শত বছরে ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় নি, ফ্রান্সে তার চেয়ে অনেক বেশী বড় পরিবর্তন এলো "রক্তস্নান ও বারুদ-শিখার পবিত্রতার" মাধ্যমে। ফ্রান্সে পরিবর্তন এলো সভ্যভব্য নিয়মতান্ত্রিক পথে নয়; সে-পরিবর্তন ঘটালো ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষ নয়, এই পরিবর্তন সম্ভব হলো ফ্রান্সের অগণিত অজ্ঞ অশিক্ষিত সর্বহারা মানুষের ঐক্যবদ্ধ সাধনায়। তারা পাঁচ বছরের ভিতর ভয় ও ভীষণতার মধ্য দিয়ে, 'বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারা'র মধ্য দিয়ে শত শতাব্দীর অত্যাচার

ও অবমাননার অবসান ঘটালো *(৭)। ঐ আলোচনা হতে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়, মন্থর-গতি নিয়মতান্ত্রিক পন্থার পরিবর্তে—দুর্বারগতি বিপ্লব-পন্থার প্রতিই ছিল অরবিন্দের আন্তরিক অনুরাগ।

রাজনীতিতে বিপ্লববাদ

অরবিন্দের বিপ্লবী মানসের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৯৩ সনে। ১৯০৫ সনের পর তিনি যখন স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই সময় তাঁর বিপ্লবী চেতনার পূর্ণ বিকাশ হলো, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলো। তাঁর বিপ্লবী রাষ্ট্র-দর্শনের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে বহু দেশভক্ত পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার পন্থা হিসেবে তিনি দেশের হাতে তুলে দিলেন নিরস্ত্র প্রতিরোধের হাতিয়ার। অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য যে অস্ত্র তিনি দেশের হাতে দিলেন তার মধ্যে ধরা পড়লো তাঁর অপূর্ব রাজনৈতিক প্রতিভা, তাঁর অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা ও অপরিসীম দূরদর্শিতা। নিরস্ত্র সহায়-সম্বলহীন জাতি এই প্রথম একটা হাতিয়ার পেলো যা দিয়ে তারা প্রচণ্ড শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দ্বারা পরিবৃত বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯২০-২১ সনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে যে ব্যাপক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তার মূলে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পাল। বিপিন চন্দ্র পালই এই নব্য-নীতির বাণীকে দেশের দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেন। তাই বলা উচিত নিরস্ত্র প্রতিরোধ দর্শনের যুগ্ম-স্রষ্টা অরবিন্দ ও বিপিন পাল। অরবিন্দের অন্যতম কৃতিত্ব পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ হবে পূর্ণ স্বরাজ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, বিদেশী শাসনের

* (৭) 'ইন্দুপ্রকাশ', সেপ্টেম্বর ১৮, ১৮৯৩

আওতায় সুখী ও সমৃদ্ধ ভারতের পরিকল্পনা বাতুলতামাত্র, এ ধরণের কোন পরিকল্পনা একেবারেই যুক্তিবিরোধী ও অচিন্ত্যনীয় *(৮)।

দ্রষ্টা ঋষির অবদান ত্রয়ী

অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান হলো এই যে, তিনি জাতীয় প্রয়োজনের স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং পূর্ণ স্বরাজকে ভারতের ধ্রুব লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি আবার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার কার্যকরী সংগ্রাম পন্থাও উদ্ভাবন করেন। যুক্তিনিষ্ঠা ও তথ্যের ভিত্তিতে তিনি নিরস্ত্র প্রতিরোধের দর্শন গড়ে তোলেন। এই মহামনীষীর তৃতীয় অবদান হলো জনগণের মনে মাতৃভূমির নূতন ধ্যানের আবেগ জাগিয়ে তোলা। মাতৃভূমি তাঁর কাছে এক বিশাল ভূখণ্ড বা অগণিত মানব সমষ্টি মাত্র নয়, মাতৃভূমি প্রকৃতপক্ষে দেশ জননী—প্রত্যেক দেশভক্তের পরম আরাধ্যা দেবী। স্বদেশের মধ্যে তিনি স্বয়ং জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করলেন। এই উপলব্ধিতে তিনি আত্মহারা হয়ে দেশবাসীকে আহ্বান করলেন জগজ্জননীর সেই রূপ দেখবার জন্য। দেশপ্রীতি তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রে পরিণত হলো, জাতীয়তাবোধ হলো তাঁর পরম ও চরম ধর্ম *(৯)। এই দেশপ্রীতি ও জাতীয়তার মর্মবাণীই অরবিন্দ বারবার প্রচার করেছেন 'বন্দেমাতরম্'

*(৮) পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান হিসাবে স্বাধীনতার যে আদর্শ অরবিন্দ প্রচার করেছেন তার জন্য "The Shadow of the O·dinance in Calcutta" (দৈনিক 'বন্দেমাতরম্', ১১ই অক্টোবর, ১৯০৭), "The Prairie on Fire" (সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্', ২৭শে অক্টোবর, ১৯০৭), "The Indignant Statesman: Ignorance or Sycophancy" (সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্', ২৪শে নবেম্বর, ১৯০৭) এবং "A Real National Assembly" (সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্', ১লা ডিসেম্বর, ১৯০৭) শার্ষক অরবিন্দের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

*(৯) শ্রীঅরবিন্দের *The Doctrine of Passive Resistance* (কলিকাতা, ১৯৪৮, পৃ: ৮৩-৮৪) দ্রষ্টব্য এবং সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডস্-এ রক্ষিত ১৯০৫ সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখে স্ত্রীর নিকট লিখিত অরবিন্দের পত্রখানিও পঠিতব্য।

পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন, "স্বাধীন ভারত এক খণ্ড লোষ্ট্র বা কাষ্ঠ নয়, তাকে খোদাই করে একটা জাতিতে পরিণত করা যায় না। স্বাধীন ভারত রয়েছে তাদের অন্তরে যারা স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল। হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা দিয়েই স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে হবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তি-কামনা যেমন তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে রাখে তেমনি জাতীয় নব জাগরণের আশায় মুক্তি-পিপাসু মানুষের সমস্ত সত্তা তদ্গত হওয়া দরকার। নামহীন সন্ন্যাসীর ত্যাগের মতই আমাদের করতে হবে সর্বস্ব ত্যাগের সাধনা। শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের জন্য যে উন্মাদনা অনুভব করতেন, দেশমাতৃকার স্বাধীন গৌরবদীপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমাদেরও অন্তরে সেই উন্মাদনা জাগা দরকার। জগাইমাধাই যে উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত রাজকার্য পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন, আমাদেরও সেই উদ্দীপনা ও আবেগের সঙ্গে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যদি কোন কার্পণ্য আমাদের পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের পরিপন্থী হয়, যদি লাভ-লোকসানের হিসাব আমাদের ত্যাগ-স্বীকারকে খণ্ডিত করে, যদি কোন দ্বিধা ও সন্দেহ আমাদের আশা ও উৎসাহকে স্তিমিত করে দেয়, যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা আমাদের দেশপ্রেমকে কলুষিত করে, তাহ'লে দেশজননী তৃপ্তা হবেন না, আমাদের কাছে ধরা দেবেন না * (১০)।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে দ্রষ্টাঋষি ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী নেতা হিসাবে অরবিন্দের অবদান প্রায় তুলনাবিহীন। বরোদায় অবস্থানকালে অরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় "পুরাতন প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ" (New Lamps for Old) নাম দিয়ে পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন এবং "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" নামে সাতটি রচনা প্রকাশ করেন (১৮৯৩-৯৪)।

*(১০) সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত "The Demand of the Mother" শীর্ষক প্রবন্ধ (১২ই এপ্রিল, ১৯০৮) দ্রষ্টব্য। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত *India's Fight for Freedom* (কলিকাতা, ১৯৫৮) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে ঐ প্রবন্ধ পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে।

এই সব রচনাবলীর ভিতর অরবিন্দের রাষ্ট্র-দর্শনের প্রাথমিক পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর রাষ্ট্রিক চিন্তাধারার বিবর্তনের এক জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য "ভবানী মন্দির" শীর্ষক পুস্তিকা। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সহযোগিতায় ১৯০৫-০৬ সনে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার সময় তিনি এই পুস্তিকা রচনা করেন* (১১)। তাঁর রাষ্ট্র-দর্শন পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' এবং দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। স্বদেশী-যুগের ভাব ও ভাবনা প্রচারের দুই প্রধান বাহন ছিল 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা। 'বন্দেমাতরম্'-এর পর প্রকাশিত হয় ইংরেজীতে 'কর্মযোগিন্' এবং বাংলায় 'ধর্ম' নামক পত্রিকা। পণ্ডিচেরী চলে যাবার পূর্ববর্তী যুগের চিন্তাধারার সাক্ষ্য বহন করে 'কর্মযোগিন্' এবং 'ধর্ম' নামক পত্রিকায় প্রচারিত অরবিন্দের রচনাবলী।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

উনবিংশ শতকে ভারতে যে মুক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার মূলে ছিল নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য যুক্তিনিষ্ঠার দ্বারা অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে ওঠায় রাজা রামমোহন রায় উল্লসিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সত্যকারের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকারী। তারা ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়েছিল, ইংরেজের ন্যায় ও নীতিবোধের প্রতি ছিল তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তাই দেখতে পাই

*(১১) *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother*,(পৃঃ ৮৫)। "ভবানীমন্দির" রচনাটি এখনও পশ্চিমবঙ্গের আই. বি. বিভাগে রক্ষিত *IV*|*959* নম্বর ফাইলে দেখতে পাওয়া যায়। রচনাটি সম্প্রতি *Sri Aurobindo Mandir Annual*-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (আগষ্ট, ১৯৫৬)।

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের সময় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজের প্রতি আনুগত্যে ছিল অবিচলিত, বিদ্রোহ দমনে তারা ইংরেজকে দিয়েছে অকৃপণ সাহায্য * (১২)। ইংরেজ-শাসনের শোষণের স্বরূপ তখনও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে ধরা পড়ে নি, শাসক ও শাসিতের স্বার্থ যে অভিন্ন হতে পারে না, একথা তখনও তারা উপলব্ধি করতে পারে নি। বিরোধের সূত্রপাত হলো উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে। ইংরেজের হাতে সুবিচারের অভাববোধও এই সময়ই তীব্রভাবে অনুভূত হলো। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের ধূমায়িত ক্রোধ ও অসন্তোষ দাবানলের মতো জ্বলে উঠলো ইল্‌বার্ট বিলের (১৮৮৩) বাগ্‌বিতণ্ডার মাধ্যমে। ইংরেজ শাসক ভীত ও বিচলিত হলো, তারা বুঝতে পারলো মরা গাঙে বান ডেকেছে, মৃতদেহে জীবনের আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে * (১৩); তারা বুঝতে পারলো জাগরণের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য যে অনির্বাণ অসন্তোষের প্রয়োজন তার ভূমিকা রচিত হয়েছে* (১৪)। শিক্ষিত ভারতবাসীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যেন প্রলয় শিখায় জ্বলে না ওঠে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অকস্মাৎ সংঘাতে যেন শাসন ব্যবস্থা ভেঙে না পড়ে, সেইজন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত ইংরেজ শাসক 'ভূতপূর্ব একজন বৃটিশ আই-সি-এস্ অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউমের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)।

* (১২) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ" (ডিসেম্বর, ১৯৫৭) এবং কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত *Native Fidelity* (১৮৫৯; ১৯০৫-এ পুনর্মুদ্রিত) গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। "নেটিভ ফাইডেলিটি" সমসাময়িক ঘটনাবলীর এক প্রামাণিক দলিল। সম্প্রতি ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরী এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন (ত্রৈমাসিক 'ইতিহাস', অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৬৪-৬৫) তা একেবারেই যুক্তিহীন ও তথ্য-বিরোধী।

*(১৩) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়: ***The Growth of Nationalism in India*** (১৯৫৭, পৃঃ ৯৮)

*(১৪) ঐ, পৃঃ ৮৬-৮৭

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি

প্রতিষ্ঠিত হবার সময় কংগ্রেসের কোন রাজনৈতিক নীতি ছিল না, বস্তুতঃ একটা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কংগ্রেস প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনের সময়ই (১৮৮৬ সনে) কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক সংস্থায় রূপান্তরিত হ'তে আরম্ভ করলো। জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব জন-জীবনে এক নূতন আশার ও আলোর বাণী বহন করে আনলো, দেশের শিক্ষিত সমাজ জয়ধ্বনি সহকারে তাকে জানালো স্বাগত সম্ভাষণ। প্রথম যুগের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য সুদূর-প্রসারী ছিল না। বর্তমানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে পদক্ষেপ করবার মতো তাঁদের ছিল না শক্তি ও সাহস। তাঁরা ছিলেন আন্তরিকভাবে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার অনুরাগী। তাঁরা বছরের পর বছর ধরে কংগ্রেস অধিবেশনে বৃটিশ শাসনের গুণগান করেছেন এবং ভারতীয়দের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য আবেদন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই ভাবে আট বছর কেটে গেল। কংগ্রেসের অকিঞ্চিৎকর কাজকে বাগাড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষণা করা হতো, তার ব্যর্থতাকেও দেওয়া হতো গৌরবের জয়মাল্য এবং তার দুর্বলতাকে রাখা হতো সযত্নে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু নীরবে নিঃশব্দে বিরোধিতা ও সমালোচনা-সংকট এড়িয়ে যাওয়া আর বেশীদিন তার পক্ষে সম্ভব হলো না। প্রতিবাদ আরম্ভ হলো—বিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করলো। অরবিন্দের মধ্যে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল কংগ্রেসী নীতির কঠিন ও কঠোর সমালোচনা। অরবিন্দের মতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিল বর্তমানের সুবিধাবাদী মানুষের হাতে, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করতে পারে যে মানুষ তার হাতে নয়— "He is the man of the present, but he is not the man of the future"* (১৫)। তিনি আরও বলেছেন, "বাংলাদেশে কংগ্রেস মৃতপ্রায়, প্রতিবছর তার দীনতা বেড়েই চলেছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ—বোনার্জীর দল, ব্যানার্জীর দল, লালমোহন ঘোষের দল—যাঁরা লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের

*(১৫) শ্রীঅরবিন্দ : *Bankim Chandra Chatterji*, পৃঃ ৪৪-৪৫

দুর্লভ মঞ্চে গিয়ে উঠেছেন—তাঁরা যুব সমাজের কল্পনার উপর তাঁদের সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেল্ছেন। মহত্তর এবং আরও উদ্দীপনাময় দেশপ্রেমের দাবি ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠ্ছে; আমরা স্বদেশী ব্যবসায়ীদলের আবির্ভাবের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দেওয়ালের লিখন"* (১৬)। অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র বাইশ বছর সেই সময় তিনি উল্লিখিত অভিমত প্রচার করেন (২৭শে আগষ্ট, ১৮৯৪)। অরবিন্দের এই চিন্তাধারার স্থচনা হয় আরও প্রায় এক বছর পূর্বে। "পুরাতন প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ" শীর্ষক রচনাবলীই আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ।

প্রথম দিকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হাতে। বৃটিশ শাসনের প্রতি ছিল তাঁদের অখণ্ড বিশ্বাস, ইংরেজ শাসনকে তাঁরা মনে করতেন বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ। ইংরেজ শাসকের কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়েই দেশের মুক্তি ঘটানো সম্ভব হবে, এ ধারণা ছিল তাঁদের মনে বদ্ধমূল। স্থতরাং তাঁরা আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবাদের পন্থাই অনুসরণ করতে লাগলেন। অরবিন্দ এ পন্থাকে মনে করলেন মূঢ়বিজ্ঞজনের পন্থা। "পুরাতন প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ" শীর্ষক রচনার প্রথম প্রবন্ধেই তিনি ঘোষণা করলেন, "একজন অন্ধ যদি আর একজন অন্ধকে চালনা করে, তাহ'লে তারা দু'জনেই কি গভীর খাতে গিয়ে পড়বে না? প্রায় কোন ভারতবাসীই এ'কথা স্বীকার করতে চাইবেন না, বস্তুতঃ দু'বছর পূর্বে আমিও নিজে স্বীকার করতে চাইতাম না যে, এ কথা জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে সত্যসত্যই প্রযোজ্য"* (১৭)। কংগ্রেসের কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে অরবিন্দ তার তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা সুরু করলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি জানি যে-সংস্থাকে আমি তিরস্কৃত করছি, তাকে আমার বহু দেশবাসী জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূস্বরূপ জ্ঞান করেন; কেউ কেউ একে সেই পবিত্র আধার বলে বিবেচনা করেন যার ভিতর রয়েছে আমাদের উজ্জ্বলতম

* (১৬) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ৪৭

*(১৭) 'ইন্দু প্রকাশ', ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩

আশা ও মহত্তম আকাঙ্ক্ষা। কেউ বা একে কুহেলী সমাচ্ছন্ন পথের মধ্য দিয়ে সুদূর স্বর্গরাজ্যে আমাদের পৌঁছিয়ে দেবার ধ্রুব তারকা বলে মনে করেন। আমাদের এই বদ্ধমূল ধারণা একটা ফাঁদ ও ছলনা মাত্র, এর পরিণাম অতি অশুভ। এই দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমার না থাকতো তাহ'লে আমি আমার সংশয়কে প্রকাশ না করে নীরবতাই রক্ষা করতাম"* (১৮)। এই উক্তির মধ্যে তৎকালীন কংগ্রেসের প্রতি অরবিন্দের মনোভাব অত্যন্ত অকপটভাবে ধরা পড়েছে।

"পুরাতন প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ"

অরবিন্দ কংগ্রেসের কর্মনীতিতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি ; কংগ্রেস রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপের সাহায্যে অসম্ভব কিছু করবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। কংগ্রেসের প্রতি চিন্তাশীল মানুষের মনোভাব কি হওয়া উচিত তার নিপুণ বিশ্লেষণ করে তিনি "পুরাতন প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ" শীর্ষক রচনাবলীর সূত্রপাত করেন। তিনি লিখেছেন, মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যে মহাপুরুষ দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন, পরবর্তী জীবনে পিছিয়ে পড়লেও তিনি আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের কল্যাণ সাধন করতে পারে ততক্ষণই ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল্য, অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান চিরকাল গৌরব দাবি করতে পারে না। কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন দেশবাসীর অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না, দেশবাসী কংগ্রেসকে মনে করতো স্বাধীনতার শুক-তারা। সেদিন দেশবাসী মনে করেছিল যে, কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিফলিত হবে দেশের মহত্তম আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কংগ্রেস হবে মরুদেশে জীবনদায়িনী নির্ঝরিণী, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রদীপ্ত পতাকা, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের পবিত্র মহামিলন-তীর্থ *(১৯)। যে অপরিমিত আশা, আনন্দ ও উল্লাস একদিন দেশের এক প্রান্ত হ'তে

*(১৮) ঐ, ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩

*(১৯) ঐ, ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩

অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো। যতদিন ভারতবর্ষ ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল ততদিন তার আত্মতুষ্টির ব্যাঘাত হয় নি, কিন্তু ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই সে বিচার করতে শুরু করলো, তার হৃদয়ে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠলো। অবশ্য তখনও কিছু সংখ্যক মানুষ ছিল মোহগ্রস্ত। তারা তখনও বিশ্বাস করতো কংগ্রেস অসাধ্যসাধন করবে। অরবিন্দ এ কথা স্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর মতে প্রথম যুগের কংগ্রেসের সাফল্যের কথা ফিরোজ শা' মেটা ও মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি নেতা অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে বলেছেন। অরবিন্দের নিজের ভাষায়, "আমার মনে হয় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হলো লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্‌সিলগুলির আয়তন বৃদ্ধি···অন্য সব রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলা যায়—'ব্যর্থতা'।" প্রথম যুগের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ একটু বেশী করেই রাজানুগত্যের কথা প্রচার করতেন, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন, সোজা ভাষায় সত্য কথা বলতে ভীত হতেন, বিদেশী শাসক সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করতে আতঙ্কিত হতেন। প্রথম যুগের এই দুর্বলতা ধীরে ধীরে কেটে যাবে এমন একটা আশা ছিল; কিন্তু সে-আশা সফল হয় নি, বরং এই ভয় ও ভীতি একটা অভ্যাস ও নীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল * (২০)।

অরবিন্দের দৃষ্টিতে প্রথম যুগের কংগ্রেসের সার্থকতা ছিল এই হিসাবে যে, এটা একটা জাতীয় মিলনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু মিলনকেন্দ্র হিসাবেও কংগ্রেস খুব বেশী সাফল্যলাভে সক্ষম হয় নি। কংগ্রেসের পুরাণো নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন, "কংগ্রেস আমাদিগকে একসঙ্গে কাজ করতে শিক্ষা দিয়েছে।" অরবিন্দ প্রতিবাদ করে লিখেছেন, "কংগ্রেস যে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে শিক্ষা দিয়েছে তার সামান্যতম প্রমাণও দেখতে পাওয়া যায় না; আমরা অবশ্য একসঙ্গে কথা বলতে শিখেছি, কিন্তু তা হলো একেবারেই ভিন্ন বস্তু" * (২১)। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, এমন কি মিলনের কাজেও কংগ্রেস

*(২০) 'ইন্দু প্রকাশ', ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩

*(২১) ঐ, ২১শে আগষ্ট, ১৮৯৩

বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি, দেশের অগণিত জনসাধারণকে কংগ্রেস নিজের কাছে টেনে আনতে পারে নি* (২২)। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস যে একটা বলিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মপন্থা পর্যন্ত দেশের হাতে তুলে দিতে পারেনি সে জন্য অরবিন্দ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছেন। আমাদের দৌর্বল্য, আমাদের কাপট্য, নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতার অভাব, ভ্রান্ত পন্থা ও আদর্শের অনুসরণ অরবিন্দকে ব্যাকুল ও বেদনাতুর করে তুলেছিল। তাঁর নিজের ভাষায়, "সুতরাং কংগ্রেস সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হলো, এর আদর্শ ভ্রান্ত, যে মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, নেই পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, যে-পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা ভ্রমাত্মক, এবং যে-সব নেতৃবৃন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে তারা যথার্থ নেতৃত্ব করবার অধিকারী নন। সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান অবস্থা হলো, এক অন্ধ আর এক অন্ধকে চালনা করছে, অন্ততঃ এক কাণা আর এক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে * (২৩)।"

বিজাতীয় কংগ্রেস

ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অরবিন্দই সম্ভবত সর্বপ্রথম হৃতসর্বস্ব নিপীড়িত জনগণের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করেন। অরবিন্দ কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি; তাঁর মতে ১৮৯৩ সনে নিজেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করবার অধিকার কংগ্রেসের ছিল না; কংগ্রেস ছিল তখন মুষ্টিমেয় ধনিক, বণিক ও নবজাগ্রৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র * (২৪)। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। কংগ্রেসের ভিতর সচল প্রাণের গতিবেগ ছিল না, এর নেতৃত্ব ছিল সংকীর্ণ স্বার্থ-সীমিত—দেশের বৃহৎ অংশ অর্থাৎ জনগণ

* (২২) 'ইন্দু প্রকাশ', ২১শে আগষ্ট, ১৮৯৩
* (২৩) ঐ, ২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩
* (২৪) ঐ, ৫ই মার্চ, ১৮৯৪

ছিল কংগ্রেস হ'তে বহুদূরে * (২৫)। জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখাই ছিল সে-যুগের নীতি। অরবিন্দ বলেছেন, যে-প্রতিষ্ঠানের সহিত দেশের অধিকাংশ মানুষের কোন যোগ নেই তাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা অর্থহীন* (২৬)। তিনি মনে করতেন প্রকৃতপক্ষে জনগণই একমাত্র দেশের আশা ও আশ্বাসের মূল উৎস * (২৭)। জনতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, জাগ্রৎ গণদেবতাই হবে স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোধা। তাই তিনি বারবার বলেছেন, স্বদেশপ্রেমিক প্রত্যেক ভারতবাসীর 'প্রথম ও পবিত্রতম কর্তব্য' হলো দেশের মূলশক্তি জনগণকে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। "আজ জনগণের কোন চেতনা নেই, তারা অসাড় হয়ে আছে, কোন শক্তির প্রকাশই তাদের মধ্যে আজ দেখা যায় না, কিন্তু তাদের মধ্যে অভাবিত শক্তির সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে। যিনি একথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন এবং জনতার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করে তুলতে সক্ষম হবেন, দেশের কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই ধরা দেবে"* (২৮)। ১৮৯৪ সনে এই ছিল দেশবাসীর কাছে অরবিন্দের বাণী। তিনি বেদনার সঙ্গে বলেছেন, আমাদের দেশে নেপোলিয়নের মতো কোন ক্ষণ-প্রতিভার জন্ম হয় নি, তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়েছিলেন অনাগত ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের আশায়। তিনি সেই যুগ-নায়কের অপেক্ষায় ছিলেন উন্মুখ হয়ে যিনি রাজনীতি ও দেশপ্রেমের নবমন্ত্রে জাতিকে দীক্ষা দিতে পারবেন। তাঁর সেই যুগ-মানব মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মধ্যে বাস্তবরূপ পেলো। তিলকই ছিলেন সে-যুগের প্রকৃত নেতা।

বিপ্লববাদের সঙ্গে সংস্কারপন্থার সংঘাত

অরবিন্দ "পুরাতন প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ" রচনাবলীর মধ্যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় কংগ্রেসী নীতির উপর খড়্গাঘাত করেন, কংগ্রেসের দুর্বল,

*(২৫) 'ইন্দু প্রকাশ', ২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩
*(২৬) ঐ , ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৩
*(২৭) ঐ , ৫ই মার্চ, ১৮৯৪
*(২৮) ঐ , ২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩

দ্বিধাগ্রস্ত ও ক্ষুদ্রস্বার্থ-সর্বস্ব নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেশের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর সমালোচনা কংগ্রেসের নিরুপদ্রব নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির মধ্যে নিয়ে এলো অশান্তি ও বিক্ষোভ। নির্মেঘ আকাশে আবির্ভূত হলো ধূমকেতু। পরিবর্তনের দাবি শ্রুত হলো, ধ্বনিত হলো চাই নূতন কর্মপন্থা, চাই বৈপ্লবিক চেতনা, চাই প্রাণোন্মাদিনী দেশভক্তি। অরবিন্দ ঘোষণা করলেন, "উদাসীন বেল্‌সাজারের মতো কংগ্রেস আর কতদিন পরস্পরের প্রশংসা-গুঞ্জরিত উৎসব-সভা সাজিয়ে বসে থাকবে? ইতঃপূর্বেই বিচারের রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে, যাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ তারাও দেখতে আরম্ভ করেছে, কারণ ইহা কি রক্তের অক্ষরে লিখিত হয় নি? দেওয়ালের লিখনের প্রথম বাক্যটি হলো: 'বিধাতার বিচারে রাজত্বের অবসান ও বিলুপ্তি ঘটেছে।' এই রূঢ় শিক্ষালাভের পরও কি আমরা চোখকান ঢেকে বসে থাকবো যতক্ষণ না আবার অদৃশ্য হস্ত এগিয়ে আসে এবং অধিকতর কঠোর ভাষায় দ্বিতীয় বাক্যটি লেখে: 'তোমাকে বিচার করে দেখা হয়েছে, তুমি অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছো।' অথবা আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো যতক্ষণ না সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব আমাদের চেয়ে যোগ্যতর মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে"* (২৯)? অরবিন্দের সমালোচনা নিষ্ফল হয় নি; তাঁর সমালোচনায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভীত ও বিচলিত হলেন, কংগ্রেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মর্মান্তিকভাবে আহত হলেন* (৩০)। 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কেম্‌ব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী কে, জি, দেশপাণ্ডে। রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করা হলো, এবং ভবিষ্যতে যেন এ জাতীয় কোন রচনা উক্ত পত্রে প্রকাশ করা না হয় তার জন্যও তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হলো। ফলে 'ইন্দু প্রকাশে' অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিপূর্ণ রূপ

* (২৯) 'ইন্দু-প্রকাশ,' ২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩

* (৩০) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ: *Aurobindo—The Prophet of Patriotism* (কলিকাতা, ১৯৪৯, পৃঃ ৬-৭)

প্রকাশিত হতে পারলো না। তিনি তখন বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করলেন এবং তার মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে কংগ্রেসী নীতি ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ সংহত করলেন। এই আক্রমণের সাক্ষ্য 'ইন্দু প্রকাশে' প্রচারিত তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক রচনা সপ্তক।

বরোদা হ'তে বাংলায় আগমন

প্রথম যৌবনের উত্তেজনাপূর্ণ যুগের পর অরবিন্দের জীবনে নেমে এলো একটা কর্মবিহীন বিজন সাধনার পালা; এই নীরব সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে এলো আমূল পরিবর্তনের স্রোত। বরোদায় বসে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখলেন ভারতের রাজনৈতিক গতি ও প্রকৃতির দিকে, তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করলেন সেই রাজনীতির গতি পরিবর্তনের স্বরূপ ও তার বাস্তব সমস্যাগুলি। এই ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তিনি গুপ্তভাবে দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধ একদল ত্যাগব্রতী কর্মীসংঠগনে আত্মনিয়োগ করলেন। বিপ্লব-পন্থায় দেশকে স্বাধীন করবার একটা উন্মাদনা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। জনসাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত এই যে, অরবিন্দ ছিলেন "সর্বপ্রকার হিংসাত্মক নীতি ও কর্মকৌশলের বিরোধী।" এই ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি "নপুংসক নীতিবাগীশ ছিলেন না, অথবা তিনি ভীরু শান্তিবাদীও ছিলেন না" * (৩১)। তাঁর জীবনই তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাক্ষ্য। বোম্বাই শহরে গুপ্তসমিতির সহিত তাঁর যোগাযোগ, সেই গুপ্তসমিতিতে তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ, আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে তিলকের ("বিপ্লবীদলের একমাত্র সম্ভাব্য নেতার") সহিত তাঁর সাক্ষাৎকার ও আলাপ আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে সেই সময়কার অরবিন্দের মনের গতি ও প্রকৃতি। বরোদা হ'তে তিনি সহকর্মী যতীন

*(৩১) ***Sri Aurobindo on Himself and on the Mother,*** (পৃঃ ৪০) এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ" গ্রন্থ (কলিকাতা, ১৯৫৬) বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্রষ্টব্য।

বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে পাঠালেন বিপ্লবের ক্ষেত্র সুপ্রস্তুত করবার জন্য *(৩২)। এই গেল একদিক, অন্যদিকে "ভবানী মন্দিরে" প্রকাশিত মতবাদ তাঁর রাজনৈতিক মতপরিবর্তনের আর এক অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। অরবিন্দ

*(৩২) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ" (পৃঃ ৪১) পঠিতব্য। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার আই. বি. রেকর্ডস্ L. No. 54-A ফাইলও দ্রষ্টব্য। এই সরকারী সূত্র হ'তে জানা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পূর্বেই (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) অরবিন্দ সুদূর বরোদা হ'তে "বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। বরোদা হ'তে তিনি প্রথমত গাইকোয়ারের সেনাবিভাগের এক সৈনিক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং নিজ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে বাংলায় স্বাধীনতার বাণী প্রচার করবার জন্য প্রেরণ করেন।" তাঁরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুর পরিবারের কোন কোন ব্যক্তি, স্বামী বিবেকানন্দ, মিস্ সরলাবালা ঘোষাল, পি, মিত্র, সি, আর, দাস, বিজয় চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বহু ব্যারিষ্টারের সহিত দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নি, কিন্তু মনে হয় প্রায় ঐ সময়েরই কাছাকাছি কলিকাতা এবং মফঃস্বলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সমিতি গড়ে উঠে। এই সব সমিতি বাহ্যতঃ বিপ্লবপন্থী ছিল না, তবে তাদের শেষ লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন ও বৃটিশ শাসনের ধ্বংস সাধন (পৃঃ ১)। এই সরকারী সূত্র হ'তে আরও জানা যায় যে, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় এসেছিলেন ১৯০১ সনে আর বারীন্দ্রকুমার বাংলায় প্রথম এসেছিলেন ১৯০২ সনের একেবারে গোড়ার দিকে (পৃঃ ১ এবং ১২)। বারীন্দ্রকুমার সমগ্র বাংলা পরিভ্রমণ করে "যুবকদের বিপ্লবের কাজে উৎসাহিত করতে ও পরাধীনতার গ্লানি হ'তে দেশকে মুক্ত করবার" উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের সমিতি স্থাপন করেন এবং তারপর ১৯০৩ সনের মাঝামাঝি বরোদায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরবিন্দের কাছে আবার ফিরে যান। "ঐ বৎসরের শেষ দিকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর সমিতির (কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটের সমিতির) সভ্যদের ঝগড়া হয়; উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বিরাগ ও বিরক্তির সঙ্গে বাংলাদেশ ও বিপ্লবী আন্দোলন পরিত্যাগ করে চলে যান। মনে হয় এর পর তিনি সাধুর জীবন গ্রহণ করেন" (পৃঃ ১)। ১৯০৪ সনে বারীন্দ্রকুমার আবার তাঁর রাজনৈতিক কাজ সুরু করবার জন্য কলিকাতায় ফিরে এলেন, এবং "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে সভ্য সংগ্রহ করবার" চেষ্টা আরম্ভ করেন। এইভাবে তিনি "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য একটি বিপ্লবী দল গঠন করতে চাইলেন। এই সব পরিকল্পনা ও কাজকর্মের পশ্চাতে ছিল অরবিন্দের অদৃশ্য হস্ত। সমসাময়িক পুলিশ রিপোর্ট হ'তে জানা যায়, অরবিন্দ ছিলেন 'যুগান্তর' দলের প্রধান নেতা এবং "অন্য যে-কোন মানুষের চেয়ে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের উপর অরবিন্দের প্রভাব ছিল ঢের বেশী" (পশ্চিমবঙ্গের আই. বি. রেকর্ডস্ L. No. 47 ও L. No. 137)। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে অনুসন্ধান করেও জানা গেছে যে, অরবিন্দ ছিলেন 'যুগান্তর' দলের মূলশক্তি, 'যুগান্তর' দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকায়ও অরবিন্দ অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায়, বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলাদেশে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে উঠে তার অগ্রদূত ও অন্যতম প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং অরবিন্দ।

এই আন্দোলনকে মনে করলেন বিধাতাপ্রেরিত আশীর্বাদ স্বরূপ। তিনি আর কালবিলম্ব না করে বরোদা হ'তে চলে এলেন বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র কলিকাতায় এবং বিপ্লবের প্রতীক নবগঠিত 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে' নাম মাত্র বেতনে গ্রহণ করলেন অধ্যক্ষের পদ। জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবার জন্য তিনি এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলায় আবির্ভূত হলেন (১৯০৬)। বাংলায় এসেই তিনি জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি কংগ্রেসের ভিতর এক নূতন চেতনার সঞ্চার করলেন—বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে সংগঠিত করলেন চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী দল। জাতীয়তাবাদী দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা প্রচারের জন্য তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় দিনের পর দিন লেখনী চালনা করতে লাগলেন। 'বন্দেমাতরম্' উদাত্ত কণ্ঠে অবসাদ ক্লান্ত জাতিকে আহ্বান জানালো উঠে দাঁড়াতে, দেশমুক্তির জন্য অফুরান দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করতে। এই ভাবে জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হলো নব রূপান্তর, সুরু হলো স্বরাজের জন্য নূতন সংগ্রাম* (৩৩)।

ভারতের স্বরাজ সাধনা

অরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শনের সব চেয়ে বড় কথা ছিল স্বরাজ লাভ। ভারতবর্ষ বিদেশী সাম্রাজ্যের অধীনে থাকবে এ কথা অরবিন্দের মনে কোনদিনই স্থান পায় নি। তিনি বিশ্বাস করতেন বিদেশী শাসন ও সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত হ'য়ে ভারতবর্ষকে বাঁচতে হবে। তিনি ঘোষণা করেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটা জাতির প্রাণবায়ু স্বরূপ। সর্বপ্রথম রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা না করে সমাজ, শিক্ষা, শিল্প ও নৈতিক উন্নতির প্রয়াস হবে

*(৩৩) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় : *'Bande Mataram' and Indian Nationalism* (কলিকাতা, ১৯৫৭) এবং *India's Fight for Freedom* (১৯৫৮, পৃ: ১৭১-৭৫, ১৭৯-৮৪) দ্রষ্টব্য।

চরম ব্যর্থতা ও মূঢ়তার পরিচায়ক"* (৩৪)। ইতিহাস পাঠ করে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত একটা জাতি বড় হ'তে পারে না, জগৎ-সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার লাভ করতে পারে না* (৩৫)। সুতরাং অরবিন্দ বললেন, এখন আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারকা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন; এ বিষয়ে তাঁর কোন দ্বিধা, সন্দেহ বা দুর্বলতা ছিল না। তিনি জানতেন বিনা সংগ্রামে স্বাধীনতা আসবে না, স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রাম অনিবার্য। অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের জন্য তিনি জাতিকে প্রস্তুত করতে লাগলেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। জাতির অন্তরে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রৎ করবার জন্য তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকলো না। দুর্গমের দুর্গ হ'তে জাতির জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি হলেন বদ্ধপরিকর। তিনি লিখেছেন, "পৃথিবী ভারতবর্ষকে চায় এবং স্বাধীন ভারতই চায়। তার এখন কর্তব্য হলো বেদান্তের আদর্শের ভিত্তিতে জীবনকে গঠিত করা, কিন্তু বিদেশী শাসন ও সভ্যতার আওতায় এ কর্তব্যপালন সম্ভবপর নয়। তাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে হবে, কোন বিদেশী সাম্রাজ্যের অংশ বা অধীনস্থ হয়ে থাকা তার চলবে না। ভারতীয় সভ্যতা অ্যাংলো-স্যাকসন্ সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী, এ্যাংলো-স্যাকসন্ জাতির মানসগঠন ভারতীয় প্রকৃতির একেবারে বিপরীত। এই সভ্যতাবাহী সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ভারতবর্ষের কোন ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না"* (৩৬)।

সে-যুগের চরমপন্থী রাষ্ট্রনেতা বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো কেন অরবিন্দ ঘোষও স্বরাজের উপর এতটা জোর

*(৩৪) শ্রীঅরবিন্দ : *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ: ৩

*(৩৫) দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত (২১শে অক্টোবর, ১৯০৭) "The Rakhi Day" শীর্ষক অরবিন্দ লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

*(৩৬) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় : *'Bande Mataram' and Indian Nationalism* (পৃ; ৮৫-৮৬)

দিয়েছেন ? স্বরাজ তাঁর কাছে একটা নিছক স্বপ্ন বা কল্পনার সামগ্রী ছিল না, তিনি স্বরাজকেই জাতীয় পুনরুত্থানের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী পন্থা বলে বুঝেছিলেন। শতবর্ষব্যাপী বৃটিশ শাসনের ফলে জাতির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, নৈতিক বল বিলুপ্ত হয়েছে, ধী-শক্তি হয়েছে অবনমিত এবং রাজনৈতিক দিক হতে তারা হয়ে পড়েছে ছিন্নভিন্ন। এই তো বৃটিশ শাসনের ইতিহাস। অরবিন্দের নিজের কথা, "এ শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হ'তে পারে না, ইহা বিধাতার বিধানের বিরোধী এবং মানুষের যুক্তি-নিষ্ঠার পরিপন্থী। নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলে এই শাসন-ব্যবস্থা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে"* (৩৭)। এ দেশে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে এই ছিল নবজাগ্রৎ ভারতের দ্ব্যর্থহীন অভিযোগ। তাই সর্বক্ষেত্রে নবজীবন লাভের জন্য ধ্বনিত হলো—চাই স্বাধীনতা, চাই রাজশক্তির অধিকার। পরাধীন অবস্থায় ভারতবর্ষ কখনই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না, পারা সম্ভবও নয়। অরবিন্দ স্বরাজ চেয়েছিলেন কারণ একমাত্র স্বরাজের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারবে, তার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব হবে * (৩৮)।

অরবিন্দ যে স্বরাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পাশ্চাত্য হ'তে আমদানি-করা জিনিষ নয়, সে স্বরাজ হলো "স্বদেশী স্বরাজ"। তাঁর দৃষ্টিতে স্বরাজের

*(৩৭) বিস্তৃত 'ববরণের জন্য হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত '*Bande Mataram' and Indian Nationalism* গ্রন্থ এবং ১৯০৮ সনের *The Confidential Report on the Native-owned English Newspapers in Bengal*, No. 15, পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩ দ্রষ্টব্য। অরবিন্দ লিখিত "The New Ideal" শীর্ষক রচনা হতে সুদীর্ঘ অংশ সমূহ উক্ত সরকারী গোপন রিপোর্টে উদ্ধৃত করা হয়েছে। "The New Ideal" প্রবন্ধটি "বন্দে-মাতরম্" পত্রিকায় (৭ই এপ্রিল, ১৯০৭) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ইংরেজের কুশাসন বা অত্যাচারের জন্য নয়। স্বাধীনতা মানুষের একটা মৌলিক অধিকার, এই অধিকারের ভিত্তিতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন (*Sri Aurobindo on Himself and on the Mother* পৃঃ ৭৪)। ১৯০৬-১৯০৮ সালে অরবিন্দ বেনামীতে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মূল সুরের সঙ্গে অরবিন্দের উপরি-উক্ত অভিমতের সামঞ্জস্য করা কঠিন।

*(৩৮) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়: *'Bande Mataram' and Indian Nationalism* (পৃ ৮৪-৮৫) পুস্তকটি এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

লক্ষ্য নিছক রাজনৈতিক অধিকার লাভ নয়। গৌরবময় অতীতের সত্যযুগের প্রত্যাবর্তন, দুনিয়ার মধ্যে শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের স্থান গ্রহণ ও রাজনীতিতে বেদান্তের মৃত্যুহীন আদর্শকে রূপদান করা হলো ভারতীয় স্বরাজের প্রকৃত তাৎপর্য। স্বরাজ বলতে ইহাই অরবিন্দ বুঝতেন। দেখা যাচ্ছে অরবিন্দ 'স্বরাজ' শব্দটি রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও অনেক বেশী ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করতেন ব্যাধিগ্রস্ত পাশ্চাত্যকে নিরাময় করতে পারবে স্বাধীন ভারত। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষ যদি পাশ্চাত্যের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি অনুসরণ করে তাহ'লে ভারতবর্ষও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং তা' ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপ কারো পক্ষেই শুভ হবে না। ভারতবর্ষকে যদি আবার বড় হ'তে হয় এবং তাকে বিধাতা-প্রদত্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তাহ'লে ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষই থাকতে হবে। ভারতবর্ষ আত্মসন্ধান পাবে এই আশায় সমস্ত দুনিয়া সাগ্রহে ভারতের মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছে * (৩৯)।

স্বরাজলাভের উপায়

স্বরাজ যদি ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য হয়, তাহ'লে প্রশ্ন উঠবে, স্বরাজলাভ করা সম্ভব হবে কোন পথে? অরবিন্দ বলেছেন, স্বাধীনতা চাইলেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র দেশ-প্রীতির দ্বারা একটা জাতি গড়ে উঠে না। স্বাধীনতা-সৌধ রচনার জন্য তিল তিল করে দিতে হয় আত্মবলিদান। মুখে স্বরাজের কথা বললেই স্বরাজ ধরা দেয় না, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ যখন স্বরাজের জন্য জীবনপণ করবে তখনই শুধু স্বরাজের আবির্ভাব সম্ভব হবে। যারা স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়েছে, স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের বরণ করতে হয়েছে চরম দুঃখ, স্বীকার করতে হয়েছে আত্মবলিদান। দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তারা

*(৩৯) সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্' (১৯শে এপ্রিল, ১৯০৮, পৃ: ৫)

পেয়েছে বিজয়-গৌরবের অধিকার। সুতরাং "যারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চায়, দেশ-জননী যে মূল্য দাবী করেন তাদের সেই মূল্য দিতে হবে।" অরবিন্দ লিখেছেন, "আমরা আত্মশক্তির সাহায্যে শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি ও জাতিগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাই, কিন্তু তার পূর্বে প্রয়োজন স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার জন্য দরকার জাতির নবজন্ম। দেশ-জননী আমাদের কাছে কোন পরিকল্পনা ও পদ্ধতি চান না। আমরা যে পরিকল্পনা ও পদ্ধতির কল্পনা করতে পারি না, তিনি নিজেই আমাদের হাতে তার চেয়েও ভাল পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি তুলে দেবেন। তিনি চান আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রাণ, তিনি এর চেয়ে একটুও কম বা বেশী দাবী করেন না। তিনি চান আমাদের আত্মবলিদান। তাঁর জিজ্ঞাসা, তোমাদের মধ্যে কতজন আমার জন্য বেঁচে থাকতে চাও? তোমাদের মধ্যে কতজন আমার জন্য মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে *(৪০)।" বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের অগ্নিগর্ভ প্রচারের ইহাই ছিল বিশিষ্ট সুর। তিনি স্বদেশপ্রেমকে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করে তাকে ধর্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন *(৪১)। তাঁর কণ্ঠ ও লেখনীকে আশ্রয় করে যে সত্য বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার মর্মকথা হলো, স্বদেশের

*(৪০) শ্রীঅরবিন্দের "The Demand of the Mother" শীর্ষক রচনাটি সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রচারিত হয় (১২ই এপ্রিল, ১৯০৮)। বর্তমানে এই রচনাটি লেখকদের *India's Fight for Freedom* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পৃ: ২৪৯-২৫২)।

*(৪১) সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ "The Life of Nationalism" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (১৭ই নবেম্বর, ১৯০৭) লিখেছিলেন, "দমন নীতির পুনঃপ্রবর্তন, আমলাতান্ত্রিক প্রলোভনের সহায়তায় বিরোধের বীজবপন, ফুলার নীতির সহিত গুণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ, অথবা আইনের আবরণে নিষ্পেষণ—এর কোন কিছুর দ্বারাই জাতীয়তাবোধের ধ্বংস করা যাবে না। জাতীয়তাবাদ অবতার স্বরূপ এবং তাকে হত্যা করা অসম্ভব। জাতীয়তাবাদ বিধাতা কর্তৃক নির্বাচিত অনন্ত শক্তি বিশেষ। যে বিশ্ব-শক্তি হ'তে তার উদ্ভব, তার কাছে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিধাতা-নির্দিষ্ট কর্তব্য তাকে পালন করতেই হবে।"

জন্য চাই আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান *(৪২)। ধীর পদক্ষেপে আত্মপ্রস্তুতির ভিতর দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসবে, এ'কথা অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার জন্য দেশ-জননীর বেদীমূলে আমাদের জীবনের সব চেয়ে প্রিয়বস্তু, এমন কি আমাদের জীবন পর্যন্ত দান করতে হবে। যে ব্যক্তি বা জাতি জুয়ারীর মতো বিরাটলাভের সম্ভাবনায় কপাল ঠুকে ঝুঁকি নিতে ভয় পেয়েছে সে কখনও স্বাধীনতার তোরণদ্বারে এসে পৌঁছতে পারে নি; অতীতে যা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও তারই পুনরাবৃত্তি হবে *(৪৩)।" অরবিন্দ দিনের পর দিন তাঁর সম্পাদনায় পরিচালিত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় এই প্রচার চালিয়েছেন। প্রথম হতেই অরবিন্দ ছিলেন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রাণ-পুরুষ। তাঁর যুক্তি, তথ্য, চিন্তা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্যে যে মনীষা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা সে-যুগের দেশী বা বিদেশী পরিচালিত আর কোন পত্রিকাতেই পাওয়া যায় নি। এই পত্রিকার প্রভাব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং বৃটিশ পত্রিকাগুলি পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অগ্রাহ্য করতে পারে নি। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা হ'তে সুদীর্ঘ অংশসমূহ পুনর্মুদ্রিত হতে লাগলো। ১৯০৯ সনে প্রত্যক্ষদর্শী বিপিনচন্দ্র পাল এক প্রবন্ধে এ'কথা স্বীকার করেছেন *(৪৪)। বস্তুতঃ সে-যুগে আর কোন পত্রিকাই 'বন্দেমাতরম্'-এর মতো জাতিকে এমনভাবে দেশভক্তির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারে নি।

*(৪২) বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত (২৯ শে এপ্রিল, ১৯০৮) "New Conditions" শীর্ষক অরবিন্দের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পঠিতব্য। সেই সঙ্গে ১৯০৮ সনের *Confidential Report on Native-owned English Newspapers in Bengal*, No. 18 নামক সরকারী রিপোর্টও দ্রষ্টব্য।

*(৪৩) *'Bande Mataram' and Indian Nationalism*, পৃ: ৬০

*(৪৪) বিপিনচন্দ্র পাল: *Character Sketches*, পৃ: ৯৪-৯৫

নিরস্ত্র প্রতিরোধের নীতি

জাতীয় মুক্তির জন্য একমাত্র ব্যক্তিগত আত্মত্যাগই যথেষ্ট নয়, তার জন্য দরকার সংঘবদ্ধ আত্মত্যাগ। স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন সমগ্র জাতিকে ত্যাগ ও দুঃখবরণের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। উনবিংশ শতাব্দীর ইতালির মহান নেতা মাৎসিনির মতো অরবিন্দও চেয়েছিলেন প্রথমতঃ সমগ্র জাতিকে নৈতিক বলে অনুপ্রাণিত করতে। কারণ নৈতিক বলে বলীয়ান হবার পরই শুধু একটা জাতি স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা লাভ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সংঘবদ্ধ হবার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের ক্লৈব্য নীতির প্রতি জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান পুরোহিত অরবিন্দের ছিল আন্তরিক ঘৃণা। তিনি মনে করতেন সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামই হলো দুই পরস্পরবিরোধী শিবিরের লড়াই মাত্র; স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হতে হ'লে বিদেশী শাসকের সঙ্গে অনিবার্য নিষ্ঠুর সংঘাতে অবতীর্ণ না হয়ে উপায় নেই। আমরা যতই মুক্তির জন্য বিদেশী শাসকের উদারতার উপর নির্ভর করবো, আমরা ততই দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়বো। আত্মশক্তির সাহায্যে আত্মবিকাশের নীতিতেও তিনি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। বিদেশী শাসকের অধীনে থেকে ঐ নীতি সম্পূর্ণ কার্যকরী করা সম্ভবপর নয় বলে তিনি মনে করতেন *(৪৫)। তাই তিনি বারবার বলেছেন, সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির অধিকার। ১৯০৫-এর আবহাওয়ায় নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছিল অসম্ভব। সুতরাং বিকল্পপথের সন্ধান করতে হলো। অরবিন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় নিরস্ত্র প্রতিরোধের দর্শন প্রচার করলেন *(৪৬)। 'Passive Resistance' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকৌশল হিসাবে নিরস্ত্র প্রতিরোধের ভূমিকা ও তার

*(৪৫) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃঃ ২

*(৪৬) ঐ

স্বদেশী আন্দোলন

ও

বাংলার নবযুগ

অশ্বিনীকুমার দত্ত

প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে লিখলেন, "সুতরাং এখন আমাদের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তুলতে হবে, জাতীয় জীবনের সমস্ত বিভাগগুলি নিজেদের হাতে নিতে হবে, সেই সঙ্গে আমাদের করতে হবে স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা। যদি এখনই সম্ভব না হয়, অন্ততঃ ধীরে ধীরে আমাদের উপর বিদেশী শাসনের প্রভুত্ব যাতে লুপ্ত হয় সেইজন্য আমাদের গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা" *(৪৭)। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করে তিনি বললেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁরা অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়িয়েছেন, নবযুগ ও জাতীয় নব জাগরণের কথা তুলে বাচালতা প্রকাশ করেছেন এবং ব্যর্থ প্রয়াসে অতিবাহিত করেছেন অর্ধ শতাব্দী কাল" *(৪৮)। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন নি, তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতীয় স্বাধীনতা কামনাও করেন নি ; ইংরেজ শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর সংগ্রাম পরিচালনার চেয়ে তাঁরা ইংরেজের অধীনে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করাকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করতেন *(৪৯)। নূতন জাতীয়তাবাদী দলের ধ্যান-ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা চেয়েছিলেন বৃটিশ শাসন ও শোষণের চির অবসান। তাঁরা জানতেন ইংরেজ শাসক সহজে কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করবে না ; তাই তাঁরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সঙ্গে সংগ্রাম করে অধিকার কেড়ে নিতে হলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিরস্ত্র প্রতিরোধ হলো তাঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নিরস্ত্র প্রতিরোধ প্রথম ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ধীরে ধীরে বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হলো এবং সেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হলো, "জনপ্রিয় স্বাধীন সরকারগঠন তথা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন" *(৫০)। স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র প্রতিরোধেরও রূপান্তর হলো এবং এর বৈশিষ্ট্য ব্যাপকতা লাভ করলো।

* (৪৭) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ : ১০-১১
* (৪৮) ঐ, পৃ : ৩ এবং পৃ : ১৩
* (৪৯) ঐ, পৃ : ১৮
* (৫০) ঐ, পৃ : ২২

বয়কটের ভূমিকা

১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বয়কটের ধ্বনি মন্দ্রিত হলো। লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে ভারত সরকার সমগ্র জাতির অভিমতকে ঘৃণার সহিত বর্জন করে; দেশবাসী তার উত্তর দিল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরণের বর্জন-নীতির মাধ্যমে। সেই চরম বয়কটের মুহূর্তে অবমানিত জাতি আত্ম-প্রতিষ্ঠার শেষ উপায় খুঁজে পেলো বর্জননীতির ভিতর। যে জাতীয় আন্দোলন সমগ্র জাতির সত্তাকে আন্দোলিত ও উদ্বোধিত করলো, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই তাকে একটা আধ্যাত্মিক আন্দোলন বলে অভিনন্দিত করেছেন। যে আধ্যাত্মিক জাগরণের ভিতর দিয়ে জাতি এগিয়ে চলেছিল তা প্রকাশিত হলো 'বয়কট', 'স্বদেশী', 'জাতীয় শিক্ষা' ও 'স্বরাজ' সাধনার মধ্যে। ১৯০৮ সনে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, "ভারতের এই নয়া আন্দোলনের মূলশক্তি হলো তার চরম আদর্শ নিষ্ঠা। যদিও এই আন্দোলন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন চেয়েছে, তবু এ আন্দোলন কেবলমাত্র একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন নয়। যদিও এ' আন্দোলন জোরের সঙ্গে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছে, তবুও এ' আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন মূলতঃ একটা প্রবল আধ্যাত্মিক আন্দোলন; এ আন্দোলনের লক্ষ্য নিছক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ নয়—এ' আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ভারতের পৌরুষ ও নারীত্বের যথার্থ মুক্তি সাধনা" *(৫১)।

১৯০৬ সনে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'দি ডন্ ম্যাগাজিন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই আন্দোলনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন *(৫২)। তিনি বিদেশী শাসকের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার আইনসম্মত

* (৫১) *'Bande Mataram' and Indian Nationalism* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (পৃ: ৮৮-৯৬) বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত 'The Bed-Rock of Indian Nationalism' রচনাটি পঠিতব্য।

* (৫২) 'ডন ম্যাগাজিন' পত্রিকায় প্রকাশিত (মে, ১৯০৬) 'The True Character of the Boycott in Bengal' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শেষ অস্ত্র হিসাবে বয়কটকে সমর্থন করেন। অরবিন্দ আরও সোজাসুজি বয়কট সমর্থন করেছেন, বয়কট সমর্থনের জন্য তিনি কোন সর্ত্তই আরোপ করেন নি। বয়কট ঘৃণাসঞ্জাত অথবা এর ফলে নৈতিক মান হ্রাস পাবে এ' কথা তিনি কখনও মনে করতেন না। তিনি লিখেছেন, "বয়কট হলো নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। একে ঘৃণ্য বলার অর্থ হবে, যে-ব্যক্তিকে তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে, তাকে এই বলা যে, আততায়ীর প্রতি প্রত্যাঘাত করা তার পক্ষে অন্যায়। ঘৃণার কাজ হবে বলে মৃত্যুপথযাত্রীকে হাতের কাছের সব চেয়ে কার্যক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করা আর বয়কটকে নিন্দা করা একই বস্তু" *(৫৩)। তিনি বয়কটকে শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় বলে সমর্থন করেছেন তা নয়, তিনি বয়কটকে মনে করতেন রাজনৈতিক আন্দোলনের অনস্বীকার্য হাতিয়ার। তিনি ছিলেন বয়কটের সর্বতোমুখী প্রয়োগের বিশেষ পক্ষপাতী। তৎকালে বয়কট শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বয়কটের প্রয়োগ ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। আত্মরক্ষামূলক এই নীতির মূল কথা ছিল, "যতদিন না অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ও জাতীয় দাবি স্বীকৃত হয়, ততদিন পর্যন্ত দেশ-শোষণে রত বৃটিশ বাণিজ্য ও বৃটিশ শাসকের পক্ষে যা কিছু অনুকূল, সংঘবদ্ধভাবে তার বিরোধিতা করে বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে অসম্ভব করে তোলা। এই মনোভাব এই একটি মাত্র কথা 'বয়কটের' মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে" *(৫৪)। বৃটিশ পণ্য বর্জন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বয়কটের সূত্রপাত হলেও অনতি-বিলম্বে উগ্র-জাতীয়তাবাদী দল বয়কটকে গ্রহণ করলেন সামগ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার একটা কর্ম-কৌশল হিসাবে। বয়কটের একটা আবহাওয়া ইতোমধ্যেই দেশের ভিতর দেখা দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল ও

* (৫৩) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ: ৮২

* (৫৪) *The Doctrine of Passive Resistance* পুস্তক (পৃ: ৩৫-৩৬) এবং *India's Fight for Freedom* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত অরবিন্দ লিখিত "The Possibilities of the Boycott" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিতব্য।

অরবিন্দ ঘোষ দিলেন তাকে প্রচণ্ড গতিবেগ। অরবিন্দ বয়কটকে সুসম্বদ্ধভাবে যুক্তি নিষ্ঠার সাহায্যে রাষ্ট্রদর্শনের স্তরে উন্নীত করলেন—অন্ধ-আবেগ ও অনিশ্চিত ভাবনাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বে পরিণত করলেন। নিরস্ত্র প্রতিরোধের বাণী লক্ষ-লক্ষ মানুষের মনে ছড়িয়ে দিলেন বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর অগ্নিস্রাবী বাগ্মিতার সাহায্যে। তিনি যখন যেখানে গেছেন সেখানকার মানুষ পাগল হয়ে গেছে তাঁর বক্তৃতা শুনে। বৃটিশ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সেদিন তাঁর কণ্ঠই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। সমসাময়িক পুলিশ রিপোর্ট হ'তে জানা যায়, "বিপিনচন্দ্র পালই ছিলেন ভ্রাম্যমাণ রাজদ্রোহী বক্তাদের মধ্যে প্রধান, তাঁর মত আর কেউ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনকে উত্তেজিত করতে পারেনি" *(৫৫)।

অরবিন্দের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ছিলেন ধীর, শান্ত ও সমাহিত; তাঁর চিন্তাশীলতা, ধ্যান-তন্ময়তা ও বিশ্লেষণ-শক্তি ছিল অপূর্ব।

*(৫৫) আই. বি. রেকর্ডস্, পশ্চিম বাংলা, F. No. 117/133 পূজাসংখ্যা "যুগবাণী" (১৯৫৮) পত্রিকায় প্রকাশিত "বন্দেমাতরম্ ও বিপিনচন্দ্র" প্রবন্ধ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার কর্তৃক রচিত (গোপনীয়) *Histry Sheet* (*No. 49*) *Bipin Chandra Pal* পঠিতব্য। ১৯০৯ সালের 634 নম্বর ফাইলে বলা হয়েছে, "জেলাগুলি যখন শান্ত হয়ে আসে, বয়কট থেমে যায় এবং আন্দোলন মুমূর্ষু হয়ে পড়ে তখনই বিপিনচন্দ্র পাল অথবা অব্দুল গফুরকে, বিশেষ করে বিপিনচন্দ্র পালকে, উত্তেজনা জাগিয়ে তোলবার জন্য পাঠানো হয়। তিনি ভাল বক্তা, শ্রোতৃবৃন্দকে মতানুবর্তী করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি যেখানেই যান, সেখান হ'তে চলে আসবার পর সেই জায়গায় তাঁর প্রভাব অন্যান্য আন্দোলনকারীদের চেয়ে ঢের বেশী অনুভব করা যায়।" এই একই চিত্র পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের আই, বি, রেকর্ডস্-এর ১০২২।১৭ সংখ্যক ফাইলে। এই রিপোর্ট হ'তে জানা যায়, বাংলাদেশের আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালই ছিলেন সর্বপ্রধান। স্বদেশীযুগে তিনি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে ভারতের পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী এবং সে সময় তিনি তাঁর মতবাদ সোজাসুজি ঘোষণা করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। এই প্রসঙ্গে ১৯০৭ সনে বিপিনচন্দ্র পালের "The New Spirit" এবং হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় রচিত *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ও পঠিতব্য।

তাঁর লেখনী ছিল কোষমুক্ত তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রত্যেকটি রচনা ছিল আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উপর তীব্র কষাঘাতবিশেষ। প্রত্যেকটি লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের ক্ষীয়মান আনুগত্যকে বিধ্বস্ত করে দিতে চেয়েছিলেন।

অরবিন্দ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বয়কট বা নিরস্ত্র প্রতিরোধের দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। চারিটি ক্ষেত্রে বর্জননীতি আত্মপ্রকাশ করলো। ইংরেজি পণ্য, ইংরেজি বিদ্যালয়, ইংরেজের বিচারালয় এবং ইংরেজের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বয়কট করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। নিরস্ত্র প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে বয়কট নীতি স্বীকৃত হবার ফলে জন-জীবনে স্বদেশী পণ্য উৎপাদন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, স্বকীয় বিচার সংস্থা গঠন এবং জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য একটা কেন্দ্রীয় সমিতি সংস্থাপনের জন্য রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু অরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শ এই সীমা অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। স্বদেশীযুগে তিনি মনে করতেন, "সরকারের সহিত সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার মধ্যেই নিরস্ত্র প্রতিরোধের সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায় না। পাশ্চাত্য খণ্ডে নিরস্ত্র প্রতিরোধের সুপ্রচলিত হাতিয়ার হলো সরকারকে কর দিতে অস্বীকার করা। পাশ্চাত্যবাসীদের প্রবল রাজনৈতিক চেতনা তাদের শিখিয়েছে, ধীর ও মন্থর পদ্ধতিতে শাসন-যন্ত্রকে অবনমিত না করে সোজাসুজি শাসন-ব্যবস্থার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত দিতে হবে" *(৫৬)। তাঁর মতে ভারতবাসীর পক্ষে সরকারকে কর দিতে অস্বীকার করাই হলো "নিরস্ত্র প্রতিরোধের স্বাভাবিক ও যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি" *(৫৭)। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরও যখন দেখা গেল, যে-শিক্ষাবিধি ভারতবাসীর কাম্য নয়, তার জন্যও তাকে কর দিতে হচ্ছে, তখন তিনি বললেন, এর অর্থ একদিকে দেশবাসীকে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য টাকা

* (৫৬) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ: ৪০-৪১

* (৫৭) ঐ পৃ: ৪১

দিতে হবে, আবার যে-শিক্ষাবিধির তারা একান্ত বিরোধী তার জন্যও তাদের কর দিতে হবে অর্থাৎ তাদের করভার হবে দ্বিগুণ। সুতরাং যে-শিক্ষাবিধির তারা সম্পূর্ণ বিরোধী তার জন্য কোন কর দিতে অস্বীকার করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক *(৫৮)। ঔচিত্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও সাময়িকভাবে এই চরম অস্ত্র ব্যবহৃত হয় নি। সে-যুগের রাজনৈতিক অবস্থায় এই চরম অস্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর ছিল না। অরবিন্দ তাই চরমপন্থী দলের বাস্তব কর্ম-তালিকায় এই অস্ত্রের প্রয়োগ পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। নিষ্কর আন্দোলনের সোজা অর্থ দেশের প্রচলিত আইন অমান্য করা। আইন-অমান্য করাকে কর্তৃপক্ষ কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। "সুতরাং কর দিতে অস্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হবে জাতীয়তাবাদী দলের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত বিদেশী শাসকের রুদ্র দমন নীতির অনিবার্য চূড়ান্ত সংগ্রাম। এ' কাজ হবে জন-গণের পক্ষ হতে সরকারকে চরমপত্র দেবার সামিল"*(৫৯)। এই ধরণের জাতীয় চরম দাবির অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে অরবিন্দের সূক্ষ্ম ও বাস্তব জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি বুঝেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় এই পন্থা গ্রহণ করলে তা হবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। তিনি লিখেছেন, "চূড়ান্ত পরিণতির জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত না হয়ে কখনই চরম দাবি পেশ করা উচিত নয়।" তিনি বললেন, ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এর বিদেশী শাসক অত্যন্ত শক্তিশালী। নিষ্কর আন্দোলন আরম্ভ করলেই সুরু হবে দেশবাসীর সঙ্গে বিদেশী শাসকের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে সফলতা লাভ করতে হলে প্রয়োজন সমস্ত দেশকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা, প্রয়োজন সমস্ত দেশব্যাপী এক বিরাট শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তোলা—এই সংগঠনের মধ্যে প্রতিফলিত করতে হবে সমগ্র জাতির সংকল্প, এই সংগঠনকে প্রস্তুত হতে হবে বিদেশী দমন-নীতির বিরুদ্ধে সমান তালে লড়াই চালাবার জন্য। এইরূপ একটা সংগঠন গড়ে না তোলা পর্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত বিদেশী শাসকের সঙ্গে

* (৫৮) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ: ৪১-৪২
* (৫৯) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ: ৪৪

চূড়ান্ত শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া হবে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাই অরবিন্দ নিরস্ত্র আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে নিকর নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে সাময়িকভাবে দেশবাসীকে আইনসম্মত ভাবেই সরকারের সহিত সর্বপ্রকারে অসহযোগিতা করতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু এ'কথা জানা দরকার, অরবিন্দের কাছে বয়কটের ধারণা সীমিত ছিল না—বয়কটকে তিনি মনে করতেন একটা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল হাতিয়ার বলে; জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে বয়কটের রূপান্তর সম্ভব এবং একে পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করে তোলাও সম্ভব, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বয়কটের অপরিসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হ'য়েও বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় তিনি স্বদেশী যুগে 'No representation, No taxation'-এর নীতি অবলম্বন করতে দেশবাসীকে উপদেশ দেননি; তিনি স্বদেশবাসীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'No control, No assistance' এই নীতি অঙ্গীকার করতে *(৬০)।

বয়কটের নৈতিক ভিত্তি

দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে নিরস্ত্র প্রতিরোধের পন্থা হিসাবে বয়কট ছিল সম্পূর্ণ আইনসম্মত, কিন্তু অরবিন্দ জানতেন বয়কটকে বাস্তবরূপ দিতে গেলেই তার নির্দোষ বৈধতা ভেঙে পড়বে এবং সুরু হবে সরকারের সঙ্গে জনগণের প্রচণ্ড লড়াই। এইজন্যই নিরস্ত্র প্রতিরোধের কর্মপন্থাকে আইনের গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রাখবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যায় পীড়নমূলক আইন অমান্য করে দুঃখময় পরিণামের জন্য নৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাও অরবিন্দ স্বীকার করতেন। সংকটের মুহূর্তে ক্লৈব্য ও নিষ্ক্রিয়তাকে ঢেকে রাখবার জন্য কোনমতেই আইনের দোহাই দেওয়া চলে না। "বেআইনী বা হিংসাত্মক জবরদস্তির কাছে নতি স্বীকার, অত্যাচার ও গুণ্ডামিকে দেশের আইনসম্মত বিধান বলে গ্রহণ করলে তা' হবে ক্লৈব্যের অপরাধে অপরাধী হবার সামিল। যে মুহূর্তে ঐ ধরণের কোন দমনমূলক

* (৬০) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ: ৩৬

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই মুহূর্তে নিরস্ত্র প্রতিরোধের অবসান ঘটবে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করা হবে আমাদের কর্তব্য" *(৬১)। সুতরাং দেখতে পাওয়া গেল, অরবিন্দের নিরস্ত্র প্রতিরোধ নীতির ভিতর প্রয়োজন মতো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নৈতিক অনুমোদনও ছিল।

দুঃখবরণের আহ্বান

চরমপন্থী দলের কাছে নিরস্ত্র প্রতিরোধ ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দর্শন। তাঁরা যেমন একদিকে ছিলেন ভীরু আত্মসমর্পণের বিরোধী, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা ছিলেন জনগণের নগণ্য দুঃখভোগকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করবার বিরোধী। বিদেশী শাসকের হাতে "কয়েক ডজন মানুষের মাথাভাঙা নিয়ে তুমুল হৈচৈ করা অথবা অতি তুচ্ছ কোন ঘটনাকে আত্মত্যাগের চূড়ান্ত সাক্ষ্য" বলে জাহির করাকে তাঁরা আদৌ আমল দিতেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা মানুষকে শিখিয়ে ছিলেন বীরের মতো দুঃখভোগ করতে, কারাবরণ করতে এবং হাসিমুখে সকল পার্থিব ক্ষয় ক্ষতি সহ্য করতে।

১৯০৭ সনের ৪ঠা অক্টোবর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় "কলিকাতায় আর্মেনীয় আতঙ্ক" নাম দিয়ে বড় বড় হরফে একটি ঘটনার বিবরণ ছাপা হয়। ২রা অক্টোবরের বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সভা পুলিস জোর করে ভেঙে দেয়, জনসাধারণ তাতে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং পরের দিন আরম্ভ হয় পুলিসী জুলুম। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার একজন রিপোর্টার ঘটনাটিকে ফলাও করে প্রচার করেন। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হ'তে বলেন, জনগণের দুঃখভোগের এই অতিরঞ্জিত কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পরই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেদিকে অরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন *(৬২)। সতীশচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না

* (৬১) *The Doctrine of Passive Resistance*, পৃ: ৬২

* (৬২) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়: *The Origins of the National Education Movement*, ১৯৫৭, পৃ: ২০১

বিদেশী শাসকের হাতে দেশের চরম লাঞ্ছনা ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশবাসীর সুপ্ত প্রতিরোধশক্তি জাগ্রৎ হবে না এবং দেশের জন্য কোন দুঃখভোগকেই তিনি অত্যন্ত বেশী বলে মনে করতেন না। এই কারণেই নির্যাতনের অতিরঞ্জিত কাহিনী 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে' সতীশচন্দ্র তাঁর নিকট প্রবল আপত্তি জানান।

অরবিন্দ সতীশচন্দ্রের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করলেন। বস্তুতঃ, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নীতিও ছিল সতীশচন্দ্রের অভিমতের অনুরূপ। ৫ই অক্টোবর (১৯০৭) তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে অরবিন্দ জানালেন, নির্যাতনের অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হয় নি— 'বন্দেমাতরম্' যে নীতি ও আদর্শের মুখপত্র, এই কাহিনী প্রচার তার সম্পূর্ণ বিরোধী। ঘটনা বিকৃত করা হয় নি সত্য, কিন্তু ঘটনাটি বিবৃত করতে গিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, ভাষা সংযম হারিয়েছে এবং তা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে পর্যবসিত হয়েছে। তিনি ঘটনাটির উল্লেখ করে লিখেছেন, "ক্রটি বিচ্যুতি গোপন করা আমাদের নীতি নয়, সুতরাং আমরা কিছু মাত্র দ্বিধাবোধ না করে স্বীকার করছি, অভিযোগ অমূলক নয়। এই জাতীয় কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে আর্মেনীয় আতঙ্কের কথা বললে তা হবে পাশ্চাত্য মানব-প্রীতি ও তাদের উন্নততর সভ্যতার উপর আস্থাবান, হতাশায় উত্তেজিত কোন মডারেট নেতার অলঙ্কৃত বাগাড়ম্বরের সামিল। কোন বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ ধরণের কোন বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেওয়া চলতে পারে না, কারণ জাতীয়তা-বাদীরা ধরেই নিয়েছেন যে, এই জাতীয় ঘটনা এবং এর চেয়েও ঢের বেশী শোচনীয় ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়ে তাঁদের স্বাধীনতার মূল্য দিতে হবে। সুতরাং আমরা এই উক্তি এবং অনুরূপ উক্তিগুলি প্রত্যাহার করছি। আর্মেনিয়া এবং বুলগেরিয়ার কথা দূরে থাকুক, এমন কি পূর্ববঙ্গের মতো দুঃখভোগও এখনো কলকাতাবাসীদের স্বীকার করতে হয় নি। আমাদের অভিযান সুরু হয়েছে মাত্র; মৃত্যু-সাগর মথন করেই প্রতিশ্রুত রাজ্যে পৌঁছাতে হয়, এখনও কিন্তু আমরা মৃত্যু-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি নি।

কয়েকটি দোকান লুষ্ঠিত হয়েছে, জনকয়েকের টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, কয়েকজন প্রহৃত হয়েছে অথবা এমন কি গঙ্গার জলে কয়েকটি মৃতদেহ ভাসতে দেখা গিয়েছে— এই বিবরণ যদি সত্যও হয়, তবুও তা নিয়ে হৈ চৈ করা অথবা আর্তনাদ করা শোভন হবে না। হাসিমুখে বীরের মতো আমাদের ঐ জাতীয় এবং তার চেয়েও ঢের বেশী খারাপ অবস্থার সহিত মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে অপরাধ করেছেন তার মূল্য আমাদের দিতে হবে শুধু অর্থ ও সম্পদ দিয়ে নয়, তার জন্য আমাদের দিতে হবে হৃদয়-নিংড়ানো রক্তধারা" *(৬৩)।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদ আর্তস্বরে জানালো না, বরং কামনা করলো, অত্যাচার যেন হয় আরও উগ্র ও ভয়ঙ্কর। কারণ স্বৈরাচারী শাসকের প্রচণ্ড দমননীতিই আমাদের মনে দেশপ্রেম আরও প্রদীপ্ত করে তুলবে। দেশের উপর যত বেশী অত্যাচার হবে ততই দেশবাসীর দেশ-প্রীতি প্রবল হতে প্রবলতর হবে। স্বাধীনতার জন্য ইতোপূর্বে বিভিন্ন জাতিকে যে পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়েছে, আমাদেরও সেই পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। অরবিন্দ লিখেছেন, "পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। লক্ষ্য করুন বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা-মন্দিরে জনগণের বিজয় অভিযান, যারা দেশকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসতো, তাদের হৃদয়-নিংড়ানো রক্ত দিয়ে সে পথ চিহ্নিত, চলতে চলতে শুনুন সে-পথের দু'ধারে বিরাম-বিহীনভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মানবাত্মার দুঃখ ও বেদনার আর্তনাদ" *(৬৪)। চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' সরকারী চণ্ড-

*(৬৩) দৈনিক 'বন্দেমাতরম্,' ৫ই অক্টোবর, ১৯০৭ দ্রষ্টব্য। সরকারী চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে এই জাতীয় পৌরুষদীপ্ত দুঃখ বরণের বাণী 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বার বার উচ্চারিত হয়েছে। তৎকালে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রচারিত অরবিন্দের "The Seditious Meetings Bill" (২৩শে অক্টোবর, ১৯০৭), "Suicidal Policy" (২৬শে অক্টোবর, ১৯০৭) এবং "The Seditious Message of Mr. Morley" (৩০শে অক্টোবর, ১৯০৭) শীর্ষক প্রবন্ধগুলি আজও তার সাক্ষ্য বহন করে।

*(৬৪) দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত (৩০শে অক্টোবর, ১৯০৭) অরবিন্দের "The Seditious Message of Mr. Morley" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিতব্য।

নীতির প্রতি এই পৌরুষভরা বলিষ্ঠ মনোভাব গ্রহণ করেছিল, দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং লিয়াকৎ হোসেনের মত প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতার সহিত সরকারের অত্যাচার ও নিপীড়নের সঙ্গে মোকাবিলা করতে *(৬৫)। অরবিন্দ 'প্রতিক্রিয়ার অন্তঃসারশূন্যতা' শীর্ষক এক অপূর্ব সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সরকারী দমননীতির অযৌক্তিকতা ও অপদার্থতা তুলে ধরলেন এবং সেই সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বদেশবাসীদের বুঝিয়ে দিলেন, কি করে সরকারের অন্ধ দমননীতির প্রতিক্রিয়া দেশের অন্তরে জাতীয়তাবোধকে আরও প্রদীপ্ত করে তুলছে এবং জাতীয়তাবাদীদের হৃদয়ে কি করে সাহস ও শৌর্য জাগিয়ে দিচ্ছে। অরবিন্দের ভাষায়, "আমরা এখনও বিধাতার নির্বাচিত জাতি, আমাদের সমস্ত দৈব-দুর্বিপাক আমাদের দুঃখ সহ্য করবার সোপানে পরিণত হয়েছে; কারণ আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রয়েছে তার জন্য শুধু সম্পদ নয়, বিপদের শিক্ষাও প্রয়োজন। এর জন্য শুধু কর্তৃত্ব, পরোপকার এবং আনন্দের গৌরব লাভই পর্যাপ্ত নয়, এর জন্য দৌর্বল্য, অত্যাচার ও অবমাননা সম্বন্ধেও আমাদের সম্যক চেতনা প্রয়োজন। করুণাময় ঋষি এবং পরোপকারী রাজার আসন গ্রহণ করলেই শুধু হবে না, যারা পরের পদানত এবং সমাজে যারা পংক্তিহারা তাদের বাসনা কামনাকেও প্রতিফলিত করতে হবে আমাদের জীবনে। এই শিক্ষায় এখন আমাদের নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তা হলেই আরম্ভ হবে আমাদের নব জীবনের পালা। তখন আমাদের অভ্যুদয়কে প্রতিহত করতে পারে এমন কোন শক্তি সারা দুনিয়ায় থাকবে না, এমন কোন বিরোধী শক্তি থাকবে না যে, আমাদের বেঁচে থাকবার অধিকার, আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং পৃথিবীর কাছে আমাদের সত্যিকারের পরিচয় দেবার অধিকার অস্বীকার করতে পারে" *(৬৬)।

(৬৫)উক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (৬৬) "We are still God's chosen people and all our calamities have been but a discipline of suffering, because for the great mission before us prosperity was not sufficient, adversity had also its training; to

taste the glory of power and beneficence and joy was not sufficient, the knowledge of weakness and torture and humiliation was also needed; it was not enough that we should be able to fill the role of the merciful sage and the beneficent king, we had also to experience in our own persons the feelings of the outcaste and the slave. But now that the lesson is learned, and the time for our resurgence is come. And no power shall stay that uprising and no opposing, interest shall deny us the right to live, to be ourselves, to set our seal once more upon the world." 'বন্দে মাতরম্' পত্রে অরবিন্দ ঘোষের "The Vanity of Reaction" (৭ই অক্টোবর, ১৯০৭) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[বর্তমান লেখকদের *Sri Aurobindo's Political Thought* পুস্তকের অনুসরণে এই অধ্যায়টি রচনা করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

'যুগান্তরে'র স্বরাজ-সাধনা

পৃথিবীর ইতিহাসে পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রাম কোথাও শুধু বৈধ নিয়মতান্ত্রিকতার পথে আগাগোড়া অগ্রসর হতে দেখা যায় না। ঘটনার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নব নব চিন্তা আবির্ভূত হ'লে নতুন নতুন কর্মপন্থাও গৃহীত হয়ে থাকে। সাধারণত বৈধ নিয়মতান্ত্রিকতার সরল পথ ধরে মুক্তি সংগ্রাম সুরু হলেও সময়ের যাত্রাপথে সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে হিংসাত্মক কর্মনীতি বা বিপ্লববাদ দেখা দেয়। ১৭৮৯ সনে প্রথম দিকে ফরাসী বিপ্লব ছিল মূলত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এর বৈধ রূপ বদলে গেলো—দেখা দিল এর নতুন বিপ্লবী চেহারা। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ঘটলো অবসান—ফরাসী দেশে স্থাপিত হলো প্রজাতন্ত্র। বর্তমান শতকের প্রারম্ভে ডাঃ সুন্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনদেশে যে মুক্তি আন্দোলন আবির্ভূত হয়, তার পরিণতি ১৯১১ সনের বিপ্লবে, কিন্তু তার প্রথম সূচনা বৈধ নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার-আন্দোলনে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা শাসন-সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরই চীনাবাসীরা গ্রহণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। বিগত শতাব্দীতে ইতালীর জাতীয় স্বাধীনতা সমরের ইতিহাসে ও আয়র্লাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনীতে বিপ্লববাদের অভিব্যক্তি সহজেই নজরে পড়ে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কোনো অদ্ভুত বা সৃষ্টিছাড়া কাহিনী নয়। অন্যান্য দেশের মত এখানেও স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে নিয়মতান্ত্রিকতার পথেই আবির্ভূত হয়েছিল। আবার অন্যান্য দেশের মত এখানেও সংগ্রামের এক বিশেষ পর্যায়ে বিপ্লববাদের অভিব্যক্তি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৭ সনের ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য একমাত্র মহাত্মা গান্ধী

পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে দায়ী বিবেচনা করলে ইতিহাস ভুল করা হবে। মহাত্মা গান্ধীর কর্মসূচীর সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মনীতি যুগপৎ অনুধাবন করতে না পারলে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের যথার্থ প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। একথা আজ পরিষ্কারভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অরবিন্দের নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সর্বাংশে দায়ী নয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিব্যক্তিতে ও পরিণতিতে বিপ্লববাদের স্বাক্ষর স্পষ্ট ও গণনীয়।

পরাধীন জাতির জীবনে বিদেশী শাসন মোটের উপর জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই পরাধীন জাতি কখনও কঠিন সংগ্রাম ছাড়া মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করতে পারে না। উনিশ শতকের শেষ পাদে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে—এমন কি তারও বহুদিন পরে—আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর স্বার্থের যে প্রকৃতিগত বিরোধ বর্তমান তা ধারণা করতে পারেন নি। তাই তাঁরা ইংরেজ শাসনের মূল কাঠামো ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ণ রেখেই স্বদেশের কল্যাণ চিন্তায় বা শাসন সংস্কারে নিমগ্ন ছিলেন। লর্ড কার্জনের রূঢ় আঘাতে আমাদের নব চৈতন্যোদয় ঘটে—ইংরেজ শাসনের প্রতি আমাদের বহুদিনের অভ্যাসগত মোহ ভঙ্গ হয়। আমরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্য-বহির্ভূত স্বরাজনীল ভারতের কল্পনা আমাদের মনে বাসা বাঁধে। নতুন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য উদ্ভাবিত হয় যুগোপযোগী নতুন কর্মপন্থা—নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা বয়কট দর্শন। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ এর যুগ্ম-প্রবর্তক। স্বদেশী যুগে সারা ভারতীয় রাষ্ট্রিক চিন্তায় এটাই বাঙালার সর্বাপেক্ষা বড় দান। বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের "বয়কট" দর্শনই পরবর্তী যুগে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ" দর্শনের আত্মিক ভিত্তি রচনা করে। স্বদেশী যুগের বাঙালীর রাজনীতি শুধু নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা বয়কটের মধ্যে সীমিত থাকলো না তার চেতনায় ও বাস্তব কর্মে বিপ্লববাদের সুরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলার বোমা-দর্শন তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। গোয়েন্দা পুলিশের তৈরী

রিপোর্টগুলি—যা অদ্যাপিও বহুলাংশে সরকারী হেফাজতে রক্ষিত রয়েছে—তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন। নিয়মতান্ত্রিকতার সীমানার মধ্যে প্রথমে আবদ্ধ থাকলেও এই আন্দোলনের গতিতে ক্রমশ বিপ্লববাদের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিপক্ষের নিষ্পেষণে বৈধ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হবার উপক্রম হলেই স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা বিপ্লববাদের পথ গ্রহণ করে থাকে। নিষ্পেষণ আরও কঠোর ও তীব্র হলে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপথ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে আইনানুমোদিত পথ ও বিপ্লববাদ উভয়ই যারপরনাই মূল্যবান। যুগপৎ উভয়ের অস্তিত্ব জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল না করে আরও বেশী শক্তিশালী করতে পারে। এমন কি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকেও সফল করে তুলতে হলে চাই বিপ্লববাদের প্রয়োজনীয় পটভূমি। মহাত্মা গান্ধীকে সাধারণত হিংসাত্মক কর্মনীতি বা বিপ্লববাদের বিরোধী বলেই মনে করা হয়। তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনকে বলা হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। সেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিনিধি অহিংসপন্থী গান্ধীও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা সম্বন্ধে পূর্ণভাবেই অবহিত ছিলেন। ১৯৩১ সনে বিলাতে "গোল টেবিল বৈঠকে" তিনি ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ করে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। গান্ধীজী বলেন, তিনি নিজে সন্ত্রাসবাদের সমর্থক নন, কিন্তু ঐতিহাসিক সন্ত্রাসবাদীদের নিন্দা করেন না "the historian has not condemned them")। তিনি বলেন, যদি ইংরেজ জাতি কংগ্রেসের কর্মসূচী গ্রহণ করে তবে ভারতবর্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদ বিদায় নেবে। যদি তারা গান্ধীর কথা না শোনে, তবে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠবে এবং তাদের নির্দিষ্ট কর্মনীতি অনুসরণ করে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। গান্ধীজী ইংরেজ শাসনকে সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসবাদ organised terrorism) ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি। সেই শাসনের প্রতিনিধিদেরকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "এই সব সন্ত্রাসবাদীরা

তাদের রক্ত দিয়ে যে-সব কথা লিখে যাচ্ছে, তোমরা কি তা দেখতে পাও না? তোমরা কি দেখতে পাও না যে, আমরা গমের তৈরী রুটি চাই না, আমরা চাই স্বাধীনতার রুটি। স্বাধীনতা না পেলে আজ এদেশে হাজার হাজার এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্মী রয়েছে যারা নিজেরাও শান্তি গ্রহণ করবে না, দেশকেও শান্তি ভোগ করতে দেবে না" * (১)।

১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ জাতির কাছে এই ছিল গান্ধীর চরম পত্র। অধ্যাপক বিনয় সরকার ঐ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সনে গান্ধীর দেহাবসানের পর মন্তব্য করেছিলেন, "No propaganda in favour of *himsa*, violence, terrorism and so forth was more broadcast and effective than this one skilfully engineered by the apostle of *ahimsa* (non-violence). India and the world understood it." এর মর্মার্থ হলো, অহিংসার অবতার গান্ধী হিংসা বা সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে যে নিপুণভাবে কার্যকরী ওকালতি করলেন, তা তুলনাহীন। গান্ধীর উচ্চারিত সতর্কবাণীর তাৎপর্য ভারতবর্ষ ও বিশ্বজগৎ উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

স্বদেশী যুগে নব্য জাতীয়তাবাদীর দল বা চরমপন্থী রাজনীতিকগণ আবেদন-নিবেদনের ভ্রান্ত পথ পরিহার করে গ্রহণ করেছিলেন নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা সর্বাত্মক বয়কটের কর্মসূচী এবং সেই কর্মসূচীকে তাঁরা আইনের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের অরবিন্দ এই আইনানুমোদিত আন্দোলনের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। কিন্তু 'বয়কট' দর্শনের প্রচারই তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সবটুকু নয়। তিনি নিরস্ত্র প্রতিরোধ দর্শনের উদ্গাতা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লববাদেরও। স্বদেশী যুগে তাঁর বিপ্লববাদ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার স্ফুরণ দেখতে পাই 'যুগান্তর' পত্রিকায়। 'যুগান্তরের' সাধনা বিপ্লববাদের সাধনা। 'বন্দে মাতরমের' অরবিন্দ অপেক্ষা 'যুগান্তরের' অরবিন্দ

* (১) B. K. Sarkar's *Dominion India in World-Perspectives* (Calcutta, 1949, pp. 103-104)

কম সত্য নন। আর এই দুই অরবিন্দের মধ্যে কোনো চিন্তার সংঘাত ছিল না। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক কর্মকৌশল হিসাবে অবস্থাভেদে নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা সন্ত্রাসবাদ উভয়ই কার্যকরী। শুধু তাই নয় আইনানুমোদিত প্রতিরোধ আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হলেও সন্ত্রাসবাদের কিঞ্চিৎ সহায়তা মূল্যবান। ১৯০৮ সনের ২রা মে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত হবার প্রাক্কালে তিনি 'বন্দে মাতরমে' যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, তা আজও সংবাদপত্রের জীর্ণ পাতায় ছড়ানো। ২৪শে এপ্রিল ১৯০৮ সনে তিনি এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে, সন্ত্রাসবাদের হুমকি না থাকলে রাজনীতিক্ষেত্রে নৈতিক আন্দোলনের গুরুত্বও হ্রাস পায়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন নিষ্পেষিত হলে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এই ভয় অত্যাচারী শাসকের মনে থাকলেই সে আইনানুমোদিত আন্দোলনকে সমীহের চোখে দেখে থাকে। কূটনীতির পশ্চাতে তরবারির জোর না থাকলে সে কূটনীতিও হয় ব্যর্থ। মডারেট রাজনীতিকগণের অনুসৃত কর্মপন্থার সমালোচনা করে অরবিন্দ লিখলেন, "Even diplomacy must have some compelling force behind it to attain its objects, and peaceful means can succeed only when these imply the ugly alternative of more troublesome and fearful methods, recourse to which the failure of peaceful attempts must inevitably lead to" * (২)। এর ঠিক পাঁচ দিন পরে অর্থাৎ জেলে যাবার তিন দিন পূর্বে তিনি 'বন্দে মাতরম্' পত্রে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লেখেন, একদা আশা করেছিলুম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেই ভারতের জয়যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু আজ দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি বিপ্লবের পদধ্বনি—"We could have wished it otherwise, but God's will

* (২) 'বন্দে মাতরম্' পত্রে (২৪শে এপ্রিল, ১৯০৮) অরবিন্দের লিখিত 'The Realism of Indian Nationalistic Policy' দ্রষ্টব্য।

be done"—* (৩)। অর্থাৎ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা পরিচালনা কালেও অরবিন্দের মানস ক্রমশ বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 'যুগান্তরের' অরবিন্দ খোলাখুলি বিপ্লববাদী, 'বন্দে মাতরমের' অরবিন্দ খোলাখুলি নিরস্ত্র প্রতিরোধ-আন্দোলনকারী। কিন্তু সেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীও 'বন্দে মাতরম্' পত্রে জেলে যাবার ঠিক পূর্বে জাতিকে বিপ্লববাদের ইসারা দিয়ে গেলেন।

অরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শনে বিপ্লবের ঠাঁই খুব উঁচু। তিনি নপুংসক নীতিবাগীশ বা নিষ্ক্রিয় নিয়মতন্ত্রের পূজারী ছিলেন না * (৪)। নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে বিপ্লববাদের সুর তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে প্রবল মাত্রায় মিশানো ছিল। তাই অরবিন্দের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিপিনচন্দ্র থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। ইংরেজ আমলের গোয়েন্দা বিভাগীয় পুলিশের রিপোর্টে দেখতে পাই যে, অরবিন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে দেশপ্রেমের নব ধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে পর্যটক সন্ন্যাসী দল গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেছিলেন * (৫)। ১৮৯৩-৯৪ সনে তিনি বম্বের 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রে "New Lamps for Old" নামে যে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন, তাতে তিনি স্পষ্টভাষায় জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করেন যে, রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে পবিত্র হয়েই পরাধীন জাতি স্বাধীনতার তোরণদ্বারে এসে উপস্থিত হয়। 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অরবিন্দ বরোদার বিপ্লবী অরবিন্দের পরিণত অভিব্যক্তি।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষে ইতালীয় কার্বোনারির অনুরূপ গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার কাজে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক সর্বপ্রথম ব্রতী হন।

* (৩) 'বন্দে মাতরম্' পত্রে (২৯শে এপ্রিল, ১৯০৮) অরবিন্দ লিখিত 'New Conditions' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধটি বর্তমান লেখকদের *'Bande Mataram' and Indian Nationalism* (Cal., 1957, pp. 80-83) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

* (৪) বর্তমান লেখকদের *Sri Aurobindo's Political Thought* (Cal. 1958, pp. 37-38) দ্রষ্টব্য।

* (৫) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে রক্ষিত *L. No. 47 : Note on the Growth of the Revolutionary Movement in Bengal* (p. 3) দ্রষ্টব্য।

কংগ্রেসী নেতাদের ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত প্রগতিবাদকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তিনি গণচেতনার উদ্বোধনে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসবের আসল তাৎপর্য ছিল রাজনৈতিক। দেশের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা এবং সেই সংযোগের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের রাষ্ট্রিক চেতনার উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যেই তিলক ঐ সকল উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি কংগ্রেস মঞ্চ থেকে বক্তৃতার অপেক্ষা গঠনমূলক কর্মের গুরুত্বে ছিলেন অনেক বেশি বিশ্বাসী। দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ ছাড়া জাতীয় মুক্তি অসম্ভব এই ছিল তাঁর ধারণা। আবেদন-নিবেদনের অভ্যস্ত পথকেও তিনি বর্জন করেছিলেন। প্রয়োজন মত অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও তিনি অনুমোদন করেন। এমন কি হিংসাত্মক কর্মনীতিও তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে নিন্দনীয় বিবেচিত হয় নি। ১৮৯৭ সনে পুণা সহরে চপেকার ভাইদের দ্বারা দু'জন ইংরেজ অফিসার নিহত হলে সারা দেশে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে "কেশরী" পত্রে তিলক ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা বাহির করেন, তাতে রাজদ্রোহের উত্তেজনা ছিল এই অজুহাতে তিলক ধৃত হয়ে দেড় বছরের জন্য তিনি কয়েদীঘরে চালান হলেন। চপেকার ভাইদের দ্বারা ইংরেজ অফিসার হত্যার সঙ্গে তিলকের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তৎকালে সমগ্র মহারাষ্ট্রে তিলকই ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান মন্ত্রণাগুরু ও পরিচালক। পুণাতে সংগঠিত চপেকার ক্লাবও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দামোদর চপেকার ও বালকৃষ্ণ চপেকার। গোয়েন্দা পুলিশী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই ক্লাবের প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন, বিলাতী ক্রীড়া বর্জন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধন। অল্পদিনের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার কর্মনীতিও গৃহীত হয়। চপেকার ক্লাব ছিল মহারাষ্ট্রে উদ্ভূত এক বিরাট আন্দোলনের অংশ বিশেষ। এই আন্দোলনের প্রবর্তকেরা হিন্দুজাতির পবিত্র তীর্থস্থান বেণারসেও একটি

কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৮৯৮ সনে তিলকের বিশিষ্ট বন্ধু ও মহারাষ্ট্রীয় নেতা মাধো রাও কর্মকারের উদ্যোগে বেণারসে একটি মহারাষ্ট্র বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিলকের বেণারস পরিদর্শন কালে সেখানে 'কালিদাস' নামে একখানি মারাঠী পত্রিকাও স্থাপিত হয়। বেণারসে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা এইভাবে মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের উৎসাহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল (এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের L. No. 47 পুস্তক দ্রষ্টব্য)। মহারাষ্ট্র থেকে বিপ্লববাদের তরঙ্গ এসে বাঙালীর রাষ্ট্রিক জীবনকেও আঘাত করে এবং তা ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়। স্বদেশী যুগে বাঙালীর বিপ্লব-সাধনা মহারাষ্ট্রীয় আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা যে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে বিপ্লববাদের সর্বাপেক্ষা বড় নায়ক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বিলাত-প্রত্যাগত বরোদাবাহিত অরবিন্দের চিন্তাধারা বিপ্লব রসে পরিপুষ্ট। বরোদায় থাকাকালীন তাঁর বম্বের গুপ্ত সমিতির সহিত সংযোগ ও এর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ, আমেদাবাদ কংগ্রেসে তিলকের (যাঁকে তিনি তখন মনে করতেন বিপ্লবী দলের একমাত্র সম্ভাব্য নেতা বলে তাঁর) সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও চিন্তাবিনিময় তাঁর রাষ্ট্রিক মেজাজের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে। স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণেরও পূর্বে (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) অরবিন্দ সুদূর বরোদা থেকে বাংলার রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হন। তাঁরই নির্দেশে ১৯০১ সনে গাইকোয়াড়ের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন এবং তৎপর ১৯০২ সনে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও। তাঁদের আগমনের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা * (৬)। তাঁরা

* (৬) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে সংরক্ষিত *L. No. 54 A* সংখ্যক পুস্তক—*An Account of the Revolutionary Organisations in Bengal other than the Dacca Anusilan Samiti*, (pp. 1 and 12) দ্রষ্টব্য।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাস, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ঠাকুর পরিবারের কারো কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও একথা সত্য যে প্রায় ঐ একই সময়ে কলিকাতায় ও বাংলার মফঃস্বলে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রাকার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেগুলি স্পষ্টতঃ বিপ্লববাদী সমিতি না হলেও তাদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ও ভারতের স্বাধীনতা। ১৯০৩ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশ পর্যটন করে এবং স্থানে স্থানে বিপ্লববাদী আখড়া ও সমিতি স্থাপন করে বারীন্দ্রকুমার বরোদায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বৎসরেরই শেষদিকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৎপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বৈপ্লবিক সমিতির সভ্যদের বাদবিসংবাদ সুরু হলে তিনিও বিরক্ত হয়ে বাংলাদেশ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নতুন নাম হয় স্বামী নিরালম্ব * (৭)।

এর পরবর্তী ঘটনা ১৯০৪ সনে পুনরায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কলিকাতায় আগমন। সারা বাংলাদেশে একটি বিপ্লববাদী রাজনৈতিক দল সংগঠনের কাজে এই সময় তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এই সমস্ত রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মযোগের পশ্চাতে অরবিন্দের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। পুলিশী রিপোর্টে প্রকাশ যে বাংলার "যুগান্তর" নামক বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে অরবিন্দই ছিলেন অগ্রণী এবং স্বদেশী যুগে "ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে অন্য যে কোনো ব্যক্তির থেকে তিনিই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন" * (৮)। বাংলার বৈপ্লবিক "যুগান্তর" পার্টির ইতিহাসেও অরবিন্দের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিত।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ভারতের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করে। বাংলা ছিল এই নবজাগরণের পথপ্রদর্শক। বাংলাই ছিল

* (৭) *L. No. 54A* পুস্তক, পৃষ্ঠা ১ দ্রষ্টব্য।

* (৮) পশ্চিম বঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের *F. 1022-17* সংখ্যক ফাইল দ্রষ্টব্য।

শিক্ষায়, দীক্ষায়, নব রাজনীতি-জ্ঞানে, সাহিত্য সাধনায় সকল প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রণী। হিন্দুমেলার ঐতিহ্য থেকে বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় (১৮৬৭-১৮৯৩) বাঙালীর আত্মজাগরণের প্রস্তুতি পর্ব। কংগ্রেসের রাজনীতিক প্রচার কার্য, থিওসফিষ্ট আন্দোলনের প্রভাব, বিবেকানন্দের শক্তিযোগের সাধনা ভারতের জাতীয়তাবাদকে রসসিক্ত ও পরিপুষ্ট করে তোলে। আত্মশ্রদ্ধাহীন, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহগ্রস্ত বাঙালী জাতি তার আত্ম-প্রত্যয় পুনরায় লাভ করে। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনাও সুরু হয়। আবিসিনিয়ার সঙ্গে ইতালীর যুদ্ধে (১৮৯৬) ইউরোপীয় জাতির বিপর্যয় এবং বুয়োর যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০২) প্রথম পর্বে ইংরেজদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কাহিনী বহু ভারতবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা-স্পৃহা ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় সঞ্চার করে। শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রতি এদেশবাসীর বহুদিনের পুরাতন প্রকৃতিগত ভয় বাস্তবের রূঢ় আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ে। আয়ার্ল্যাণ্ড, রাশিয়া ও চীনদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কাহিনীও আমাদের দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করে এদেশেও অনুরূপ গুপ্ত সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বহু লোকের চিন্তায় ঘর করে বসে।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভ কাল থেকেই বাংলা দেশের স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আখড়া বা সমিতি মাথা তুলতে থাকে। প্রথম থেকেই লাঠি খেলা, শরীর চর্চা, ব্যায়াম প্রভৃতি উপকরণ এই সকল সমিতির কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৈপ্লবিক কর্মীবাহিনী সংগঠন বা তদুদ্দেশ্যে বিপ্লববাদী পথনির্দেশ এই সকল আদি সমিতির আবহাওয়ায় পরিস্ফুট হয় নি। বাংলা দেশে এই সমিতিগুলির পরিচালনার নেতৃত্ব ছিল ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র, সরলা দেবী ঘোষাল প্রভৃতির হাতে। তাঁদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি যে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সমরের পথ বহুলাংশে প্রস্তুত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যক্ষ বিপ্লববাদ প্রচার করা তাদের স্বধর্ম ছিল না।

বিপ্লববাদের পথ অনুসরণ করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে

বাংলাদেশে প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় ১৯০১-০২ সনে। বরোদা থেকে অরবিন্দ-প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই সমিতির গঠনকর্তা *(৯)। প্রথমে এর কর্মকেন্দ্র ছিল আপার সার্কুলার রোডে—ঠিকানা ছিল ১০৮।এ বা ১০৮।বি। পাঁচজন সদস্য নিয়ে এই দলের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন এর সভাপতি, সহকারী সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর * (১০)। পঞ্চম সভ্য ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা * (১১)। বাংলাদেশে এই বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পটভূমি রচনায় আর এক ব্যক্তির নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি হলেন জাপানী নেতা কাউণ্ট ওকাকুরা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি বাংলা তথা ভারতে পরিভ্রমণ করেন এবং বাংলা দেশে বিপ্লব সমিতি স্থাপনের সপক্ষে প্রমথ মিত্র, নিবেদিতা প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। পুলিশী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯০০ সালের পর থেকে এদেশে যে সকল রাজনীতি-ঘেঁষা শরীরচর্চামূলক সমিতি ধীরে ধীরে জন্ম নিতে থাকে, তাদের পশ্চাতে ওকাকুরার উৎসাহ, মন্ত্রণা ও পরিচালনাও ছিল যথেষ্ট। যাই হোক, আপার সার্কুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সমিতি গোড়ার দিকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। শীঘ্রই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু প্রভৃতি তরুণ কর্মী এই দলে যোগদান করেন। এই বিপ্লবী দলের কাজকর্ম ইতালীর কার্বোনারি ও রাশিয়ার গোপন

* (৯) ডক্টর ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তকে (কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৮) লিখেছেন যে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সমিতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের বিবৃতিও এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। অবিনাশ বাবুর মতে যতীন ব্যানার্জী কলিকাতায় প্রথম বিপ্লব সমিতি স্থাপন করেন ১৯০২ সনে আপার সার্কুলার রোডের এক বাড়ীতে।

* (১০) উক্ত গ্রন্থের 'খ' পরিশিষ্টে প্রদত্ত সতীশ চন্দ্র বসুর বিবৃতি (পৃঃ ১৮১) দ্রষ্টব্য।

* (১১) B. N. Datta's *Swami Vivekananda* (Calcutta, 1954, p. 10).

সমিতিগুলির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। আবার, গীতার সংগ্রাম-দর্শনও এতে পরিষ্কারভাবে লক্ষণীয়।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিপ্লবী দলের জন্ম-কাহিনী সম্পর্কে লিখেছেন, "কলিকাতায় যতীন বাবুর বাসার সংলগ্ন ভূমিতে একটি আখড়া স্থাপিত করা হয়। সাঁতার খেলা, লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মুষ্টি যুদ্ধ (Boxing) শিক্ষা, সাইকেল চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাই ছিল আমাদের বাহিরের আবরণ। এই সঙ্গে বিশ্বস্ত ছেলেদের গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনির জীবনী এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন কি করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে বক্তৃতা হইত। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পি. মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রধানত বক্তৃতা দিতেন। বই পড়িয়া সব বুঝাইয়া দেওয়া হইত।

"১৯০২ খৃঃ পি. মিত্র, সরলাদেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. আর. দাস প্রভৃতি আমাদের মাথার উপরে ছিলেন। পরে সরলাদেবীর কাছে কেহ যাইতেন না।"

অবিনাশবাবু আরও লিখেছেন যে, সমিতির কাজকর্মের জন্য যে অর্থভাণ্ডার খোলা হয়, তাতে সি. আর. দাস, পি. মিত্র প্রভৃতি চাঁদা দিতেন। অরবিন্দ প্রথম থেকেই মোটা টাকা দিতে থাকেন * (১২)।

এই বিপ্লবী দলের একটি প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল এবং তাহা ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সমিতির সভ্য পদ গ্রহণ করতে হ'লে প্রত্যেককে উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। সর্ত ছিল—ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হবার পর ধীরে ধীরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরূপ সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। "কিছু দিনের মধ্যেই বৈপ্লবিক আন্দোলন এক কেন্দ্রীভূত সংস্থারূপে গড়ে উঠল। স্থানীয় কর্মীকে তার উপরস্থ কর্মীর নিকট কাজের হিসাব দিতে হত এবং এই উপরস্থ কর্মী আবার কাজের হিসাব দিতেন তার উপরের কর্মীর নিকট। এইভাবে সমস্ত কর্মীর খবর সভাপতির কাছে পৌছত।

* (১২) "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম", 'খ' পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ১৯১ দ্রষ্টব্য।

এক জনের কাজের হিসাব তার সহযোগী জানতেন না। কাজ চলত অনেকটা ইটালীয়ান কারবোনারী প্রথায়" * (১৩)।

কিছুদিন পরে আপার সার্কুলার রোডের আখড়া ভেঙে যায় ও গ্রে ষ্ট্রীটে সমিতির প্রধান ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ কালে সতীশচন্দ্র বসু বিবেকানন্দ রোডের সন্নিকটস্থ মদন মিত্রের লেনে একটি ছোট লাঠিখেলার ক্লাব খোলেন * (১৪)। বঙ্কিমী আদর্শের অনুসরণে এই ক্লাবের তিনি নামকরণ করেন 'অনুশীলন সমিতি'। সতীশ বসু এই ক্লাবের সম্পাদক ও প্রমথনাথ মিত্র এর সভাপতি ছিলেন। প্রমথ মিত্রের নির্দেশেই অনুশীলন সমিতি পরে বৈপ্লবিক সমিতির সঙ্গে একত্রে সংযুক্ত হয়ে যায়।

প্রাক্-স্বদেশী যুগে এইভাবে বিপ্লবী দলের কাজকর্ম ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে, এবং স্বদেশী আন্দোলন সুরু হলে এর দেহে নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়। দলের কর্ম-পরিসর সহসা বিস্তৃত হলো। মফঃস্বলে নতুন নতুন আখড়া খোলা হয় এবং দলে-দলে যুবকবৃন্দ সভ্যপদ গ্রহণ করে। কর্ম-স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী দলেও, মতান্তর দেখা দিল। দলের একটি শাখা আখড়ায় বা ক্লাবে শরীর-চর্চা, ব্যায়াম, কুস্তি ও লাঠিখেলার উপরই বেশি জোর দিলো, আর দ্বিতীয় শাখা শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের প্রয়োজনীয়তায়ও গুরুত্ব অরোপ করলো। সতীশচন্দ্র বসু প্রথম থেকেই কলিকাতায় ব্যায়ামকেন্দ্র-পরিচালক ছিলেন। ১৯০৫ সনের নবেম্বর মাসে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র ঢাকায়

* (১৩) 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' শীর্ষক সাপ্তাহিক পত্রিকার (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬০) ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের "বিপ্লবী প্রমথনাথ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

*(১৪) পুলিশের রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯০৫ সনের নবেম্বর মাসে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পূর্বে ১৯০৫ সনেই এই ক্লাবটি স্থাপিত হয়েছিল। F. N. 1023-17 ফাইল দ্রষ্টব্য। "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তকের 'খ' পরিশিষ্টে সংযোজিত সতীশ বসুর বিবৃতি অনুসারে যতীন ব্যানার্জীর বিপ্লব সমিতি স্থাপনের কিছু দিন পূর্বেই অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। আবার ডক্টর ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত আমাদের বলেছেন, বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠার পরে 'কলিকাতা অনুশীলন সমিতি'র জন্ম হয়। এই মত তিনি "বিপ্লবী প্রমথনাথ" প্রবন্ধেও ব্যক্ত করেছেন।

গুপ্ত সমিতির এক শাখা স্থাপন করেন—সেখানেও মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা খেলা, লাঠিখেলা, ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার দেওয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই ক্লাবের পরিচালক হলেন ঢাকার পুলিন বিহারী দাস। সতীশ বসু ও পুলিন দাস ছিলেন প্রথম দলভুক্ত। তাঁদের পরিচালিত আখড়াগুলির নাম হলো 'অনুশীলন সমিতি'। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় অনুরূপ ক্লাব বা আখড়া স্থাপিত হতে থাকে। সেগুলিও ছিল অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত। এই সমিতিগুলি সে সময় যে কিরূপ কর্মতৎপর ছিল, তা তৎকালীন সংবাদপত্রে বিবৃত রয়েছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মুখপত্র 'ইংলিশ-ম্যানের' বিশেষ সংবাদদাতা হেনরী নিউম্যান ১৯০৭ সনের ৯ই মে পূর্ববঙ্গের জগন্নাথগঞ্জ থেকে ঐ পত্রিকার জন্য যে বিবরণ লিখে পাঠান, তাতে দেখি পূর্ব-বঙ্গের প্রায় প্রতিটি বড় সহরে ও পশ্চিম বঙ্গেরও বহু স্থানে আখড়া স্থাপনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই আখড়াগুলিতে মুষ্টিযুদ্ধ, লাফ-দেওয়া, ছোরা-খেলা ও লাঠিখেলা আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্রস্বরূপ শিক্ষা দেওয়া হতো। যুবক, বৃদ্ধ, ছাত্র নির্বিশেষে বহু লোক ঐ সকল আখড়ার স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিল। আখড়াগুলি পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত হতো না। সেগুলি ছিল এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতায়। স্বেচ্ছাসেবকেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; তাদের হাতে রয়েছে লাঠি, মাথায় হলুদ রং-এর পাগড়ী, গায়ে লাল সার্ট, ঘাড়ের কাছে 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ, ধুতির এক পাশ কোমরের চারিদিকে রাজপুতদের মত বাঁধা। তাদের কথাবার্তার মূল বিষয় 'দেশপ্রেম ও দেশের জন্য জীবনদান'। অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবকের মানসলোকে এক নতুন আদর্শ ভেসে উঠেছে, তা হলো ভারতের জন্য স্বাধীনতা—"Swaraj—Home Rule for India"। তাদের দিকে তাকালে সময় সময় মনে হয়, তারা যেন সত্যিকারের সৈনিক, স্বরাজের সংগ্রাম সাধনায় ব্রতবদ্ধ কর্মী * (১৫)।

বিপ্লবী দলের দ্বিতীয় শাখা এইসময় প্রচারের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে

* (১৫) 'বন্দে মাতরম্', ১৫ই মে, ১৯০৭-এর সংখ্যায় 'ইংলিশম্যানের' 'The National Volunteers' শীর্ষক প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ দ্রষ্টব্য।

পড়ে। নিছক শরীর-চর্চা দ্বারা বিপ্লববাদের সম্প্রসারণ অসম্ভব, এই সঙ্গে চাই প্রচারকার্য—এরূপ ছিল দ্বিতীয় শাখার মতবাদ। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রভৃতি এই কার্যে বিশেষ উদ্যোগী হলেন, এবং তাঁরা নেতাদের কাছ থেকেও,—যেমন, অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতির কাছ থেকেও—এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেন। প্রচারধর্মী দলের মুখপত্ররূপেই ১৯০৬-এর মার্চ মাসে আত্ম-প্রকাশ করে 'যুগান্তর' পত্রিকা। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তরের' দল দুই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল না; একই কেন্দ্রীয় বিপ্লব সমিতির এরা ছিল দুই পৃথক শাখা—একটির মূল উদ্দেশ্য শারীরিক শিক্ষা, দ্বিতীয়ের প্রধান লক্ষ্য বিপ্লবাদর্শ প্রচার। আর এই উভয় শাখারই সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার পি, মিত্র। বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। বাংলার এই বিপ্লবী দল ছিল আবার নিখিল ভারত বৈপ্লবিক সমিতির অঙ্গ। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে একথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে।

সশস্ত্র বিপ্লব বা হিংসাত্মক সংঘর্ষের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প বক্ষে ধারণ করেই 'যুগান্তর' পত্রিকা আবির্ভূত হয় (মার্চ, ১৯০৬)। 'যুগান্তরের' কল্পিত স্বাধীনতা ছিল ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজ। কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃবৃন্দ তখনও এই আদর্শ সম্যকভাবে ধারণা করতে পারেন নি। নব্য জাতীয়তাবাদীর দল পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখলেও তখন পর্যন্ত বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্র ছাড়া তাঁদের আর কোনো উল্লেখযোগ্য মুখপত্র ছিল না। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের আত্মপ্রকাশ আরও চার মাস পরের ঘটনা। তাছাড়া, 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'সন্ধ্যা', বা 'বন্দে মাতরম্' কোনোটিই হিংসাত্মক সংঘর্ষ বা সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিল না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য তাদের অনুমোদিত পথ ছিল নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা বয়কটের কর্ম-নীতি। কিন্তু 'যুগান্তরের' পথ ছিল আরও ভয়ানক ও সক্রিয়। বিপ্লববাদ ছিল এর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বিশেষ।

'যুগান্তর' পত্রিকার নামকরণে শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক সামাজিক উপন্যাসের প্রভাব লক্ষণীয়। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল।" মাত্র ৩০০৲ টাকা সম্বল করে এই কাগজ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ২০০৲ টাকা সংগৃহীত হয় রংপুর কেন্দ্র থেকে, বাকী ১০০৲ কলিকাতা থেকে * (১৬)। প্রথম তিন সপ্তাহ 'যুগান্তরের' নিজস্ব প্রেস ছিল না। পার্টি-মেম্বার কুমারটুলীর প্রকাশ মজুমদারের প্রেসে ইহা ছাপা হতো। পরে 'যুগান্তরের' নিজস্ব প্রেস কেনা হয়—নাম সাধনা প্রিণ্টিং প্রেস। প্রথমে ছিল হ্যাণ্ড মেশিন, পরে ইলেকট্রিক মেশিনও কেনা হয়েছিল * (১৭)।

শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" (কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ ৫০২) গ্রন্থে লিখেছেন: "যুগান্তরের প্রচ্ছদপটে খড়্গাসহ মা কালীর শুধু হাত ছিল। এই কালী-মার্কা খড়্গা সমেত একখানি হাতকে যুগান্তরের ট্রেড মার্ক বলা চলে।...যুগান্তরেব প্রচ্ছদপটে দু'খানা আড়াআড়ি-ভাবে তলোয়ারের উপর একখানা ঢালও ছিল।" গিরিজাবাবুর এই উক্তি একেবারেই ভ্রমাত্মক। 'যুগান্তরে'র প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত এই সঙ্গে প্রদত্ত ছবিটিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ত্রিশূল, তলোয়ার ও চন্দ্র সমম্বিত ছবিটি একাধারে শক্তির প্রতীক ও অসাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন। বস্তুত, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকই বাংলার বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলমান সভ্যদের মধ্যে মজীবুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালী-ভবানী বিপ্লবী দলের আরাধ্যা দেবী হলেও বা 'যুগান্তরে' তাঁদের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হলেও এক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ক্ষাত্রতেজের প্রতীক। এস্থলে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ অনুসন্ধান করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

* (১৬) "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম"; পৃ ২৪-২৫

* (১৭) ঐ, পরিশিষ্ট 'গ,' পৃ ১৯৬-১৯৭

প্রচ্ছদপটের এই ছবিটির নীচে বাঁ ধারে প্রথম কলমের উপরে গীতার একটি সংস্কৃত শ্লোক থাকত, যথা :—

> যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
> ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা ছিলেন বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী, তাঁদের মধ্যে বারীন ঘোষ, ভূপেন দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই সঙ্গে আর এক ব্যক্তির নামও অবশ্য স্মরণীয়, তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। 'যুগান্তরের' প্রকাশ সম্পর্কে এপর্যন্ত যে সকল পুস্তক ও প্রবন্ধাদি ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম পাই না। অথচ 'যুগান্তরে' (১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ বা ২রা ডিসেম্বর, ১৯০৬) ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যু (মঙ্গলবার, ২৭শে নবেম্বর, ১৯০৬) উপলক্ষে যে সংবাদ

পরিবেশিত হয়, তাতে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। "যুগান্তর বাহির করিবার সময় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। যুগান্তর তাঁহার আদরের বস্তু ছিল, 'বন্দে মাতরম্' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা বাহির হইবার প্রথম কাল হইতে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, তৎব্যতীত অন্যান্য কাগজেও লিখিতেন; তিনি একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন। ধীরেনবাবু নীরব সাধক ও মাতৃভূমির প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপক অনেক কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন; 'পল্লীবিলাপ' নামে সুন্দর কাব্যপুস্তিকা তাঁহারই রচিত।·· ধীরেনবাবু আজীবন স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন, নীরব সাধনা শ্রেয় মনে করিতেন বলিয়া কখনও বাহিরের হুজুগে মাতেন নাই বা সংবাদপত্রে স্বীয় নাম জাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। যুগান্তর তাঁহার অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।" এ ছাড়া, আর একজন যুবক কর্মীর নামও এস্থলে স্মরণীয়। তিনি হলেন হরিষ ঘোষ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, তিনি প্রথম থেকেই 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

'যুগান্তর' পত্র ছিল বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। মূল্য এক পয়সা। পত্রিকার অফিস প্রথমে ছিল ২৭নং কানাই ধর লেনে, কয়েক মাস পরে ৪১নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে। ২৮শে অক্টোবর ১৯০৬ সনে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, "আগামী সোমবার হইতে আমাদের কার্যালয় ও সাংনা প্রেস ৪১নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে (41, Champatala 1st Lane) উঠিয়া যাইবে" * (১৮)। এর অনেকদিন পর 'যুগান্তরে'র কার্যালয় ২৮।১ মির্জাপুর স্ট্রীট স্থানান্তরিত হয়। আবার তৎপর 'যুগান্তরে'র ঠিকানা দাঁড়ায় ৭৫নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।

*(১৮) 'যুগান্তর' অফিস পরিবর্তনের তারিখ খুব সম্ভবত ছিল সোমবার, ২৯শে অক্টোবর, ১৯০৬। ১৯০৭ সনের জুলাই মাসে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিচারের সময়ও উক্ত ঠিকানাতেই 'যুগান্তরে'র কার্যালয় অবস্থিত ছিল।

শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের বলেন যে, প্রথম দিকে ১৭১৮ খানার বেশী 'যুগান্তর' বিক্রী হতো না। বাকী সব বিলি করা হতো। অবশ্য ক্রমেই এর কাটতি বাড়তে থাকে। ১৯০৭ সালে প্রায় ৭,০০০ এবং আরও পরে, সম্ভবত ১৯০৮ সালে, ২০,০০০ পর্যন্ত 'যুগান্তর' ছাপা হতো। ২০,০০০ পর্যন্ত 'যুগান্তর' ছাপার সংবাদ তিনি জেলে থাকতে পেয়েছিলেন। 'যুগান্তরে'র জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন হলো এই যে, ১৯০৭ সনে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের কতিপয় বিহারী ছাত্র 'যুগান্তরে'র হিন্দী সংস্করণ বের করবার জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং তদুদ্দেশ্যে ৫০০৲ টাকা দিতেও প্রস্তুত হন। কিন্তু শীঘ্রই 'যুগান্তরে'র উপর পুলিশী আক্রমণ আরম্ভ হওয়ায় ঐ পরিকল্পনা আর বাস্তবে রূপায়িত হলো না। এই বিহারী ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন অন্যতম। তিনি নিজেই একথা পরে ভূপেনবাবুকে বলেছিলেন বলে ভূপেনবাবু আমাদের জানান।

'যুগান্তরে'র লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্কর, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ভাট্টাচার্য আমাদের বলেছেন যে, 'অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী'র নামে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির লেখক ছিলেন উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'যোগাক্ষ্যাপার চিঠি' এই নামে যে সকল রচনা বের হয়, তা ছিল দেবব্রত বসুর রচনা। অবিনাশবাবু আরও বলেন যে, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কোনো রচনা 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয় নি, তবে বিপিনচন্দ্র পালের কয়েকটি—সম্ভবত তিনটি—প্রবন্ধ 'যুগান্তরে' ছাপা হয়েছিল। একদিন বিপিনচন্দ্র একটি প্রবন্ধ হাতে নিয়ে 'যুগান্তরে'র কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশ ভট্টাচার্যের নিকট এসে প্রবন্ধের বিনিময়ে কিছু টাকা দেবার জন্য অনুরোধ জানান। সাধারণত 'যুগান্তরে'র লেখকদের কাউকেই টাকা দেওয়া হতো না, কারণ পত্রিকার আর্থিক সম্বল ছিল যৎসামান্য। অবিনাশবাবু বিপিনচন্দ্রকে বললেন, "আমরা তো কাউকে টাকা দেই না।" তখন বিপিনচন্দ্র বলেন, "আমি যে না খেয়ে মরছি।" এর পর তিনি প্রবন্ধটি দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে চলে যান।

তাছাড়া, অরবিন্দ ঘোষও 'যুগান্তর' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বস্তুত, তিনিই ছিলেন বাংলার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার অন্যতম আদি মন্ত্রণাদাতা ও প্রেরণাস্থল। ১৯০৩ সনের শেষাশেষি তিনি বাংলাদেশে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আরব্ধ বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাংলা দেশ তখনও তাঁর ঐ বাণী গ্রহণের জন্য সম্যকভাবে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কার্জনী কশাঘাত, শক্তি মদোন্মত্ত রাশিয়ার উপর জাপানের সামরিক বিজয়, চীনের বিপ্লব-সাধনা, রাশিয়ার বিপ্লব প্রচেষ্টা, পারস্যের নব জাগরণ ইত্যাদি পর পর যে সব ঘটনা ঘটে তা ভারতে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, এক উগ্র জাতীয়তাবাদ ও নব বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চার করে। ১৯০৫ সনের আগষ্ট মাসে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হলে বাংলার সংগ্রামী চেতনা আরও উগ্র ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ রহিত করণের প্রশ্নও অচিরে নেপথ্যে সরে গেলো—দেখা দিল ভারতীয় চেতনায় স্বরাজ লাভের জলন্ত আদর্শ। তখন শক্তিশালী শাসক জাতির সঙ্গে নিরস্ত্র ভারতবাসীর সুরু হলো নতুন সংগ্রামের পালা। এই কঠিন সংগ্রামে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য কোন্ পথে নির্ধারিত হবে সেই অনিশ্চিত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অরবিন্দ ঘোষ রচনা করেন 'ভবানী মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধ-পুস্তিকা। ১৯০৫ সনের শেষভাগে অথবা ১৯০৬এর গোড়ার দিকে সম্ভবত এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ চাইলেন ভারতের কোনও এক পর্বত-শীর্ষে আরাধ্য দেবী ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু অরবিন্দের কল্পিত এই ভবানী চিরাচরিত হিন্দু-ধর্মের কোনো দেবী নন; তিনি ভারতের ত্রিশ কোটি জনমানবের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সাধনার প্রতীক। বহুদিনের পরাধীনতার পরিণামে যে ক্লৈব্য ও তামসিকতা ভারতবাসীর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার কবল থেকে জনমানসকে মুক্ত করে অরবিন্দ সেখানে ক্ষাত্রতেজের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে চাইলেন। তামসিকতার পঙ্ক থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হলে রজোগুণের সাধনা যে প্রয়োজন অরবিন্দ তা স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি সেদিন শান্তির ললিত বাণী উচ্চারণ না করে জাতির নয়ন সম্মুখে তুলে ধরলেন শক্তিময়ী ভবানীর মূর্তি। এই শক্তিময়ী মাতৃপূজায় তিনি সমগ্র ভারতবাসীকেই আহ্বান

জানান এবং ঐ উদ্দেশ্যে 'আনন্দমঠের' দৃষ্টান্ত অনুসরণে তিনি একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গড়ে তুলতে কৃতসঙ্কল্প হন * (১৯)।

শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশীযুগ" গ্রন্থে (পৃঃ ৪১০) অরবিন্দ রচিত 'ভবানী মন্দির' প্রসঙ্গ আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন, "গুপ্ত-সমিতির এই নূতন সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইলে মা ভবানীর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষা নিতে হইবে। তাহা হইলে বিপ্লবীদের মৃত্যুভয় থাকিবে না। মৃত্যুভয় অতিক্রম করাই 'ভবানী মন্দির'-এর কল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।" গিরিজাবাবুর মতে দেশের বিপ্লবী দলের গোপন কার্যকলাপকে জয়যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষাই 'ভবানী মন্দির'-এর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্ত পুস্তিকা পাঠে আমাদের মনে হয় 'ভবানী মন্দিরের' পরিকল্পনা কোন বিশেষ দল বা সমিতির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে এই পরিকল্পনার পরোক্ষ সংযোগ থাকলেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তেমন ছিল না। বস্তুত, সমগ্র ভারতবাসীর মুক্তি সাধনার দিকে দৃষ্টি রেখেই অরবিন্দ 'ভবানী মন্দিরের' পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তৎকালীন বৈপ্লবিক কর্মী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের অনেকবারই বলেছেন যে, এই ভবানী মন্দির পরিকল্পনার সঙ্গে বিপ্লবী দলের কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না ; যদিও 'ভবানী মন্দির' স্থাপনের কার্যে কলিকাতার বিপ্লবী দলের অনেক কর্মী সেবকরূপে অগ্রসর হয়েছিলেন। কল্পিত মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের কোন্ পার্বত্য অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বেশী অনুকূল হবে তা নির্ণয়ের জন্য শীঘ্রই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বৈপ্লবিক কর্মী ভারত পর্যটনে বহির্গত হন ও অর্থ

* (১৯) *Sri Aurobindo Mandir Annual*, August 15, 1956 সংখ্যক পত্রিকায় "ভবানী মন্দির" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। উক্ত প্রবন্ধে অরবিন্দ লেখেন, "For what is a nation? What is our mother-country?......It is a mighty Shakti, composed of the Shaktis of all the millions of units that make up the nation...The Shakti we call India, Bhawani Bharati, is the living unity of the Shaktis of three hundred million people" (p. 18).

সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐ সময় ভূপেন্দ্রনাথ পাটনা, আরা প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। 'ভবানী মন্দির' সংস্থাপনের জন্য একটি কমিটি ও ট্রাষ্টিও গঠিত হয়েছিল। হেমচন্দ্র বসু মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ভবানী মন্দির' স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী হলো না * (২০)।

১৯০৫ সনের অক্টোবর মাসে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর বাংলার জাতীয় আন্দোলনের স্রোত দেশের উপর দিয়ে জোয়ারের বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। যুবসমাজের সক্রিয় অংশ এই আন্দোলনের গতিকে তীব্রতর ও ব্যাপকতর করে তোলে। আন্দোলনের ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করে সরকারও চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই দুশ্চিন্তা ও ভয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সরকার কর্তৃক দলন-নীতির অবতারণা। ১৯০৫-এর নবেম্বর মাসে লর্ড কার্জন ভারত পরিত্যাগ করলে লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে বিলাতে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার পতন ঘটে ও উদারনৈতিক দল নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করে। উদারনৈতিক মিঃ মর্লি ভারত-সচিব নিযুক্ত হলে ভারতীয় মডারেটপন্থী রাজনীতিকগণ মনে করলেন যে, এবার বুঝি ইংরেজ সরকার ভারতের ভাগ্যের উপর সুপ্রসন্ন হবে। মর্লির নিয়োগে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে কলিকাতার টাউন হলে সভা পর্যন্ত অনুষ্ঠান করেছিলেন (৩১শে জানুয়ারী, ১৯০৬)। কিন্তু তাঁদের ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা শীঘ্রই প্রমাণিত হলো। ১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে সরকার বলপ্রয়োগ দ্বারা বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ভেঙে দিলে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করলে মর্লি-মিণ্টোর উদারনৈতিক শাসনের স্বরূপ নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। এর প্রায় এক বছর পরে সরকারের নীরব সমর্থনে ও নবাব সলিমুল্লার প্ররোচনায়

* (২০) শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবৃতি অনুসারে জানা যায় যে, ১৯০৬ সনে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি নিয়ে বাংলায় আগমন করলে ভূপেন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "What is about your scheme?" অরবিন্দ উত্তরে বলেন, "It is held in abeyance."

কুমিল্লায় নিষ্ঠুর হিন্দু-দলন সুরু হয় (মার্চ, ১৯০৭)। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ময়মনসিংহ জেলায় অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হয়। হিন্দুনারীর সতীত্ব নাশ থেকে দেবী বাসন্তীর প্রতিমা ভঙ্গ কোনো কিছুই বাদ গেলো না। বাঙালী জাতির দৌর্বল্যকে ধিক্কার দিয়ে মহারাষ্ট্রের 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করলো। ৯ই ও ১০ই মে ১৯০৭ সনে 'বন্দে মাতরম্' পত্র 'মারাঠা' ও 'কেশরীর' সমুচিত ভৎর্সনাকে সমর্থন করে বাঙালী জাতিকে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান জানালো * (২১)। ঐ বৎসরের ৪ঠা মে ভারত সরকার কর্তৃক "রিজ্‌লী সার্কুলার" জারী হয়। ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যেই এই সার্কুলারের জন্ম হয়েছিল। এই নতুন সার্কুলারকে ১৯০৫ সনে প্রবর্তিত বাংলা সরকারের "কার্লাইল সার্কুলারের" বৃহদ্ সংস্করণ বলে ভারতীয় নেতাগণ বিশেষিত করলেন * (২২)। ৯ই মে গভীর রাত্রে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের বৃটিশ ভারত থেকে নির্বাসনের দুঃসংবাদ অরবিন্দের নিদ্রা ভঙ্গ করে। ঐ সংবাদ শ্রবণ করে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরমে'র জন্য যে ছোট্ট সম্পাদকীয় টিপ্পনী লেখেন, তা জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয়। এইভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দলন-নীতিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলে। এক্সট্রিমিষ্ট দলের পরিচালিত 'সন্ধ্যা', 'বন্দে মাতরম্', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা সরকারী চণ্ডনীতির তীব্রতম সমালোচনা প্রকাশ করতে থাকে এবং এইসব পত্রিকা সরকারী নিষ্পেষণের কবল থেকে দেশবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মশক্তির সাধনা ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দেয়। বাংলার বৈপ্লবিক সমিতির মুখপত্র

* (২১) 'বন্দে মাতরম্' পত্রে ৯ই ও ১০ই মে ১৯০৭ সনে প্রকাশিত "Before It Is Too Late" ও "The Beast Is Upon Us" সম্পাদকীয় প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

* (২২) ১৯০৭ সনের ২৮শে মে 'বন্দে মাতরম্' পত্রে অরবিন্দ লিখিত "The True Meaning of the Risley Circular" প্রবন্ধ পঠিতব্য।

'যুগান্তরের' তো কথাই নেই। শুধু আত্মশক্তি নয়, আত্মরক্ষার জন্য চাই সশস্ত্র সংগ্রাম। ঐ মর্মে 'যুগান্তর' পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাঁর ইংরেজি অনুবাদ বা সংক্ষিপ্ত সার আজও সরকারী গোপন রিপোর্টে দেখতে পাই।

১৯০৭ সনের মধ্যভাগে সরকার কর্তৃক দেশীয় সংবাদপত্র দলনের অভিযান সুরু হয়। বাংলা দেশে প্রথম সরকারী কোপ পড়লো 'যুগান্তর' পত্রিকার উপর। ২রা জুন, ১৯০৭ সনের সংখ্যায় 'যুগান্তরে' কয়েকটি আপত্তিজনক প্রবন্ধ প্রকাশের উপলক্ষে বাংলা সরকার ৭ই জুন তারিখে পত্রিকার সম্পাদককে সতর্ক করে পত্রে লেখে যে, ভবিষ্যতে এরূপ হিংসা-উদ্দীপক (direct incitement to violence-এর) ভাষা প্রয়োগ করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনা হবে * (২৩)। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের সম্পাদক-মণ্ডলীর শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর "কংগ্রেস" পুস্তকে লিখেছেন, "৩রা জুলাই পুলিস 'যুগান্তর' কার্যালয়ে যাইয়া খানাতল্লাস করিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তরে'র সম্পাদক, এই সন্দেহে তাঁহার বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইল। ভূপেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমিই যুগান্তরের সম্পাদক'। বাস্তবিক এই পত্রের সম্পাদকীয় দায়িত্ব কাহারও ছিল কি না, সন্দেহ। কতিপয় যুবক একযোগে এই পত্র পরিচালিত করিত" * (২৪)। কতিপয় যুবক একযোগে মিলিত না হলে 'যুগান্তর' পত্রিকা পরিচালিত হতো না একথা সত্য হলেও সকল কর্মীকেই সকল কাজ করতে হতো না। পত্রিকা-পরিচালনের যেমন আর্থিক দায়িত্ব প্রধানত বহন করতে হতো অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে, তেমনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে বহন করতে হয়েছিল লেখালেখির দিকের মূল দায়িত্ব। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু প্রভৃতির সাধনাও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এবং সকল ব্যাপারেই 'যুগান্তর' কর্মীদের পরামর্শদাতা ছিলেন

* (২৩) 'যুগান্তরে'র প্রথম মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের রায় 'বেঙ্গলী' (২৫শে জুলাই, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য।

* (২৪) "কংগ্রেস" (কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৯২৮, পৃঃ ২০৫)

অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর ও অবিনাশ চক্রবর্তী। নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিতকার লিজেল্ রেম' ও ফরাসী লেখিকার অনুসরণকারী শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'যুগান্তর' পত্র স্থাপন ও পরিচালনায় নিবেদিতার প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করেছেন, তা তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্য বলে গ্রহণ করা কঠিন। বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় নিবেদিতার পরোক্ষ প্রেরণা কেহই অস্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু গিরিজাবাবুর গ্রন্থে এই আইরিশ ভগিনীর বিপ্লববাদী কর্মের গুরুত্ব অযথা বাড়ানো হয়েছে। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটিতেও নিবেদিতা বিপ্লববাদ প্রচার করেন নি * (২৫) বা 'যুগান্তর' পত্রিকা স্থাপনেও নিবেদিতার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। গোয়েন্দা বিভাগীয় পুলিশের তৈরী সমসাময়িক গোপনীয় রিপোর্টগুলিতে বাংলার বিপ্লববাদ ও 'যুগান্তর' প্রসঙ্গ বর্ণনাকালে বহু কর্মীর নামই লিখিত হয়েছে, কিন্তু নিবেদিতার নামোল্লেখ আজও নজরে পড়ে নি। লিজেল্ রেম' ঐতিহাসিক গবেষক হিসাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নন সেকথা আমরা ইতঃপূর্বেই অন্যত্র আলোচনা করেছি। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে নিজ বক্তব্য খাড়া করার আগ্রহ তাঁর মধ্যে সর্বদাই অতি প্রবল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" পুস্তক (পৃষ্ঠা ২০৬) থেকে জানা যায়, ৫ই জুলাই ১৯০৭ সনে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বের হয়েছে জানতে পেরে নিজেই 'যুগান্তর' কার্যালয়ে এসে ধরা দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হলো। এই প্রসঙ্গে হেমেনবাবু লিখেছেন, "ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পক্ষ হইয়া জামিনের দরখাস্ত করিলে আদেশ হইল, ৫ হাজার টাকা হিসাবে ২জন জামিন হইলে তাঁহাকে জামিনে খালাস দেওয়া

* (২৫) বর্তমান লেখকদের "জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" (কলিকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠ ১২৮-৪৬) দ্রষ্টব্য। ঐ গ্রন্থে রেমঁ ও গিরিজাবাবুর বহু তথ্যগত ভুল ও অসঙ্গতি নির্দেশ করা হয়েছে।

হইবে। সেদিন একটু বুঝিবার ভুলে তাঁহাকে খালাস করা হইল না। পরদিন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ও চারুচন্দ্র মিত্র জামিন হইয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনিলেন। ২২শে জুলাই মোকদ্দমার দিন পড়িল।"

২২শে জুলাই 'যুগান্তর' রাজদ্রোহ মামলার ডিটেকটিভ পুলিশ ফোর্সের সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ এলিস সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেন যে, ১লা জুলাই * (২৬) তিনি ৪১নং চাপাতলা ফার্ষ্ট লেনে গমন করলে সেখানে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেখতে পান। অবিনাশচন্দ্র নিজেকে 'যুগান্তরের' কার্যাধ্যক্ষ বলে পরিচয় দেন। তখন এই আসামী অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ কর্মাধ্যক্ষের নিকটেই বসেছিলেন। সাক্ষী কর্মাধ্যক্ষকে 'সম্পাদক কে ?' জিজ্ঞাসা করলে অবিনাশচন্দ্র ভূপেন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তৎপর মিঃ এলিস ভূপেন্দ্রনাথকে দিয়ে খানাতল্লাসী ওয়ারেণ্টের পেছনে নাম সই করিয়ে নেন এবং পরে ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটস্থ তাঁর বসতবাটিতে অনুসন্ধান করে' রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ-সম্বলিত 'যুগান্তরের' কয়েকখানি কপিও হস্তগত করেন * (২৭)। প্রকৃতপক্ষে সে সময় কোনো ব্যক্তি বিশেষ 'যুগান্তরের' সম্পাদক না থাকলেও ভূপেন্দ্রনাথকেই মোটের উপর সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। কতকটা এই কারণে ও কতকটা অবস্থাচক্রে ভূপেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় ও সহকর্মীদের সম্মতিক্রমে 'যুগান্তরে'র সম্পাদকরূপে নিজেই ধরা দেন।

'যুগান্তর' মামলা আরম্ভ হলে (২২শে জুলাই, ১৯০৭) ভূপেন্দ্রনাথ আদালতে বিচারকের উদ্দেশ্যে এক স্মরণীয় বিবৃতি দাখিল করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, "I, Bhupendra Nath Datta, do hereby beg to state that I am the Editor of the journal 'Jugantar', and I am solely

* (২৬) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মতে ঐদিন ছিল ৩রা জুলাই, ১৯০৭ : "কংগ্রেস" পুস্তক (পৃঃ ২০৫) দ্রষ্টব্য।

* (২৭) 'যুগান্তর' মামলায় মিঃ এলিসের সাক্ষ্য 'বেঙ্গলী' পত্রে (২৩শে জুলাই, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য।

responsible for all the articles in question. I have done what I have considered in good faith to be my duty to my country. I do not wish the prosecution to be put to the trouble and expense of proving what I have no intention to deny ; I do not wish to make any other statement or to take any further action in the trial". অর্থাৎ "আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, আমিই 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক এবং আমিই উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির জন্য সর্বাংশে দায়ী। আমি সরল বিশ্বাসে আমার দেশের প্রতি কর্তব্য বলে যা ভাল বুঝেছি, আমি তাই করেছি। যা অস্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য আদালতের অনর্থক অর্থব্যয় বা শক্তিক্ষয় হোক আমি তা চাই না। আমি আর কোনো বিবৃতি দিতে বা এই বিচারে আর কোনো অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই।"

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের অবগতির জন্য আরও একটি কথা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। ভূপেন্দ্রনাথের মূল বিবৃতি আরও অনেক বেশী জোরালো ভাষায় লিখিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালতে যে বিবৃতি ভূপেন্দ্রনাথের নামে দাখিল করা হলো তাতে তাঁর মূল ভাষা অনেকাংশে বদলে গিয়েছিল আর সেই ভাষা-বদলানো বিবৃতি ভূপেন্দ্রনাথের তেজঃদৃপ্ত চরিত্রকেও যথেষ্ট উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করলো না। ভূপেন্দ্রনাথের মামলায় তাঁর পক্ষে কৌঁসুলী ছিলেন ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তি। তাঁরা ভূপেন্দ্রনাথের মূল বিবৃতির উপর সূক্ষ্মহিসেবী উকিলি ভাষার যে প্রলেপ দিলেন তাতে আসামীর বলিষ্ঠ রাজনীতিক মনোভাব সম্যকরূপে প্রকাশ পেলো না। কৌঁসুলীর পক্ষ থেকে তাঁদের অতিরিক্ত ভাষা-সংযম ও সাবধানতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু রাজনীতিক ঘোষণায় অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ না থাকলে তা নিষ্প্রাণ। ভূপেন্দ্রনাথের কৌঁসুলীরা আসামীর মূল বিবৃতির ভাষা বদলিয়ে দুর্বল করে দিলেন বলে নব্য-জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম প্রধান নায়ক কৌঁসুলীদের উদ্দেশে 'বন্দে মাতরম্'

শত্রে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন * (২৮)। এমন কি তাঁর অন্যতম কৌঁসুলী আশুতোষ চৌধুরীর মামলা পরিচালনার ধরণেও ভূপেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি আর একটি দ্বিতীয় বিবৃতিও পঠিত হবার উদ্দেশ্যে রচনা করলেন, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত আর পঠিত হলো না * (২৯)।

এর ঠিক দুই দিন পরে (২৪শে জুলাই, ১৯০৭) প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি এইচ্. কিংসফোর্ড 'যুগান্তর' মামলায় তাঁর রায় প্রদান করেন * (৩০)। উক্ত রায় থেকে জানা যায় যে, মূলত ১৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত দুইটি রচনার জন্যই 'যুগান্তরের' বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ৫ই জুলাই গ্রেপ্তার হয়ে ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা পুলিশ কোর্টে আনীত হলে তাঁর জামিনে মুক্তির জন্য ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসামীর পক্ষ থেকে যে আবেদনপত্র দাখিল করেন, তাতে সরকারী কৌঁসুলী মিঃ হিউম প্রবল আপত্তি জানিয়ে আদালতে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনিও আসামীর

* (২৮) ২৬শে জুলাই ১৯০৭ সনের 'বন্দে মাতরম্' পত্রে "Srijut Bhupendranath" শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ আমাদের বলেছেন যে, ঐ প্রবন্ধের লেখক ছিলেন অরবিন্দ।

* (২৯) ভূপেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ও অপঠিত দ্বিতীয় বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ :—

"I do not wish any address to be delivered by counsel on my behalf. I have refused to plead not because I wish to withdraw a single word of what I have written or acknowledge the justice of any sentence that may be passed on me, but for an opposite reason. I have written what every one knows to be true and what is in the mind of all my countrymen, but I was aware that in doing so I would have no chance of justice in the British Courts. I do not think it consistent with the views I have always preached to plead before them." এই প্রসঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' পত্রে (২৬শে জুলাই, ১৯০৭) অরবিন্দের লেখা "Srijut Bhupendranath" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (৩০) "বেঙ্গলী" ২৫শে জুলাই, ১৯০৭ সনের সংখ্যায় মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের রায় দ্রষ্টব্য।

বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ স্বরূপ ১৬ই জুনের 'যুগান্তরে' প্রকাশিত প্রবন্ধের কথাই উল্লেখ করেন * (৩১)। ২২শে জুলাই সরকারী পক্ষের মিঃ গ্রেগরীও (Standing Counsel) আদালতে বিবৃতি দান কালে ১৬ই জুনের 'যুগান্তর' সংখ্যারই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন * (৩২)। ঐ একই দিনে "কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কসের" মুদ্রাকর শ্রীমন্ত রায়চৌধুরীও সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক হিসাবে বর্তমান আসামীকে কিছুদিন যাবৎই জানেন এবং বর্তমান মামলার বিষয়বস্তু সমন্বিত ১৬ই জুনের পত্রিকাখানি উপরি-উক্ত প্রেসেই ছাপা হয়েছিল * (৩৩)।

১৬ই জুন তারিখের 'যুগান্তরে' প্রকাশিত যে দুটি প্রবন্ধের জন্য প্রথম 'যুগান্তর' মামলা রুজু হয়, সেগুলির মূল কপি চোখে দেখবার সুযোগ এখনও

* (৩১) "ইংলিশম্যান", ৬ই জুলাই, ১৯০৭

* (৩২) 'বেঙ্গলী', ২৩শে জুলাই,—'যুগান্তর' সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলার-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

* (৩৩) "The issue of 'Jugantar' dated the 16th June last, the subject matter of the charge, was printed in the above press. The accused gave the press order. The block was received from the 'Jugantar' office. It was set up and brought to the above press on the 16th June last...After printing the copies were sent to the 'Jugantar' office". শ্রীমন্ত রায়চৌধুরীর এই উক্তি ২৩শে জুলাই ১৯০৭ সনের "বেঙ্গলী" পত্রে দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫৬০) যে-দুইটি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ 'যুগান্তরে'র প্রথম মামলার প্রকৃত বিষয়বস্তু ছিল সে-প্রসঙ্গ বর্ণনাকালে 'যুগান্তরে'র ৭ই এপ্রিল ও ৫ই মে ১৯০৭ সনের দুটি রচনার নামোল্লেখ করেছেন; বর্ণনা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। 'যুগান্তর' মামলায় মোট ঐ পত্রের নয়টি প্রবন্ধ বিচারার্থ উপস্থাপিত হয়েছিল। ২৬শে জুলাই, ১৯০৭ সনের "বন্দে মাতরম্" পত্রে ঐগুলির সরকারী অনুবাদ মুদ্রিত হয়। তার মধ্যে ৭ই এপ্রিল, ৩রা মে, ৫ই মে, ১২ই মে, ২রা জুন, ৯ই জুন, ১৬ই জুন প্রভৃতি তারিখের প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ থাকলেও প্রথম 'যুগান্তর' মামলার অভিযোগের আসল বিষয়বস্তু ছিল ১৬ই জুনের দুইটি বিশিষ্ট রচনা। গিরিজাবাবুর দৃষ্টিতে এই দুইটি রচনা একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছে।

পাই নি। এর সরকারী ইংরেজী অনুবাদ ২৬শে জুলাইয়ের "বন্দেমাতরম্" পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ দুই প্রবন্ধের ইংরেজী সারমর্ম বাংলার দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের উপর গোপনীয় সরকারী রিপোর্টেও ধরা রয়েছে। তখনকার দিনে ইংরেজীতে এই প্রবন্ধ দুইটির নামকরণ করা হয়েছিল—"Away with Fear" ও "Stick Medicine" অর্থাৎ "নাই ভয়" ও "লাঠ্যৌষধি"। বিচারপতি কিংস্‌ফোর্ড তাঁর রায় প্রদান কালে মন্তব্য করেন যে, "নাই ভয়" প্রবন্ধে লেখক ভারতস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যকে একটা প্রকাণ্ড ভাঁওতা বলে বর্ণনা করেছেন, তাকে তুলনা করেছেন ভিত্তিহীন অট্টালিকার সঙ্গে যা সামান্য একটু আঘাত খেলেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। লেখকের মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিকে অযথা বেশী মূল্য দেওয়া হচ্ছে এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য যে আজও টিঁকে রয়েছে তার প্রধান কারণ ভারতবাসীর নির্বুদ্ধিতা। বিচারপতি দ্বিতীয় প্রবন্ধ "লাঠ্যৌষধির" উল্লেখ করে বলেন যে, এই প্রবন্ধে রাজদ্রোহের উস্কানি আরও নগ্ন, আরও পরিষ্কার। পাঞ্জাবের সরকার-বিরোধী হিংসাত্মক কর্মনীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কাবুলি দাওয়াই শ্রেষ্ঠ ("There is no such wonderful remedy as the Kabuli medicine")। পরিশেষে বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটি ইংরেজ শাসনকে শুধু অমান্য করতে নয়, হিংসাত্মক কর্মের দ্বারা একেবারে উৎখাত করতেও জনমানসে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে * (৩৪)। তাই রাজদ্রোহের অভিযোগে 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ অভিযুক্ত হলেন। এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড তাঁর জন্য বিচারের রায়ে নির্দিষ্ট হলো।

* (৩৪) "I think there can be no question that the language is such as to excite not merely feelings of disobedience or resistance to the authority of Government, but an inclination to defy and subvert it by open acts of violence." 'যুগান্তর'মামলার কিংসফোর্ডের রায় প্রসঙ্গে "বেঙ্গলী" পত্র (২৫শে জুলাই, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য।

ভূপেন্দ্রনাথ প্রশান্ত চিত্তে হাসতে হাসতে দেশের জন্ম কারাবরণ করলেন। আত্মত্যাগের সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য ভাই বলে বাঙালী সমাজ ও ভারতবাসী ভূপেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় পেলো। ২৫শে জুলাই 'বন্দে মাতরম্' পত্রে স্বয়ং অরবিন্দ তাঁর কারাবরণ উপলক্ষে "One More For The Altar" নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে মানুষের ললাটে দুঃখ অনিবার্য। কিন্তু সকল অত্যাচার ও নিষ্পেষণ প্রশান্ত চিত্তে এবং উন্নত শিরে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই সুরু হবে আমাদের আত্মার বিজয় অভিযান * (৩৫)। পরদিন ২৬শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ ও তেজঃদৃপ্ত আচরণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রে আরও একটি বড় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মডারেটপন্থী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ভূপেন্দ্রনাথ ও সরকার উভয় পক্ষকেই নিন্দা করে সম্পাদকীয় টিপ্পনী লিখলো। ভূপেন্দ্রনাথের এই কারাবরণের গভীর তাৎপর্য তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো না। কিন্তু অমৃতবাজার বা আরও দু'একখানি মডারেটপন্থী পত্রিকা বাদ দিলে বাংলার জাতীয়তাবাদী সকল পত্রিকাই ভূপেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করলো।

অত্যাচারী শাসনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে হাসিমুখে কারাবরণ করে ভূপেন্দ্রনাথ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে যে নব অধ্যায় সৃষ্টি করলেন, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বাংলার সর্বত্র। ২৪শে জুলাই তারিখেই অপরাহ্ণে কলেজ স্কোয়ারে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ এক সভার অনুষ্ঠান করে 'যুগান্তর' সম্পাদকের উদ্দেশে তাঁদের হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। বাংলার নারীসমাজও সেদিন ভূপেন্দ্রনাথের সংগ্রামী সাধনায় উদাসীন ছিল না। দেশমাতৃকার পূজার

* (৩৫) "It is a mistake to whine when we are smitten, as if we had hoped to achieve liberty without suffering. To meet persecution with indifference, to take punishment quietly as a matter of course, with erect heads and undimmed eyes, this is the spirit in which we must conquer."

উৎসর্গিত প্রাণ ভূপেন্দ্রনাথ কারাবরণ করলে তাঁর মাতৃদেবীকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ৯ই আগষ্ট ১৯০৭ সনে (২৪শে শ্রাবণ ১৩১৪ সালে) ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়ীতে তাঁর সহধর্মিণী কর্তৃক মহিলাদের এক সভা আহূত হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী লীলাবতী দেবী এই সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করলেন। সভারম্ভে রবীন্দ্রনাথের "আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি" গানটি গীত হলো। তারপর সভানেত্রী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হলে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করলেন।

"যতোধর্মস্ততো জয়ঃ।"

সময়োচিত সম্ভাষণপুরঃসর নিবেদন,

আমরা কতিপয় বঙ্গনারী যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদভার লইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। আপনার পুত্র অকুণ্ঠিত সাহসভরে স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া রাজদ্বারে যে নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেক বঙ্গনারী অসীম গৌরব অনুভব করিতেছি। পতিত জাতি ক্ষীণপুণ্য হৃতধর্ম ও লুপ্তগৌরব পুনরায় লাভ করিতে গিয়া পদে পদে যখন তীব্র অপমান ভোগ করেন, তখন সে নিগ্রহ উজ্জ্বল মণির ন্যায় জাতীয় জীবনের শোভাবর্ধন করিয়া থাকে। বিধাতার শুভ বরে আপনার পুত্র অদ্য যে স্পৃহনীয় আভরণ অর্জন করিয়া আনিয়াছেন, তাহার দীপ্তিতে কেবল আপনার কুল নহে—সমগ্র বঙ্গদেশ আলোকিত হইয়াছে। এরূপ সন্তানের জন্মে কুল পবিত্র, জননী ধন্যা ও জন্মভূমি আলোকিত হইয়া থাকেন। আপনার পুত্রের ন্যায় নির্ভীক স্বদেশ-সেবক পুত্র প্রতি বঙ্গনারীর অঙ্কে অবতীর্ণ হউন, এই আশীর্বাদ অদ্য আমরা বিধাতার নিকট ভিক্ষা করিতেছি। ইতি—

২৪শে শ্রাবণ, ১৩১৪ সাল।

সমবেত বঙ্গমহিলাগণ।

৬১নং হ্যারিসন রোড।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অভিনন্দন-পত্র পাঠের পর স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভাদেবী রচিত "শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি" শীর্ষক এক সুদীর্ঘ কবিতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যা সভায় আবৃত্তি করেন। কবিতাটির প্রথম কয়েক চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

"তোমাকে দেখিনি বৎস! তবু দূর হ'তে
অযুত বিজয় মাল্য পরাই গলেতে।
তরুণ বয়সে তুমি! সিংহের সমান,
যুঝিয়া রাখিলে ভবে বাঙ্গালীর মান।
বাখানি তোমার তেজ, তোমার সাহস,
থাকিবে অটুট বঙ্গে, তোমার সুযশ।
এক হ'তে অযুতের হইবে উত্থান,
জননীর দুঃখনিশা হবে অবসান।
বজ্রপাত, কারাগার এতে কিবা ভয়,
শতকণ্ঠে গাহি আজি মাতৃভূমি জয়" * (৩৬)।

আবৃত্তি শেষে একটি রৌপ্যথালে হস্তনির্মিত কারুকার্যশোভিত পাত্রাবরণের উপর অভিনন্দন-পত্র স্থাপন করে' ভূপেন্দ্র-জননী শ্রীযুক্তা ভুবনেশ্বরী দেবীকে অর্পণ করা হয়। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ-বিরচিত "ওদের আঁখি যতই রক্ত হ'বে, মোদের আঁখি ফুটবে" গানটি গীত হবার পর সভার কার্য সমাপ্ত হয় * (৩৭)।

ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হবার ঠিক পূর্বদিন অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই, ১৯০৭ সনে কলিকাতার 'স্টেট্স্ম্যান' (Statesman) পত্র উল্লাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল যে, পুলিশ 'যুগান্তর' কার্যালয় তল্লাস করে' এমন সব নথি-পত্র পেয়েছে যার ফলে 'যুগান্তরে'র মৃত্যু প্রায় সুনিশ্চিত * (৩৮)। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের

* (৩৬) সমগ্র কবিতাটি 'মন্দিরা' মাসিকে (ভাদ্র, ১৩৬৪) মুদ্রিত হয়েছিল।

* (৩৭) ২৮শে শ্রাবণ ১৩১৪ বা ১৩ই আগষ্ট ১৯০৭ সনের 'নবশক্তি' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

(৩৮) *I. B. Records*, West Bengal, File No, 477 of 1907, p. 46

কারাবরণেও 'যুগান্তরে'র মৃত্যু সংঘটিত হলো না, বরং নূতন প্রাণশক্তি ও সঙ্কল্প নিয়ে ঐ পত্রিকা আবার বের হতে লাগলো। শীঘ্রই 'যুগান্তর' পত্রের উপর দ্বিতীয়বার সরকারী কোপ পতিত হয়। 'যুগান্তরে'র কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক বসন্তকুমার ভট্টাচার্য "মিথ্যা ভয়" ও "সিডিসন ও বিদেশী রাজা" (৩০শে জুলাই, ১৯০৭) এবং "মিথ্যার পূজা" (৫ই আগষ্ট, ১৯০৭) শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় 'যুগান্তরে' প্রকাশের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হলেন * (৩৯)। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড এই মামলায় রায় প্রদান করেন * (৪০)। পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বিচারক বলেন যে, প্রবন্ধগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় রাজদ্রোহমূলক এবং বৃটিশ ভারতে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও সংগ্রামের মনোভাব জাগ্রৎ করাই এদের উদ্দেশ্য।......এই প্রবন্ধগুলি পড়ে এরূপ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে, অশিক্ষিত ও বিপথে পরিচালিত জনগণকে গবর্ণমেণ্ট ও তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে ও বিদ্রোহ প্রকাশে উত্তেজিত করার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এই পত্রিকা পরিচালিত হয় এবং এ' একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য-জনক ব্যাপার যে এইপ্রকার পত্রিকা এখনও আইনের আশ্রয়ে বেঁচে থাক্‌তে পারছে * (৪১)। ম্যাজিষ্ট্রেট আরও বলেন, "বর্তমান মামলার প্রবন্ধগুলি

* (৩৯) ২৩শে আগষ্ট ১৯০৭ সনের 'হিতবাদী' পত্রে প্রকাশিত অবিনাশবাবু ও বসন্তবাবুর বিরুদ্ধে আনীত কিংসফোর্ডের চার্জ-সীট (২০শে আগষ্ট, ১৯০৭) দ্রষ্টব্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেফাজতে রক্ষিত *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal* (Nos. 31 and 32 of 1907) পুস্তকে উল্লিখিত প্রবন্ধ তিনটির ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায়।

* (৪০) 'বেঙ্গলী' (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) ও 'বন্দে মাতরম্' (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) পত্রিকায় কিংসফোর্ডের রায় দ্রষ্টব্য। 'যুগান্তরে'র দ্বিতীয় মামলায় রায় প্রদানকালে প্রথম মামলায় রায় প্রদানের তারিখ হিসাবে তিনি ২৭শে জুলাই ১৯০৭ উল্লেখ করেছেন। সংবাদটিতে কিঞ্চিৎ ভুল লক্ষণীয়। 'যুগান্তরে'র প্রথম মামলায় তাঁর রায় প্রদত্ত হয়েছিল ২৪ শে জুলাই, ১৯০৭ সনে।

* (৪১) "They are of a grossly seditious nature and calculated to excite

পূর্ব-মামলার প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তেজক।" বিচারে 'যুগান্তরে'র কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

যে-'যুগান্তর' পত্রিকা নিয়ে একদিন ইংরেজ সরকারের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, সেই 'যুগান্তরের' বিপ্লবাত্মক বাণী পাঠকদের সম্যক অবগতির জন্য "মিথ্যা ভয়" ও "মিথ্যার পূজা" প্রবন্ধ দুটি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

মিথ্যা ভয়

"কাণাকে কাণা বলিলে কাণার আর রাগের সীমা থাকে না; যাহার যেখানে ব্যথা সেখানে হাত পড়িলে সে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে; জগতের সম্মুখ হইতে আপনার ক্ষতস্থান লুকাইয়া রাখিতে সকলেই সচেষ্ট। ভারতে ইংরাজ সরকারেরও সেই দুর্দশা। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরাজ প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝে; আর বুঝে বলিয়াই সে প্রকাণ্ড আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায়; গোটাকত ফৌজ, তোপ, লাল পাগড়ীর ভড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা করে। ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ, ঘন ঘন পাহারা, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, বড় বড় গোরা বারিক, ও সমস্ত কেবল একটা জাদু করিবার কল মাত্র। লোকে বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছে আর হাঁ করিয়া ভাবিতেছে—ইংরাজ সরকার কি দোর্দণ্ডপ্রতাপ! ইংরাজ জানে যে লোকের এই অজ্ঞানই ভারতে তাহার রাজত্বের ভিত্তি। তাই সে নানা কৌশলে এই অজ্ঞানতা বজায় রাখিতে চায়, লোকে যেদিন সন্দেহ করিবে যে এ তাসের ঘর

contempt, enmity and hostility to the Government established by law in British India......It is impossible to peruse these articles without arriving at the conclusion that this newspaper is published with the deliberate intention to incite the ignorant and misguided to the commission of acts of violence and rebellion against Government and its officers; and it is certainly a most unfortunate circumstance that the law should permit the paper to exist."

সমগ্র ভারতবাসীর এক ফুৎকারও সহ্য করিতে সমর্থ নয়, সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসানের সূত্রপাত। আজ অনেক দিনের পরে লোকের মনে সেই সন্দেহ আসিয়াছে; তাই কি তাহার এত আস্ফালন?

সেদিন ইংরাজ সরকারের পরাক্রমের কথা প্রসঙ্গে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী একজন দেশীয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন—এদেশের লোকের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু করিবার কি ক্ষমতা?—রাজা কিছু না বলিয়া তাঁহার একজন কর্মচারীকে এক গামলা কাল কলাই ও গোটা কতক সাদা মটর আনিতে বলেন। সাদা মটরগুলিকে কাল কলাইয়ের উপর ছড়াইয়া দিয়া গামলাটা নাড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্বেত মূর্তিগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। ইংরাজ কর্মচারীকে দেখাইয়া রাজা বলিলেন—ভারতে তোমাদের ঐরূপ অবস্থা, গোটাকতক মাত্র সাদা সাদা প্রাণী ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেছে। শুধু একবার জাতীয় শরীরকে নাড়াচড়া দেওয়ার অপেক্ষা।

তবে এই যে দেড়শত বৎসর ধরিয়া "জনকতক শ্বেত প্রহরী পাহারা" আমাদের নয়নে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়া রহিয়াছে তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়; আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন। সমগ্র ভারতবাসীর তুলনায় দেশে ইংরাজ কয়জন? আর তাহাদের বেতনভোগী স্বদেশদ্রোহীর সংখ্যাই বা কত? দেশের লোকে যেদিন বুঝিবে যে বিদেশীর কেবল পরের দেশে আসিয়া পরদেশবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়াই উদ্দেশ্য, সেইদিন আবার এই বিরাট জাতির মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিবে; কাঙালের মত ভারতে আসিয়া কুড়ানো রাজমুকুট মাথায় দিয়া ইংরাজ আজ ভাবিতেছে বুঝি সে সত্য সত্যই ভারতের সম্রাট হইয়া পড়িয়াছে—এই জাতীয় শরীরে প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সে ভ্রান্ত বিশ্বাস কোথায় উড়িয়া যাইবে। দেশের লোক যদি আপনার পরাধীনতা নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া না লয়, দেশের লোক যদি একযোগে খাজনা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে তাহা শত সহস্র ইংরাজ জাতি আসিলেও ভারতের পায়ে আর শৃঙ্খল বাঁধিতে পারে না।

যাহারা আত্মশক্তিতে অনাস্থাবান্ হইয়া বিশ্বাসহীনের মত এখনও চুপ

করিয়া পড়িয়া আছে আর বৃথা বাক্যজালে দেশের লোককে বুঝাইতে চাহিতেছে "এখনও সময় হয় নাই" তাহারা ঐ অলস ভাবেই দিন কাটাইবে। কিন্তু যাহাদের কাণে স্বাধীনতার মন্ত্র পশিয়াছে তাহাদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। অনন্যকর্মা হইয়া তাহাদিগকে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহারা এখনও বুঝে নাই তাহাদিগকে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে; যাহারা কর্তব্যের পথ দেখিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া মৃত্যুমুখে ছুটিতে হইবে।

ভয় নাই। বহু দিনের পর আজ মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়াছে। দেখিতেছ না আজ জননীর কাতর ক্রন্দন দেবলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে: ঐ লক্ষ লক্ষ ধৃতাস্ত্র দেবশিশু ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জননীর ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে। আবার ভারতে গীতার যুগ আসিয়াছে; আজ যাহারা শিশু তাহারাই ঐ আগতপ্রায় কুরুক্ষেত্রের মহাহবে দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম হইয়া দাঁড়াইবে, তাহারাই হৃদ্‌পিণ্ড তর্পণ করিয়া পিতৃগণের তুষ্টি সাধন করিবে; তাহারাই অমৃতধারা সিঞ্চনে মৃতদেহে প্রাণ আনিয়া দিবে। অমরজাতি আমরা;—আমাদের আবার কিসের ভয়?"

মিথ্যার পূজা

"ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গী সরকার ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা যুগান্তরের উত্থানশক্তি একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুগান্তর আবার বাহির হইল। মরিল না ত বটেই; অধিকন্তু আবার ভবিষ্যতে যে মরিবে তাহার আশা পর্যন্ত দিল না। ইহাতে সরকারের ত রাগ হইবারই কথা!

ইংলিশম্যান ও ডেলি নিউস 'হা হুতাশ' করিয়া শেষে আশা দিল—"ভয় নাই; ছোটলাট আবার যুগান্তর সম্পাদককে জেলে দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।" ছোটলাট নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি যুগান্তরের কতগুলা সম্পাদক আছেএকবার দেখিয়া লইবেন; সব কটাকে জেলে পাঠাইবেন।

যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে? যুগান্তর ত জাতীয় ভাবসমষ্টি মাত্র।

লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণা মাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাকা লাগে। সম্পাদক ত তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রী ত ধরা পড়ে না; যন্ত্রী যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুণ্ড মালিনীর খর্পর তলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক—তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক। গর্বস্ফীত অন্ধ! তাহাদের সংখ্যা জানিতে চাও! একদিন জানিবে। তাহাদের সকলকে কারাগারে পুরিতে পার এতবড় কারাগার ত আজও তোমরা গাঁথিয়া তুলিতে পার নাই।

আপনাকে আপনি যে গোলাম না সাজায়, তাহাকে গোলাম সাজাইতে পারে এতবড় বীর এ ত্রিভুবনে কেহ নাই। তুমি আমায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোমার অধীনতা স্বীকার করাইবে; আমি যদি 'ও দুঃখ নয় মা দয়া তোমার' বলিয়া সহাস্য মুখে কারাগৃহে প্রবেশ করি—তবেই ত তোমার দমনের চেষ্টা ব্যর্থ! তুমি আমায় ফাঁসী কাঠে ঝুলাইবে?—আমি মরিবার সময়েও ক্ষমতা তুচ্ছ করিয়া মরিব। একদিকে মাতৃমন্ত্র অপর দিকে ইংরাজের পরাধীনতা স্বীকার করাইতে চাও! মোগল সম্রাট যখন একদিন তোমাদেরই মত মদগর্বে অন্ধ হইয়া শিখ-গুরুকে ধর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তখন শিখগুরু হাসিতে হাসিতে আপনার মাথা দিয়াছিলেন; ধর্ম দেন নাই। আমরাও তাহাই করিব। ভারতে আবার ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। মোগল সিংহাসন যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিল, তোমার পলাশীতে কুড়ান সিংহাসন সেখানে ভাসিয়া যাইবে। আমরা রাখি বলিয়া তোমরা আছ, বাঁচাই বলিয়া তোমরা বাঁচ। আমরা তোমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিই বলিয়াই তোমরা আমাদের অনশনক্লিষ্ট করিতে পার; আমরা নির্জীব সাজিয়া থাকি বলিয়াই তোমরা আমাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সাহসী হও; আমরা তোমাদের মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই তোমরা সত্যই মাথার মণি; যেদিন নিষ্ঠীবনের মত তোমাদের ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিব—সেদিন তোমরা নিষ্ঠীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহ। আমরা জাতির

ঘোরে মিথ্যার পূজায় প্রবৃত্ত বলিয়াই মিথ্যা আজ সত্যের আসনে বসিতে সাহস পাইয়াছে। পরমহংস দেব বলিতেন—মায়াকে মায়া বলিয়া চিনিলে মায়া পলাইয়া যায়। যেদিন আমরা বুঝিব যে আমরা কতকগুলা অন্নদাস, ভবঘুরেকে ধরিয়া স্বহস্তে তাহাদের কপালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছি, যে দিন বুঝিব আমরা বাস্তবিক কাণা নহি, শুধু স্বেচ্ছায় চোক বুজিয়া অন্ধকার দেখিতেছি মাত্র, যেদিন বুঝিব আমরা দুর্বল নহি, অপারগ নহি, শুধু আলস্যের ঘোরে, অজ্ঞানের ঘোরে পড়িয়া আছি মাত্র—সেইদিন আমাদের দুর্দশার নিবৃত্তি। সে দিন আর "আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত নহি" বলিয়া জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইতে ছুটিব না। অনন্ত শক্তির আধারভূতা, রক্তে রক্তে চৈতন্যময়ী আমাদের জননী—আমরা আবার কাহার দাস ?

প্রতিজ্ঞা কর দেখি আর মিথ্যার সংস্পর্শে আসিব না, ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়রূপ যাদুগৃহে পাণ্ডিত্যের তকমা পাইয়া ভেড়া বনিয়া থাকিব না; ছোটলাট বড়লাট বাহির হইলে অভিনন্দন পত্র লইয়া চিরদাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য তাহাদের পাছু পাছু ছুটিব না—তখন মায়ের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবে; দেখিবে মা চির স্বাধীনা। একবার চোখের ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের অভয়পদ দেখ দেখি; বুঝিতে পারিবে এ ইংরাজ রাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা মায়াপুরী।

একথা বলিলে ইংরাজ রাগিয়া উঠিবে; কিন্তু আমাদের সহিত ইংরাজের মিলনের ত কোন সম্ভাবনাই নাই। একস্থানে বসিয়া সত্য মিথ্যা উভয়ে ত নির্বিবাদে ঘর করিতে পারে না। ইংরাজের বিরোধ ধর্মের সহিত—সত্যের সহিত। আর যাহার সত্যের সহিত বিরোধ তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।"

শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য উভয়েই পৃথকভাবে আমাদের বলেছেন যে, "মিথ্যার পূজা" রচনাটি অরবিন্দ ঘোষের ও "মিথ্যা ভয়" প্রবন্ধ সম্ভবত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা।

'যুগান্তরে'র বৈপ্লবিক প্রচারকার্য যে ইংরেজ সরকারকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত করে' তুলেছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯১৮ সনে রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও 'যুগান্তরে'র বিপ্লবাত্মক প্রচারকার্যের উপর সবিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে 'যুগান্তরে'র যে-সংখ্যাগুলির কথা আলোচিত হয়, তন্মধ্যে ১২ই আগস্ট ও ২৬শে আগস্টের (১৯০৭) সংখ্যাদ্বয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১২ই আগস্টের সংখ্যায় দেশীয় সৈন্য-বাহিনীতে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করে' সৈন্যদলকে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল *(৪২)। ২৬শে আগস্টের সংখ্যায় ছদ্মনামে এক পাগলের চিঠি মুদ্রিত হয়। তাতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের স্বর সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত।

পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ বা প্রবন্ধাংশ থেকে 'যুগান্তরে'র আত্মিক চেহারার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। বস্তুত, এই পত্রের প্রতিটি ছত্রে বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হতো। আত্মশক্তির চরম মন্ত্র প্রচার করা হতো এই পত্রিকায়। ইংরেজ বিতাড়ন-পূর্বক স্বাধীনতা-অর্জন ছিল এর মূলীভূত আদর্শ। এজন্য সম্মুখ সমরের প্রয়োজন হ'লে তা'ও সানন্দে বরণীয়। নিম্নে উদ্ধৃত "রণনীতি" শীর্ষক কবিতাটি এস্থলে প্রণিধানযোগ্য।

*(৪২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal*-এ (No. 33 of 1907) ও *Sedition Committee Report*-এ (1918, পৃ ২২-২৩) উল্লিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষের ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য। "There is another very good means of acquiring strength of arms. Many people have observed in the Russian revolution that there are many partisans of the revolutionaries among the Czar's troops. These troops will join the revolutionists with various arms. This method succeeded well during the French Revolution. The revolutionists have additional advantages where the ruling power is a foreign power, because the latter has to recruit most of its troops from among the subject people. Much work can be done by the revolutionists very cautiously spreading the gospel of independence among these native troops. When the time arrives for a practical collision with the ruling power, the revolutionists not only get these troops among their ranks, but also the arms with which the ruling power supplied them. Besides, all the enthusiasm and courage of the ruling power can be destroyed by exciting a serious alarm in its mind." ১৯০৭ সনের ২রা নবেম্বর কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে বক্তৃতাকালে লর্ড মিণ্টো স্বীকার করেন যে, ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে তৎকালে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

রণনীতি

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণ জয়
গাথা। রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ
ডাকে ভারতমাতা ॥
কে বল করিবে প্রাণে মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালি
জয় মা ভারত জয় মা কালী ॥
সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে শত্রু বিদগ্ধ যখন
পুরপল্লী ইংরাজ চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে
প্রেয়সীর ভুজ বল্লী।
কোষ নিবদ্ধ রবে খর অসি
যখন বিলাঞ্ছিত ভারতবাসী।
(সাজ সাজ সকলে রণ ইত্যাদি)
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠ
শত্রু করে কভু হ'ব না বন্দী
ডরিনা থাকে যা'ই অদৃষ্টে
অধর্ম সঙ্গে করি না সন্ধি
রবনা রবনা ফিরিঙ্গী ভৃত্য
সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু
(সাজ সাজ সকলে ইত্যাদি)
ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে
শত্রু সৈন্যদল করিব বিভিন্ন

পুণ্য সনাতন আর্যাবর্তে
রাখিব না কভু অরাতি চিহ্ন
শত্রু রক্তে করিব স্নান
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
(সাজ সাজ সকলে ইত্যাদি) * (৪৩)।

১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি 'যুগান্তর' পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। ঐ বৎসরের ২৮শে অক্টোবর তারিখে লিখিত এক বিজ্ঞপ্তিতে অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য জনসাধারণকে জানান, "প্রথম থেকে 'যুগান্তর' পত্র একদল কর্মীর পরিচালনাধীনে ছিল। কিন্তু ঐ পরিচালকগোষ্ঠীর অনেকেই, এবং লেখকদের মধ্যেও অনেকে, ঐ পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। পরে যদি এই পত্রিকা পরিচালিত হয়, তবে তা অন্য লোকের কর্তৃত্বাধীনে হবে।...প্রায় দেড় বছর ধরে আমরা এই পত্রিকা প্রকাশ করেছি এবং বহু অসুবিধা ও ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের বাণী প্রচার করেছি। বর্তমানে ইহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কাগজ। আমাদের বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা এখনও এই পত্রিকা পরিচালনে ইচ্ছুক। বর্তমানে আমরা তাঁদেরই হাতে এই কাগজের দায়িত্ব সমর্পণ করলাম। তাঁদের সকল প্রকার সফলতা আমরা প্রার্থনা করি। এখন থেকে আমাদের পরিচালনা ও সম্পর্ক শেষ হলো" * (৪৪)।

হস্তান্তরের পরেও 'যুগান্তরে'র উজ্জ্বল আদর্শ ও নির্ভীক প্রচারকার্য পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। এ বিষয়ে 'ইংলিশম্যান' (২৪শে নবেম্বর, ১৯০৭) মন্তব্য করে, "নূতন মুদ্রাকরের অধীনে পত্রিকার কাজ সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এবং গবর্ণমেণ্ট যদি পুনঃপুনঃ এই পত্রিকা-দলনে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে, তাহলে প্রায় ষোলজন লোক পালা করে 'যুগান্তর' মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রয়েছে এরূপ শোনা যাচ্ছে" * (৪৫)।

* (৪৩) 'যুগান্তর' ১৬ই ভাদ্র, ১৩১৪ বা ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭

* (৪৪) 'বন্দে মাতরম্', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৩রা নবেম্বর, ১৯০৭

* (৪৫) "Under its new printer the paper is going-on smoothly, and it

১৯০৭ সনের নবেম্বর মাস থেকে 'যুগান্তর' প্রকাশের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন বৈকুণ্ঠ চন্দ্র আচার্য। এই সময়ে ৫নং রামধন মিত্র লেনস্থ 'সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'-এ এই পত্রিকা ছাপা হতো। অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত "বর্তমান রণনীতি" নামক একটি পুস্তক সমালোচনাকালে 'যুগান্তর' পত্র নিম্নলিখিত মন্তব্য করে: "ইহার কতকাংশ 'যুগান্তরে' এক বৎসর ধরিয়া 'যুদ্ধই সৃষ্টির নিয়ম' শীর্ষক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন তাহা চতুর্গুণ বর্ধিতাকারে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে পুস্তকখানি সত্য সত্যই এক অভিনব সামগ্রী। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদের কথা গীতার বাণী—যুদ্ধই যে সৃষ্টির অনিবার্য নিয়ম সেই তত্ত্ব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নূতন বন্দুক, কামান, বিস্ফোরক বোমা ও পোতঘ্ন বোমা প্রভৃতি নবীন ধনুর্বেদের রণাস্ত্রের কথায় পূর্ণ। বর্তমান সেনাকটক কি কি বিভাগে বিভক্ত থাকে ও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বরূপ কি, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের শেষ অর্থাৎ পঞ্চম পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভে ক্ষেত্রনীতির যত গূঢ় তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট এবং তাহার পর সমর-ক্রীয়া-কৌশলের কথা, যথা—আততায়ীর সমর-ক্রীয়া-কৌশল, প্রারম্ভিক অগ্নিক্রীড়া, আক্রমণ কাণ্ড, সংবেষ্টন, অশ্বসাদীর ক্ষেত্রনীতি, নৈশ আক্রমণ, আত্মরক্ষীর নীতি, ও অব্যবস্থিত সমরপ্রণালী ইত্যাদি" * (৪৬)। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের বলেছেন, এই পুস্তক বারীন্দ্রকুমার ঘোষের রচিত।

১৯০৭ সনের শেষভাগে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিলতর হতে থাকে। আন্দোলনের ভীষণতা লক্ষ্য করে সরকারী দমন-নীতির মাত্রাও ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। আগস্ট মাসে 'বন্দে মাতরম্' পত্রের উপর সরকারী আক্রমণ পতিত হলো। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সরকারী পক্ষের প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও অরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত হলো না।

is said that about 16 men have taken the vow of being its printer by turns, if the Government persists in prosecuting it repeatedly."

* (৪৬) 'যুগান্তর,' ১৬ই কার্তিক, ১৩১৪ বা ২রা নবেম্বর, ১৯০৭

'বন্দে মাতরম্' রাজদ্রোহ মামলার অগ্নিগর্ভ থেকে তিনি বিজয়ীর বেশে নূতন গরিমা নিয়ে দেশের সামনে আবির্ভূত হলেন। সেপ্টেম্বর মাসে 'সন্ধ্যা' পত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা সুরু হয়। পত্রিকার সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছে তাঁর কৃত কর্মের জন্য কোনোরূপ জবাবদিহি করতে অস্বীকৃত হন। অসমাপ্ত বিচারের মাঝখানে হাসপাতালে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন (অক্টোবর, ১৯০৭)। নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারত সরকারের Seditious Meetings Bill নামক দমনমূলক আইন বিধিবদ্ধ হয়। সারা ভারতের জন্য ঐ আইন বিধিবদ্ধ হলেও কার্যক্ষেত্রে একমাত্র পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার উপরই ঐ আইনের ধারা প্রযুক্ত হলো * (৪৭)। ডিসেম্বর মাসে 'যুগান্তরে'র উপর সরকারের তৃতীয় আক্রমণ বর্ষিত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর "হিন্দুবীর্য পঞ্চনদে" প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে 'যুগান্তরে'র বিরুদ্ধে পুনরায় রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হলো। মুদ্রাকর ও প্রকাশক বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য গ্রেপ্তার হলেন। ১৬ই জানুয়ারী ১৯০৮ সনে বিচারক কিংস্‌ফোর্ড তাঁর রায়ে বৈকুণ্ঠচন্দ্রের এক হাজার টাকা জরিমানা ও দুই বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন * (৪৮)। রায় প্রদান-কালে তিনি মন্তব্য করেন যে, দেশের শান্তি শৃঙ্খলার স্বার্থে 'যুগান্তরে'র মত পত্রিকাকে বহুদিন পূর্বেই সরকারের বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। ("In the interests of good Government and good order the paper ought long ago to have been suppressed".)

উক্ত প্রবন্ধে 'যুগান্তর' লেখক শিখজাতিকে তাদের বিগত পরাক্রম ও বর্তমান হীনবীর্যতার কথা স্মরণ করিয়ে তাদের আবার ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

* (৪৭) *Speeches by the Earl of Minto: 1905-1910* (Calcutta, 1911, pp. 128-133)

* (৪৮) ১৮ই জানুয়ারী, ১৯০৮ সনের 'বন্দে মাতরম্' পত্রে বা ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ সনের 'যুগান্তর' পত্রে মিঃ কিংসফোর্ডের রায় দ্রষ্টব্য।

"শিখজাতির ইতিহাস একটা প্রহেলিকার মতন ক্ষণিক আলোক লইয়া যাহাতে আমাদিগের সম্মুখে প্রতিভাত না হইয়া একটা বিরাট জাতির অতুল বীরত্বের ইতিহাসরূপে আদৃত হয় উহাই আমরা চাই।...

অধুনা লাজপত ও অজিতের নির্বাসন ও হংসরাজ প্রভৃতির প্রতি ও পঞ্জাবের রমণীর প্রতি অত্যাচার দেখিয়াও যে পঞ্জাবীর মুখে অন্ন যায়, সে পঞ্জাবী যে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কে বলিবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই শিখেরাই ইংরেজকে যেখানে সেখানে পরাজিত করিয়া শেয়াল কুকুরের ন্যায় এ বন হইতে ও বনে তাড়া করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিল? ইংরেজ-রক্তে স্বদেশের পূজা করিয়াছিল? বর্বরতার শাসন করিয়া শিখজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল।"

বৈকুণ্ঠচন্দ্রের কারাগমনের পর 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রথমে বিভূতি ভূষণ রায় ও তৎপর বাঁকিপুরের 'মাদারল্যাণ্ড' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মিত্র। পর পর কয়েকবার 'যুগান্তর' অফিসে পুলিশের হানা, খানা-তল্লাসী ও লুঠপাটের ফলে 'যুগান্তরে'র প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়। প্রেসের উপর উপর্যুপরি আক্রমণও কয়েকবার অনুষ্ঠিত হয়। "ইতিপূর্বে সাধনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ও কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ এবং সারস্বত যন্ত্রকে অনেক অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছে। এবারও সুমতি প্রেস হইতে তিন চার শত টাকার জিনিষ পুলিশ লইয়া গেল!!" পুনঃ পুনঃ এই প্রকার আক্রমণের ফলে 'যুগান্তর' ঋণভারে জর্জরিত হয়। 'যুগান্তরে'র নগদ বিক্রয় খুব কম ছিল না। তাই এতদিন অর্থাভাব সত্ত্বেও পত্রিকা-পরিচালনা কোন প্রকারে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বৈকুণ্ঠ চন্দ্রের গ্রেপ্তার উপলক্ষে এইবারের আক্রমণে 'যুগান্তরে'র অপরিসীম আর্থিক ক্ষতি হয়। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯০৮ সনে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত "যুগান্তরের আত্মকথা" শীর্ষক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, "ক্রমশই ঋণভার বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে অর্থাভাবে সকল সপ্তাহে সকল গ্রাহকের নিকট কাগজ যাইতে পারিতেছে না।" এই দারুণ আর্থিক সঙ্কটের দিনে 'যুগান্তর' জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে। এ বিষয়ে সাহায্য

"কর্মকর্তা যুগান্তর, ৭৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাতে জনসাধারণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

'যুগান্তরে'র ২৮।১ মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ অফিসে খানাতল্লাসের সময় পুলিশ কতকগুলি অব্যবহৃত রসিদ বইও নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে 'যুগান্তর' অফিসে সংবাদ আসে যে, মফঃস্বলে নাকি একদল লোক ঐ অব্যবহৃত রসিদ-বই এর সাহায্যে টাকা সংগ্রহ করছে। অথচ 'যুগান্তরে'র সাহায্যার্থ চাঁদা আদায়ের কাজে মফঃস্বলে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নি। এতদুদ্দেশ্যে 'যুগান্তরে'র কর্মাধ্যক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, "নবেম্বর মাস হইতে আমরা যে সকল সাহায্য পাইতেছি তাহা 'যুগান্তরে' প্রাপ্তি স্বীকার করা হইতেছে। তদ্ভিন্ন অপর টাকার জন্য আমরা দায়ী নহি" * (৪৯)।

১১ই এপ্রিল, ১৯০৮ সনে পুলিশ 'যুগান্তর' অফিসে হানা দেয় ও সুমতি প্রেস আক্রমণ করে। সুমতি প্রেস (অর্থাৎ যে প্রেসে তখন 'যুগান্তর' ছাপা হতো) সে সময় ৫নং রামধন মিত্র লেন থেকে ৬৮নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে উঠে এসেছিল। মুদ্রণযন্ত্র তখনও ভাল করে বসানো হয়নি। ১১ই এপ্রিল তারিখে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিস, পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, বিনোদ গুপ্ত, রামগোপাল চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন পুলিশ সুমতি প্রেসে উপস্থিত হন। "পুলিশ যুগান্তরের কর্মাসহ প্রায় ৪।৫ মণ 'টাইপ' ও 'ব্লক' প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে। গ্রাহক ও এজেণ্টের খাতা, মফঃস্বলের জন্য সমস্ত ছাপান কাগজ এবং অনেকগুলি ডাক টিকিটও লইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলে পাঠাইবার জন্য যে কাগজ প্যাক করা হইয়াছিল, তাহাও লইয়া গিয়াছে। পুলিশেরা সকলেই সঙ্গে রিভলভার লইয়া আসিয়াছিল" * (৫০)।

এই প্রকার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে 'যুগান্তরে'র আর্থিক বল ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে। মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পর (২রা মে) কলিকাতায় অরবিন্দসহ

* (৪৯) 'যুগান্তর', ১৮ই মাঘ, ১৩১৪ বা ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮

* (৫০) 'যুগান্তর', ৫ই বৈশাখ, ১৩১৫ বা ১৮ই এপ্রিল, ১৯০৮।

বিপ্লবীদলের আরও অনেকে ধৃত হলেন। ৯ই মে, ১৯০৮ সনের 'যুগান্তরে' কতক-গুলি প্রবন্ধ প্রকাশের দরুণ এই পত্রিকার উপর আবার সরকারের দৃষ্টি পতিত হয়। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে ছিল "সাধের মরণ", "মূল সত্য কি", "ষড়যন্ত্র বা স্বাধীনতার ইচ্ছা"। তা'ছাড়া ঐ সংখ্যাতেই আরও কয়েকটি প্রবন্ধও ছিল, যথা —"শত্রু দলন কর", "জাগরণ", "বিদ্রোহী কে ?", "হত্যাকারী কে ?" প্রভৃতি। গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত ২৫শে মে-র এক আদেশানুসারে ডিটেক-টিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিস ও ইনস্পেক্টার মিঃ পার্সি 'সুমতি প্রেস' খানা-তল্লাস করতে গমন করেন। সে সময় ৩০শে মে তারিখের 'যুগান্তর' মুদ্রণের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি 'টাইপ' তাঁদের হস্তগত হয় এবং ৯ই মে-র কাগজে পূর্বো-ল্লিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য 'যুগান্তরে'র মুদ্রাকর ও প্রকাশক ফণীন্দ্রনাথ মিত্রকে গ্রেপ্তার করেন। ১১ই জুন, ১৯০৮ সনে ফণীন্দ্রনাথের মামলার শুনানী-কালে মিঃ এলিস এবং বঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী সাক্ষ্য প্রদান কালে এই সকল তথ্য প্রকাশ করেছিলেন * (৫১)। সরকারের "দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের উপর গোপনীয় রিপোর্টে" (১৯০৮-এর ২৩নং সংখ্যায়) ৩০মে তারিখে 'যুগান্তর' পত্রে প্রকাশিত "বাঙ্গালীর বোমা", "কংসের কৃষ্ণভয়", "রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম" প্রভৃতি প্রবন্ধের এবং "অকাল বোধন" কবিতার ইংরেজী অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়। "অকাল বোধন"

* (৫১) 'বন্দে মাতরম্', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ১৪ই জুন ১৯০৮ সনের সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০ দ্রষ্টব্য। সরকারী *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal* (No. 20 of 1908) পুস্তক থেকে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত "সাধের মরণ" প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদের শেষাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হলো। স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে, বিশেষত আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্দেশে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। "In every national undertaking, from petty political agitation to the terrible war of independence, it is necessary to have a band of men who are ready to die without necessity. They alone will be the pioneers of the travellers of the new path. Whom have we placed in the van of the preparation for an expedition against the ruling power, which we have recently made ?...Those sons devoted to the Mother who, in going to proclaim the truth of their heart, have in a clear voice denied the existence of the King, who is a foreigner, who have gone the way to death enchained by the

কবিতাটি 'যুগান্তরের' মূল আদর্শ ও কর্মনীতি অতি পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। ঐ কবিতার লেখক ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় * (৫২)।

'যুগান্তরের' উগ্র ও বিরামহীন বিপ্লবাত্মক প্রচার কার্য ইংরেজ সরকারের মনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার করে। পুনঃ পুনঃ সরকারী আক্রমণ সত্ত্বেও 'যুগান্তরে'র প্রাণশক্তি প্রায় অব্যাহত লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার প্রচলিত আইনের অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন হয়। এরই পরিণামে ১৯০৮ সনের জুন মাসে ভারত সরকার বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ও সংবাদপত্র সম্পর্কীয় দুইটি আইন পাশ করে। সংবাদপত্র বিষয়ক আইনটির নাম হলো "Newspapers (Incitement to Offences) Act"। সংবাদপত্র বিষয়ক এই নূতন বিল বড়লাটের আইন পরিষদে উত্থাপন কালে স্যার হার্ভে অ্যাডামসন (Sir Harvey Adamson) বলেন যে, এ পর্যন্ত 'যুগান্তর' পত্রিকা সরকার কর্তৃক পাঁচবার রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হলেও ঐ পত্রিকার মূল নীতির কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে যে নবপ্রাণের প্রবাহ বয়ে চলেছে—যে নবপ্রাণের স্ফুরণ 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা—তাকে দমন করতে গেলে সরকারের কর্তব্য কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ১৯০৭ সনে 'সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ্ ভোজসভা'য় বক্তৃতাকালে অ্যাডামসন্ ইতোপূর্বেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও

shackles of a 'sedition' law, and who surrounded by the terrible walls of the prison, are wasting away their bodies in silence, those fearless heroes are our pioneers; those bands of boys, who have raised their heads against the oppressor and have surrendered themselves up to the sentence of the official's judgement, they alone are going ahead of this awakened band of pilgrims, raising a din as they move along."

* (৫২) বর্ধমানের 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবলাইচাঁদ দেবশর্মা স্বদেশী যুগে 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যার' শেষ অবস্থায় ঐ পত্রিকাদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের এক পত্রে (৫. ৮. '৫৭) উল্লিখিত কবিতার লেখকের নাম জানিয়েছিলেন। তাঁরই সৌজন্যে আমরা কবিতাটি প্রাপ্ত হই ও 'বসুমতী'র ভাদ্র, ১৩৬৪ সালের সংখ্যায় মুদ্রিত করি।

অপরিপকবুদ্ধি বলে ভৎস'না করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবের মধ্যে কোন 'ঢাক ঢাক গুড়-গুড়' ছিল না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া না পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই এবং এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য নানা উপলক্ষে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল। ১৯০৮ সনের নূতন সংবাদপত্র বিষয়ক বিল উত্থাপন কালে তিনি বিশেষ করে 'যুগান্তর' পত্রিকার কথাই উল্লেখ করলেন, কারণ 'যুগান্তর' ইতোমধ্যেই এত বেশী দুর্নাম অর্জন করেছে যে, তার বিরুদ্ধে তাঁর আর নূতন করে দুর্নাম করবার কিছু নেই। কিন্তু 'যুগান্তরে'র মত পত্রিকা আরও অনেক আছে—শুধু কলিকাতায় নয়, সারা ভারতে। সেই সব কুখ্যাত পত্রিকার নামোল্লেখ করে' তিনি আর তাদের জয়ঢাক পিট্‌তে চান নি * (৫৩)। ৮ই জুন, ১৯০৮ সনে ভারত সরকারের নূতন সংবাদপত্র বিষয়ক আইন পাশ হলো। অল্প দিনের মধ্যেই 'যুগান্তর' এর ক্ষিপ্ত কবলে পতিত হয়। 'যুগান্তরে'র ছাপাখানা পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হলো। যতদূর জানা আছে তাতে মনে হয় ১৯০৮ সনের ৬ই জুলাই 'যুগান্তরে'র সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

সরকারী নিষ্পেষণের ফলে 'যুগান্তর' পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট প্রেস ভেঙে পড়লো বটে, কিন্তু 'যুগান্তরে'র স্বরাজ-সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'যুগান্তরে'র সাধনা যে বলিষ্ঠ ঐতিহ্য রেখে গেলো

* (৫৩) "In spite of five prosecutions Yugantar still exists and is as violent as ever. The type of sedition has been incitement to subversion of British rule by deeds of violence, has been to court prosecution to create pseudo-martyrs...and it may be presumed that a further inducement was to increase the circulation of the newspaper by pandering to the tastes of the depraved. ...I have up to this point confined myself to the Yugantar because it has already obtained so great notoriety that nothing that I can say can make it more notorious. But writings of a similar type abound in other newspapers not only in Calcutta but throughout India. I will not give any of these disreputable papers an advertisement by mentioning their names." স্যার অ্যাডামসনের এই উক্তি ১৩ই জুন, ১৯০৮ সনের সাপ্তাহিক 'বন্দে মাতরম্' পত্রে দ্রষ্টব্য।

তা' মুছে ফেলবার নয়। পরাধীনতার বন্ধনে শৃঙ্খলিত জনমানসে 'যুগান্তর' যে স্বাধীনতা-স্পৃহা ও উন্মাদনা সঞ্চার করে তার যথার্থ মূল্য আজও সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নি। 'যুগান্তর' পত্রিকা বিলুপ্ত হবার পরও বাংলার বৈপ্লবিক কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেন। বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির দুই প্রধান বাহু—কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা অনুশীলন সমিতি—তখনও বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায়, এমন কি বাংলার বাইরেও, সক্রিয় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আরম্ভ হলো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলা। ইংরেজ সরকার এবার পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলো যে, কলিকাতা অনুশীলন সমিতি, 'যুগান্তর' গোষ্ঠী বা ঢাকা অনুশীলন সমিতি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান নয়, একই বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত, যদিও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব প্রণালীতে বিপ্লব সাধনায় নিমগ্ন * (৫৪)। অবশেষে ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার দমনমূলক আইন (Criminal Law Amendment Act) জারি করে কলিকাতা ও ঢাকার উভয় অনুশীলন সমিতিকেই বে-আইনী বলে ঘোষণা করলো (ডিসেম্বর, ১৯০৮)। অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য সংস্থাও—যেমন বাখরগঞ্জের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি,' ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমাজ'—বে-আইনী বলে ঘোষিত হলো। প্রচণ্ড সরকারী নিষ্পেষণের ফলে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপথ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে প্রকাশ যে, নিষ্পেষিত ও অবদমিত হলেও বাংলার বৈপ্লবিক সাধনা বিনষ্ট হয় নি। ১৯০৮ সনের পরে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকেই বিপ্লব সমিতির কর্মীরা গুপ্তভাবে তাঁদের সংগ্রাম সাধনা চালিয়ে যান এবং ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে' পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে বৃহত্তর মানসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। (এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের 1022-17 সংখ্যক ফাইলটি পঠিতব্য)।

* (৫৪) *I. B. Records, F. N. 1022–17 (pp. ii—iv)*

সপ্তম অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়

কোনো কোনো পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদের ধারণা এই যে, ১৯০৫-এর জাতীয় আন্দোলনে বাংলা তথা ভারতের মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ করে নি, বরং বিরোধিতা করেছিল। ১৯০৬ সনে 'মুসলীম লীগের' প্রতিষ্ঠা এই বিরোধিতারই এক বিশিষ্ট প্রকাশ। কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, রাজনীতির আবরণে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন যেখানে লক্ষ্য, কালী-ভবানীর আরাধনা ও শিবাজী-উৎসব যে-আন্দোলনের প্রাণ, গীতার আদর্শে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস যেখানে সুস্পষ্ট, সেই আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সহযোগিতা একরূপ অসম্ভব। আর এই কারণেই তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়ে থাকেন।

স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানেরা "যোগদান করে নি," এ ধারণা নিতান্তই অমূলক ও পক্ষপাতদুষ্ট। মুসলমানদিগের বিরোধিতা যেমন সত্যের এক দিক, তাদের সহযোগিতাও তেমনি সত্যের আর একটি দিক। আর মুসলমানদিগের বিরোধিতা যেখানে, 'কারণ' সেখানে হিন্দুর 'সাম্প্রদায়িকতা' নয়, অন্যত্র বর্তমান।

'বয়কট' আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক জন্ম-তারিখ (৭ই আগস্ট, ১৯০৫) থেকে সুরু করে' বাংলার মুসলমান জনগণ কিরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল, নিম্নলিখিত ঘটনাপঞ্জী থেকে তা' কতকটা জানা যাবে।

৭ই আগষ্ট, ১৯০৫—কার্জন-ঘোষিত বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিরোধ-কল্পে কলিকাতার টাউন হলে ও ময়দানে এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে যোগদান করেছিল।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরে কলেজ স্কোয়ার থেকে টাউন হলের দিকে ছাত্রদের যে বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়, তাতে স্কটিশ, প্রেসিডেন্সী, রিপণ, বিদ্যাসাগর, সিটি ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণের সঙ্গে কলিকাতা মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রদের অংশগ্রহণও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য * (১)। এই ছাত্রদলই প্রথম 'বন্দে মাতরম্' পতাকা হস্তে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল।

'বয়কটে'র অস্ত্র হাতে গ্রহণ করে সেদিন বাঙালী জাতি বিদেশী শাসক-জাতির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। অল্পদিনের মধ্যেই আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি সারা বাংলা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্বদেশী আন্দোলনের এই দ্রুত অভিব্যক্তিতে হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদেরও সহযোগিতা ছিল সুস্পষ্ট। মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে যাঁরা প্রথম থেকেই আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল রসুল, মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, আবদুল হালিম গজনভী, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মৌলবী দেদার বক্স, ডাক্তার আবদুল গফুর, মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন, মৌলবী আবুল হোসেন, মজিবুর রহমান প্রভৃতির নাম স্মরণীয়।

২৭শে আগষ্ট, ১৯০৫—ঢাকা সহরে জগন্নাথ কলেজের মাঠে আনন্দ চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বিরাট প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতির সহিত আবদুল হালিম গজনভীও ঢাকায় গমন করেন ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও 'বয়কটে'র সমর্থনে বক্তৃতা দেন * (২)।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—সন্ধ্যা ৬টায় রাজাবাজারে বঙ্গভঙ্গের বিরোধী জনসভায় প্রায় ছয় সহস্র লোকের সমাবেশ হয়েছিল। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বহু মুসলমান ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফ থেকে বক্তৃতা করেন জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক।

* (১) 'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ৮ই আগস্ট, ১৯০৫

* (২) 'বেঙ্গলী,' ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বয়কট-স্বদেশীর প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন * (৩)।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—১লা সেপ্টেম্বর সিমলায় বঙ্গ-বিভাগ সংক্রান্ত ভাইস্রয়ের ঘোষণা গেজেটে প্রকাশিত হ'লে কলিকাতায় টাউন হলে ২২শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ পাঁচটায় প্রবীণ বাগ্মী লালমোহন ঘোষের নেতৃত্বে এক সুবৃহৎ প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হয়। সভায় অন্যূন ১৫,০০০ লোক উপস্থিত ছিল। সেখানে বহু মুসলমানও যোগদান করে * (৪)।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—রাজাবাজারে অপরাহ্ণ ৪-৩০টায় আবদুল রসুলের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের এক সভায় তিনটি প্রস্তাব করা হয়। প্রথম প্রস্তাবে বয়কট আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন নেই এরূপ প্রচলিত গুজবের সমালোচনা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবে যথাক্রমে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের সপক্ষে মুসলমানদিগের পূর্ণ সহযোগিতা ঘোষণা করা হয় * (৫)।

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫—বাংলার দ্বিখণ্ডনে সমগ্র বঙ্গের নরনারিগণ যে শোকচিহ্ন ধারণ ও যে অ-রন্ধন ও রাখিবন্ধন ব্রত উদ্‌যাপন করেছিল, তাতেও মুসলমান জনগণের সমর্থন লক্ষণীয়। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৩-৩০টায় অখণ্ড বাংলার প্রতীক স্বরূপ প্রস্তাবিত মিলন-মন্দিরের (১৯৫৫ সালে ঐ মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে) ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ-সভায় আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আশুতোষ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাংলার বিশিষ্ট হিন্দু জননায়কগণের সঙ্গে আবদুল হালিম গজনভী, মৌলবী, আবদুল মজিদ্, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মৌলবী দেদওয়ার হোসেন, মৌলবী

* (৩) 'বেঙ্গলী', ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ এবং 'সঞ্জীবনী' ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

* (৪) 'বেঙ্গলী', ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

* (৫) 'বেঙ্গলী', ২৪শে " , ১৯০৫

তমিসুদ্দিন আহমদ্ প্রভৃতি মুসলিম নেতা উপস্থিত থেকে সভার উদ্দেশ্যে ও সঙ্কল্পে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য, ঐ দিন বহু মুসলমান শোভাযাত্রা-পূর্বক উর্দু ভাষায় শোকব্যঞ্জক গান গেয়ে ফেডারেশন হলের মাঠে যোগদান করে ও সেখান থেকে আবার শোভাযাত্রা করে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে মিলিত হয় * (৬)। পশুপতি বসুর বাড়ীর সভায় ঐদিনই "জাতীয় ভাণ্ডারে"র প্রতিষ্ঠা হয়।

এই প্রকারের প্রতিবাদ সভা যে সারা বাংলা দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে মুসলিম জনগণও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, সে বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহে খোদাই করা রয়েছে। বয়কট-স্বদেশীর ভাবধারা সমগ্র দেশে বিস্তৃত হ'লে ক্রমে তৃতীয় একটি আদর্শও সেই সঙ্গে যুক্ত হয়—তা' হলো 'জাতীয় শিক্ষা।' সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করে জাতীয় কর্তৃত্বে ও জাতীয় স্বার্থে এক নূতন শিক্ষা প্রণালী কায়েম করার সঙ্কল্প এই আদর্শে প্রকটিত। জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ও জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা এদেশে অনেকদিন থেকেই অনুভূত হয়ে আসছিল। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্লাবন সুরু হলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) 'জাতীয় শিক্ষা'র দাবীও ঘোষিত হতে থাকে ও কার্লাইল সার্কুলারের দ্বারা * (৭) ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান ও' বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই দাবী এক ব্যাপক অর্থ লাভ করে। এই জাতীয় শিক্ষার দাবীতে মুসলমানেরাও পশ্চাৎপদ ছিল না।

২৪শে অক্টোবর, ১৯০৫—ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাবের মাঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদ ও জাতীয় বিদ্যালয়ের দাবী উত্থাপন করা হয়। সভাপতি ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল

* (৬) 'বেঙ্গলী', ১৭ই অক্টোবর ও ২৫শে অক্টোবর, ১৯০৫

* (৭) 'স্টেটস্‌ম্যান,' ২২শে অক্টোবর, ১৯০৫ এর সংখ্যায় গোপনীয় কার্লাইল সার্কুলার প্রথম প্রকাশিত হয়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন : "আমরা (মুসলমানগণ) যে আজ জ্ঞান বিজ্ঞানে তেমন পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেছি না-এবং এই জন্য আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, এ কথা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এইটিও মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষা লাভ করিবার উপযোগী অর্থ আমাদের নাই। লর্ড কার্জনের 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাতেই মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষে শিক্ষা লাভ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠিত হইবার পর হইতে উহা অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বের অপেক্ষাও অল্প সংখ্যক মুসলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। · আজ আমি আমার হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সর্বধর্মাবলম্বী স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা যেন এ বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং অবিলম্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ধন ভাণ্ডার স্থাপন করেন" * (৮)।

ঐ দিনই (২৪শে অক্টোবর) কলেজ স্কোয়ারে দ্বিতীয় আর একটি সভায় প্রায় দুই সহস্র মুসলমান সম্মিলিত হ'য়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সভাপতি ছিলেন মৌলবী ওয়াজেদ হোসেন। বক্তাদের ভেতর মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, ডাক্তার আবদুল গফুর ও মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য * (৯)।

২৭শে অক্টোবর, ১৯০৫—পটলডাঙ্গা মল্লিকবাড়ীতে এক বিরাট ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভায় শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, 'কার্লাইল সার্কুলার' বা সরকারী নিষ্পেষণের ভয়ে ছাত্রগণ যেন স্বদেশসেবার মহাব্রত থেকে বিরত না হয়, এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হিন্দু ছাত্রদের পক্ষ

* (৮) "শিক্ষার আন্দোলন," কেদারনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত, (ডিসেম্বর, ১৯০৫, পৃঃ ২ ও পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য)

* (৯) 'সঞ্জীবনী', ২৬শে অক্টোবর, ১৯০৫

থেকে ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র সিংহ এবং মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষ থেকে মহম্মদ সিদ্দিক উক্ত প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন * (১০)। এর পর প্রায় প্রতিদিন কলিকাতায় ও মফঃস্বলে 'জাতীয় শিক্ষা'র দাবী জানিয়ে বহু সভার অধিবেশন হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টায় এই দাবী পরিপুষ্ট হ'য়ে ক্রমেই সফলতার পথে এগিয়ে চলে।

বাংলার মুসলমানগণ, বিশেষতঃ শিক্ষিত মুসলমানেরা, যে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক ছিল, মুসলমানদের মুখপত্র সাপ্তাহিক পাশী পত্রিকা "রোজনামা-ই-মোকাদ্দস্-হাবলুল্ মতীন"-ও একথা উল্লেখ করেছে। ৩০শে অক্টোবর, ১৯০৫ সনের উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করে, "সরকার মুসলমানদের এই আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার জন্য চেষ্টা করছে। এ মাসের ১৬ তারিখে তারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হিন্দু-বিরোধী একটি সভারও অনুষ্ঠান করেছিল, কিন্তু কলিকাতাস্থ মুসলমানদের শিক্ষিত অংশ হয় নীরবতা রক্ষা করছে অথবা হিন্দুদের সপক্ষে কাজ করছে" * (১০ক)।

'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র অন্যতম নায়ক মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন স্বদেশী ভাবের এক অতিবড় সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। ১৯০৫ সনে তিনি প্রতিদিন অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ার থেকে সম্মিলিত ছাত্রদের শোভাযাত্রা বের করতেন ও উত্তর কলিকাতার রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে' বয়কট-স্বদেশীর আদর্শ প্রচার করতেন। স্বদেশী যুগে এমন সভা খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে লিয়াকৎ হোসেন উপস্থিত হন নি বা বক্তৃতা প্রদান করেন নি। জাতীয় ভাব প্রচারের

* (১০) "শিক্ষার আন্দোলন", পৃঃ ৩ .

* (১০ক) "The Government is trying to keep the Musalmans aloof from the agitation. They had an anti-Hindu meeting at Wellington Square on the 16th instant, but the educated portion of the Calcutta Musalmans are either silent or in favour of the Hindus." Vide *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal*, No. 44 of 1905.

জন্ম তাঁকে শেষ পর্যন্ত কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হতে হয়েছিল ('বন্দে মাতরম্,' ৭ই নবেম্বর, ১৯০৭)।

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে আরও দুইজন মুসলমান কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন ডাক্তার আবদুল গফুর ও আবুল হোসেন। স্বদেশী ভাব প্রচারের কাজে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে এঁদেরকে 'হিন্দুদের ভাড়াটিয়া মুসলমান প্রচারক' বলে উল্লিখিত করে * (১১) স্বদেশী আন্দোলনে এঁদের কৃত কর্মের গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। ১৯০৬ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর 'হিতবাদী' কাগজে এক পত্র প্রকাশ করে ময়মনসিংহ জেলার শান্তিগঞ্জ নামক স্থানের জনৈক আবদুল হোসেন জানান, তিনি পরমদয়ালু ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করেছেন যে, তিনি আর কখনও বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করবেন না এবং তাঁর স্বধর্মিগণও যাতে এই পথই অনুসরণ করে সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন * (১২)।

তৎকালে আবদুল হালিম গজনভীও স্বদেশী আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তিনি বহুবাজার ও লালবাজারের সংযোগস্থলে একটি স্বদেশী শিল্পের দোকান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে জাতীয় পণ্যের সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ঐ দোকানের নাম ছিল 'ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর্স'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী যুগের বিপ্লবী দলেও কয়েকজন মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের একজন হলেন মজিবুর রহমান।

শিক্ষিত মুসলমান ছাড়া দেশের অশিক্ষিত মুসলিম জনগণের মধ্যেও যে এই আন্দোলন বিশেষ আদরণীয় হয়েছিল বরিশালের 'জারী গান' তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বদেশী আন্দোলনে দেশী দ্রব্যের সম্প্রসারণের ফলে তাঁতি ও জোলাগণ

* (১১) *I. B. Records*, West Bengal, File No. 491 of 1907, P. 14

* (১২) *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal*, No. 89 of 1903

অত্যন্ত উপকৃত হয়; আর এই তাঁতি ও জোলারা ছিল অধিকাংশই মুসলমান। আন্দোলনের পূর্বে এদের অনেকেই অন্নাভাবে নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

"দেশের তাঁতি আর দেশের জোলা,
পায় না খেতে পেটে দুবেলা,
পেটের খিদায় মাকু ছাইড়া রে তারা
ফেরোয়ার হইল" * (১৩)।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'লে এদের অনেকেই আবার নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'য়ে দ্বিগুণ অর্থোপার্জন করতে থাকে। ফলে স্বদেশী আন্দোলনে তাদের যে সহযোগিতা থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? বরিশালের 'বিকাশ' সাপ্তাহিক "জারী গানে দেশের কথা" শীর্ষক সংবাদে লেখে: "এ জেলায় 'জারী' নামক এক প্রকার গান আছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এই গান বিশেষ আদরের। আলাম, আকুব্বর ও মফেজদ্দী নামক তিনজন মুসলমান তিন দল জারীর নেতা। এই জারী গান এদেশের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানেই হইয়া থাকে এবং সকলে, বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতাগণ, অতি আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিয়া থাকেন। উক্ত তিন দলের জারীতেই এবার দেশের কথা গীত হইতেছে। পুলিশ লাইনে কালীপূজা উপলক্ষে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই জারী গান হইয়া থাকে, এ বৎসরও দুইদিন হইয়াছিল। শেষদিন রাত্রে পুলিশ লাইনে তিন দলেই বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক গান হয়। তৎপর দিন সহরস্থ স্বেচ্ছা-সেবকদিগের যত্নে স্থানীয় জমিদার বাবু বিরাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে জারী হইয়াছিল। বিশাল প্রাঙ্গণ লোকসমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিন দলেই বঙ্গ বিভাগের অপকারিতা, বিদেশী বর্জনের উপকারিতা, স্বদেশী গ্রহণের বৈধতা সম্বন্ধে অতি সুমধুর পদাবলী গীত হইয়াছিল। আলাম, আকুব্বর বা মফেজদ্দী কেহই শিক্ষিত নহে। সরল ভাষায় এই সমস্ত গায়কগণ যে গানগুলি

* (১৩) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২৮; পৃঃ ১১৮)

গাহিয়াছে তাহা শুনিয়া অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বাকরগঞ্জের গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ এক্ষণ এই সমস্ত গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে" * (১৪)।

স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে—১৯০৫-০৬ সনে—বহুসংখ্যক মুসলমান যে হিন্দুদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬—স্বদেশী আন্দোলনে লাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের সম্মানার্থে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় 'গ্র্যাণ্ড থিয়েটার' হলে যে-জনসভার অধিবেশন হয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই সম্মিলিত হ'য়ে সভার কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে। সভাপতিত্ব করেন নরেন্দ্রনাথ সেন। সুরেন্দ্রনাথ লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণকে 'বন্দে মাতরম্' লকেট, রুমাল ও মাল্যে ভূষিত করেন। সভায় ডাক্তার আবদুল গফুর ওজস্বিনী ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। উক্ত সভায় প্রায় ৩,০০০ হিন্দু-মুসলমানের সমাবেশ হয়েছিল * (১৫)।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬—এর পর মুসলমানদের উদ্যোগে কলিকাতার অ্যাল্‌বার্ট হলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন। উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে মুন্সী দেদার বক্স ও ডাক্তার আবদুল গফুর বক্তৃতা করেন। একই উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ তারিখে সাউথ সুবারবন স্কুলে তৃতীয় সভার অনুষ্ঠান হয়। বক্তাগণের মধ্যে মুন্সী দেদার বক্স, মৌলবী আবুল হোসেন, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ্ ও গীষ্পতি রায়চৌধুরী ছিলেন প্রধান * (১৬)।

* (১৪) "বিকাশ", ১৯শে কার্তিক, ১৩১২ বা ৫ই নবেম্বর, ১৯০৫

* (১৫) "লাঞ্ছিতের সম্মান" (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা, ১৯০৬, পৃঃ ৭—৩৪)

* (১৬) "লাঞ্ছিতের সম্মান", পৃঃ ৩৪-৩৭

১১ই মার্চ, ১৯০৬—'বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স' অ্যাসোসিয়েশনে', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে বিরানব্বুই জন সদস্যের মধ্যে ছয়জন মুসলমান সদস্যও মনোনীত হন, যথা—বগুড়ার নবাব শোভান চৌধুরী, আবদুল রসুল, ডাঃ আয়াতুল্লা, সেখ মহাবুব আলি, মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর ও ব্যারিষ্টার ইব্রাহিম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলিকাতায় 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা দিবসে টাউন হলের সভাতেও (১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬) বহু মুসলমান ভদ্রমহোদয় উপস্থিত থেকে জাতীয় শিক্ষায় তাঁদের ঐকান্তিকতা ও আস্থা প্রদর্শন করেছিলেন। উক্ত সভায় মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে গঙ্গা-যমুনার মত হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থও পারস্পরিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত * (১৭)।

১৪ই মার্চ, ১৯০৬ সনে বরিশাল থেকে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, রাজা-বাহাদুরের হাবেলীতে (বা ভূকৈলাসের রাজবাটীতে বা বর্তমানের অশ্বিনীকুমার মেমোরিয়্যাল হলে) হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট সম্মেলনে ঝালকাঠি লবণ মামলায় অভিযুক্ত মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। হিন্দুগণ ১০০৲ টাকা জরিমানা দিয়ে ঐ অভিযুক্ত মুসলমানদের খালাস করে আনেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ ঘোষাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার অন্যতম প্রধান বক্তা অশ্বিনীকুমার দত্ত মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন তাঁর দলের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক বিলাতী বর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন * (১৮)।

১৯০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়,—যে সম্মেলনের ইতিহাসের সঙ্গে পূর্ব বাংলায় ফুলারী অত্যাচারের কাহিনী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত,—সেই প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব

(১৭) 'জাতীয়শিক্ষা পরিষদের ক্যালেণ্ডার'; পরিশিষ্ট ক, পৃঃ ২৪ এবং পরিশিষ্ট খ, পৃঃ ১৫

* (১৮) 'অমৃত বাজার পত্রিকা', ১৫ই মার্চ, ১৯০৬

করেছিলেন ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল। মিঃ রসুল সভাপতির ভাষণে স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ করে বলেন, "কোনো কোনো মুসলমান নেতা দলস্থ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করছেন যে, ইহা একটি হিন্দু আন্দোলন ও সেই কারণে 'ডিসলয়্যাল্'। আমি বলি, নেতাদের বাক্য অভ্রান্ত সত্য ব'লে মেনে না নিয়ে যদি তারা নিজেদের মনে একটু চিন্তা করে দেখে তাহলেই বুঝতে পারবে যে, হিন্দুগণ অপেক্ষা এই আন্দোলনে মুসলমানদের উপকার হচ্ছে বেশী। কোনো মুসলমান একথা কি অস্বীকার করতে পারবে যে, স্বদেশী আন্দোলনে দেশের বয়ন-শিল্পের যে উন্নতি হয়েছে, তাতে মুসলমান তাঁতিগণ উপকৃত হচ্ছে না? একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে যে কলিকাতার বহু দরিদ্র মুসলমান পরিবার, যারা এতদিন অনাহারে মারা পড়ছিল, তারা এক্ষণে বিড়ি শিল্পের উন্নয়নে ভালভাবে জীবিকা উপায় করছে না?" ইংরেজের ভেদনীতি ও ঢাকার নবাব সালিমুল্লার হিন্দু-বিদ্বেষের প্রতি দৃষ্টি রেখেই মিঃ রসুল এই প্রকার মন্তব্য করেন এবং মুসলমান ভাইদের স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বদেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গের জন্য আকুল আহ্বান জানান * (১৯)। সরকার কর্তৃক বলপূর্বক বরিশাল কনফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়া হ'লে নেতৃবর্গ একে একে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮ই এপ্রিল ভোরে বরিশাল কনফারেন্সে লাঞ্ছিত নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কলেজ স্কোয়ারে যে সুবিশাল জনসভা হয় সেখানে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন ও মজিবুর রহমান মুসলমানগণের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন * (২০)।

আর একটি বিশেষ ঘটনাও এই স্থলে উল্লেখযোগ্য। ২০শে মে, ১৯০৬ সনে বরিশালে হিন্দু-মুসলিম জনতার যে বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়, তাতে জনগণের 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনিতে সমস্ত সহর মুখর হয়ে উঠেছিল। এই শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন বরিশালের সুবিখ্যাত নেতা

* (১৯) প্রিয়নাথ গুহের 'যজ্ঞভঙ্গ' (কলিকাতা, ১৯০৭, পরিশিষ্ট ২, পৃঃ৩৮-৪০)

* (২০) "লাঞ্ছিতের সম্মান", পৃঃ ৮৬

অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং সেই সঙ্গে ব্যারিষ্টার মোতাহার হোসেন ও চরমুগুের জমিদার চৌধুরী ইসমাইল খাঁ ও মহম্মদ আক্রফ * (২১)।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দুগণ শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করে মুসলমানদের মনে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, এই প্রকার প্রচলিত ধারণাও বাস্তবতা-বর্জিত ও ভিত্তিহীন। বাংলা দেশে শিবাজী উৎসব আরম্ভ হয় ১৯০২ সনে। এর পর থেকে ১৯০৬ সন পর্যন্ত প্রতি বছরই কলিকাতা ও মফঃস্বলে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হতো এবং ঐ অনুষ্ঠানে মুসলমানদের সহ-যোগিতাও ছিল যথেষ্ট। ৫ই জুন, ১৯০৬ তারিখে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় পান্তীর মাঠে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। মহারাষ্ট্রের তিলক, খপর্দে ও ডাঃ মুঞ্জে ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত উৎসবে হিন্দু জনগণের সঙ্গে বহু মুসলমানও যোগদান করে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে ('বেঙ্গলী', ৭ই জুন, ১৯০৬)।

পূর্বোল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকে এটুকু অন্তত বুঝা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনের অভিব্যক্তিতে মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল এক মস্তবড় আত্মিক শক্তি। কিন্তু তাদের সহযোগিতার সঙ্গে তাদের বিরোধিতাও ক্রমে ক্রমে কম লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। সে-ইতিহাসও প্রাক্-স্বদেশী যুগে প্রসারিত।

ভারতের মুসলমান নবজাগরণের ইতিহাসে স্যার সৈয়দ আহমদের নাম বিশেষ স্মরণীয়। এদেশে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হ'লে ভারতীয় মুসলমানগণ প্রথমে নবশাসকের প্রতি যে-বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেছিল—যে-বিদ্বেষের প্রকাশ

* (২১) ২৩শে মে, ১৯০৬ তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রে এই মর্মে লিখিত হয় যে, "An unprecedented *Bande Mataram* procession of Hindus and Mussalmans, numbering over ten thousand men, came out of Babu Deno Bandhu Sen's house at noon yesterday. It passed through all the principal streets of the town, singing national songs and crying *Bande Mataram* and *Alla-ho-Akbar*. Hindus shouted *Alla-ho-Akbar* with their Mussalman brethren, and Mussalmans shouted *Bande Mataram* with their Hindu brethren."

খণ্ড-খণ্ড বিক্ষোভে, সিপাহী বিদ্রোহে ও ওয়াহাবী আন্দোলনের মধ্যে দেখতে পাই—তার পরিসমাপ্তি ঘটালেন মুসলিম রেণেসাঁসের অগ্রদূত সৈয়দ আহমদ। তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞান ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি বলে তিনি বুঝেছিলেন, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অধঃপতিত মুসলমান জাতিকে উন্নত করতে হ'লে চাই একদিকে তাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় এবং অন্যদিকে চাই মহম্মদ প্রচারিত পবিত্র সরল ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও দরদ। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে ইংরেজের সহায়তা প্রয়োজন—এই সত্য আবিষ্কার করলেন স্যার সৈয়দ। উনবিংশ শতকের শেষপাদে ভারতে জাতীয়তাবাদের যে স্ফুরণ ও বিকাশ হয়েছিল, তারই অন্যতম বাস্তব রূপ হলো ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুগণই সে সময় ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে পুরোভাগে দণ্ডায়মান। প্রধানত হিন্দু পরিচালিত ইংরেজ-বিরোধী ভারতের রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হ'লে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ সঞ্চারের কার্যকারিতা বৃটিশ শাসকেরা সেদিন গভীর ভাবেই উপলব্ধি করলেন। তাই সেদিন সৈয়দ-ঈপ্সিত মুসলিম জাগরণের পথে তাঁর পক্ষে ইংরেজের সাহায্যলাভে বিন্দুমাত্রও বাধা আসেনি। স্যার সৈয়দের সময় থেকেই ভারতে মুসলমান জাতির ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয় এবং সেই নবযুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইংরেজ-মুসলিম সহযোগিতা। তখনও দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেনি।

এই নব নীতির প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে ইংরেজী ও ঐস্লামিক শিক্ষা প্রসারের জন্য আলিগড়ে স্থাপন করলেন "অ্যাংলো-ওরিয়েণ্ট্যাল্ কলেজ" (১৮৭৯)। আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের পুনর্জাগরণ সাধিত হতে থাকে। শীঘ্রই আলিগড় সহর মুসলিম রাজনীতির এক প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হলো। ইংরেজ সহযোগিতায় বিশ্বাসী হলেও তখনও সৈয়দ আহমদ হিন্দু-মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র জাতি (nation) বলে মনে করতে পারেন নি। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শব্দকে তখনও তিনি ধর্মসম্প্রদায়সূচক শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করতেন—কোনো জাতিগত অর্থে নয়। তাঁর তৎকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় এক-

জাতিত্বের ঠাঁই খুব উঁচু ছিল। যারা একই দেশের অধিবাসী, একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একই রাষ্ট্রাধীনে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা এক জাতি ভিন্ন দুই নয়। ১৮৮৪সনের ২৭শে জানুয়ারী পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে সৈয়দ আহমদ এক বক্তৃতায় বলেন, "... the word nation is applied to the inhabitants of one country, though they differ in some peculiarities which are characteristic of their own...Remember that the words Hindu and Mahomedan are only meant for religious distinction. Otherwise all persons, whether Hindu or Mahomedan, even the Christians who reside in this country, are all in this particular respect, belonging to one and the same nation." এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪ সনে) তিনি লাহোরে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাতে হিন্দু-মুসলমান ও ভারতীয় জাতিতত্ত্ব প্রসঙ্গ আলোচনা কালে মন্তব্য করেন, "In the word *Nation* I include both Hindus and Mahomedans, because that is the only meaning which I can attach to it...With me it is not so much worth considering what is their religious faith, because we do not see anything of it. What we see is that we inhabit the same land, are subject to the rule of the same Government, the fountains of benefits for all are the same, and the pangs of famine also we sufler equally. These are the different grounds upon which, I call both those races which inhabit India by one word, *i.e.*, *Hindu*, meaning to say that they are the inhabitants of Hindusthan." * (২২)। অর্থাৎ আমি যখন 'ভারতীয় জাতি' এই পরিভাষা প্রয়োগ

* (২২) *The Dawn and Dawn Society's Magazine*, **January, 1910, Part II, p.2**
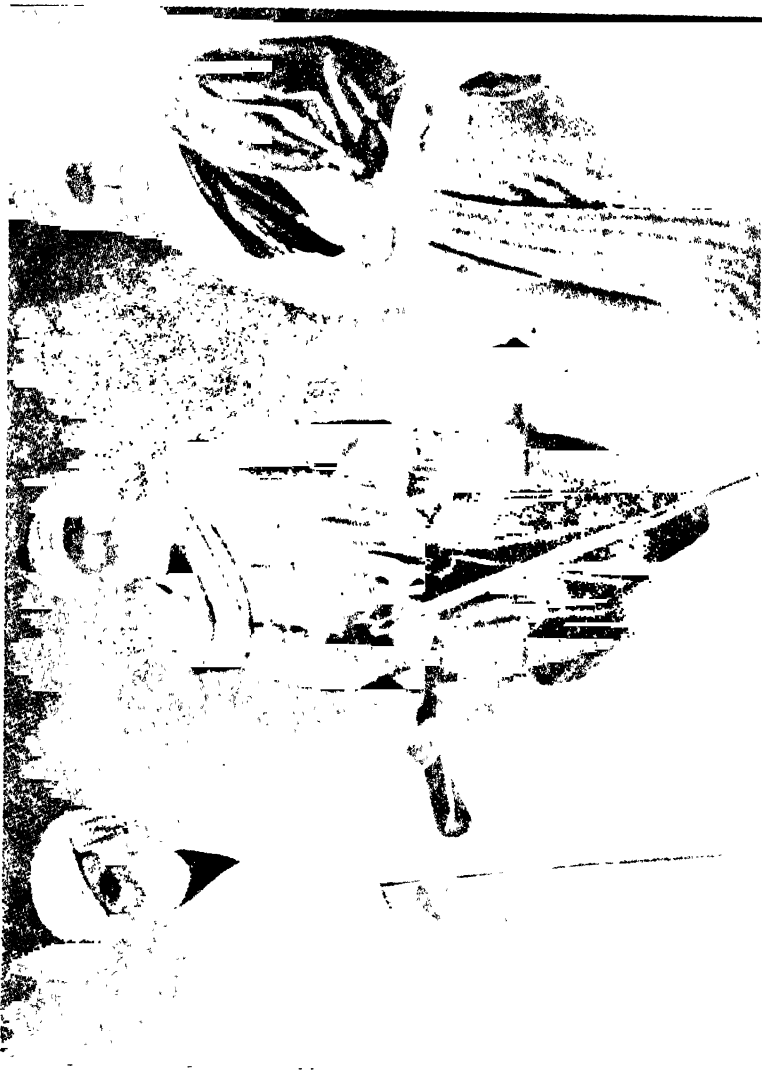
করি তখন তার দ্বারা আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই বুঝে থাকি, আর সেটাই ঐ পরিভাষার একমাত্র অর্থ যা আমি বুঝি।...তাদের ধর্মবিশ্বাস কি তা নিয়ে আমি বেশী মাথা ঘামাই না···আমি যা দেখতে পা'চ্ছি তা হলো আমরা সকলেই এক দেশের অধিবাসী, আমরা একই গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন, এর ভাল-মন্দ সব কিছুতেই আমরা সমান অংশীদার। এই সমস্ত নানা কারণেই আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই একটি বিশেষণে চিহ্নিত করতে পারি—তা হলো 'হিন্দু' অর্থাৎ তারা সকলেই হিন্দুস্থানের অধিবাসী।" অতএব দেখা গেলো যে হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিসাবে সৈয়দ আহমদ্ ১৮৮৪ সনেও মুসলমানকে "হিন্দু" নাম দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। কিন্তু সৈয়দ আহমদের রাষ্ট্রনীতি ইংরেজ প্রভাবাধীনে ক্রমশই পরিবর্তিত হতে থাকে * (২৩)।

১৮৮৫ সনে যখন কংগ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বৃটিশ ভারতের শাসকবৃন্দ এর সহায় ছিলেন। কিন্তু ১৮৮৬ সনে দ্বিতীয় অধিবেশন কালে রাজনীতিক সংস্থা হিসাবে কংগ্রেসের ঘটে রূপান্তর। ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় মুখর কংগ্রেস অচিরেই সরকারের বিরাগভাজন হলো, সেই সঙ্গে সৈয়দ আহমদেরও। ১৮৮৯ সনে এলাহাবাদে চতুর্থ কংগ্রেস অধিবেশন কালে একদিকে স্যার অকল্যাণ্ড কলভিনকে অন্যদিকে স্যার সৈয়দ আহমদকে কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার কার্যে মোতায়েন দেখতে পাই। জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক অর্থে "হিন্দু" নামে বিশেষিত করার চেষ্টা ১৮৮৬ সন থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে * (২৪)। ১৮৮৯ সনে ঐ মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। কংগ্রেস যতই রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় অগ্রসর হতে থাকে ততই কংগ্রেস আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সরকারী কর্মব্যস্ততা বেশী বেশী দেখা দেয়। ইংরেজ-সহযোগিতায় বিশ্বাসী আহমদ খানের রাজনৈতিক

*(২৩) James Samuelson's *India Past and Present* (London 1890, pp. 319-20) as well as *India's Fight for Freedom* by the present writers (Calcutta, 1958, pp. 210—11).

* (২৪) *Report of the Second Indian National Congress*, pp.1—10 দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রথম দিকে না থাকলেও ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হয়। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মিতালি অক্ষুণ্ণ রাখার বাস্তব প্রয়োজনবোধই তাঁর এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দায়ী। কিন্তু সর্বদাই তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের পুনর্জাগরণ ও তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন।

সৈয়দের মৃত্যুর পর (১৮৯৮) ভারতে মুসলিম নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে মেহ্দী আলি নবাব মহসীন-উল-মুলক্ এর উপর। তিনি আলিগড়-রাজনীতির এক বড় পাণ্ডা ছিলেন এবং সৈয়দ প্রবর্তিত নীতির পরিপোষক ও পরিবর্ধক হলেন। আলিগড়ের নেতৃবর্গ অচিরে ভারতীয় মুসলমানগণের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। এই বিষয়ে আলিগড় কলেজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁরা প্রেরণা ও পরামর্শ পেতে থাকেন * (২৫)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলিম নেতা ঢাকার নবাব সালিমুল্লা ছিলেন আলিগড়-রাজনীতির মূর্ত প্রতীক। হিন্দু-বান্ধব আবদুল গণির পৌত্র সালিমুল্লা প্রথমে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন * (২৬)। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মতের পরিবর্তন হতে দেখা যায়। এই মত পরিবর্তনের পশ্চাতে তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বঙ্গ বিভাগ সংক্রান্ত রিজ্‌লী প্রস্তাব (৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩) প্রকাশিত হলে পূর্ববঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ আন্দোলন সুরু হয়। প্রায় পাঁচ শত সভা করে পূর্ববঙ্গবাসিগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই সময় সালিমুল্লার ইউরোপীয় ম্যানেজার মিঃ গার্থ বৃটিশের মুখ-পাত্ররূপে কাজ করতেন এবং তিনি পূর্ব বাংলায় এক নূতন প্রদেশ গঠনের সপক্ষে সালিমুল্লাকে প্রভাবিত করতে থাকেন * (২৭)।

* (২৫) লাল বাহাদুর প্রণীত *The Muslim League* (এলাহাবাদ, ১৯৪৫, পৃঃ ৩৩-৩৫)

* (২৬) হেনরী নেভিনসনের *The New Spirit in India* (লণ্ডন, ১৯০৮, পৃ: ১৯১) এবং *I. B. Records*, West Bengal. L. No. 47 p. 1

* (২৭) অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬—প্রধান সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়ত, প্রতিবাদ আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করে লর্ড কার্জন যখন পূর্ববঙ্গ সফরে বহির্গত হন (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪), তখন তিনি ঢাকা সহরে বক্তৃতাকালে (১৮ই ফেব্রুয়ারী) পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সম্মুখে নানারূপ প্রলোভন প্রদর্শন করেন এবং তাদের বলেন,

"When then a proposal is put forward which would make Dacca the centre and possibly the capital of a new and self-sufficing administration which must give to the people of these districts by reason of their numerical strength and their superior culture the preponderating voice in the province so created, which would invest the Mahomedans in Eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and Kings" * (২৮).

কার্জনের এই বক্তৃতা নবাব সালিমুল্লার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

তৃতীয়ত উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে ঢাকার নবাব দারুণ ঋণভারে জর্জরিত হলে বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার সালিমুল্লাকে প্রায় ১০০,০০০ পাউণ্ড ন্যূনতম সুদের হারে ধার দিয়েছিল। নেভিন্‌সনের মতে,

"This benevolent action, combined with certain privileges granted to Mohammedans, was supposed by many Hindus to have encouraged the Nawab and his co-religionists in taking a still more favourable view of the Partition itself" * (২৯).

* (২৮) *All About Partition* edited by P. Mukherjee (কলিকাতা, ১৯০৬ — ঢাকা সহরে কার্জনের বক্তৃতা., পৃঃ ৭৩-৮২ দ্রষ্টব্য)

* (২৯) *The New Spirit in India, p. 192*

১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হলো। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নবগঠিত প্রদেশের কর্ণধার হলেন আসামের ভূতপূর্ব চীফ কমিশনার স্যার ব্যাম্পফাইল্ড ফুলার। কার্জনী-নীতির উত্তরসাধক ফুলার সাহেব প্রথম থেকেই পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদিগের মনে হিন্দু-বিদ্বেষ সঞ্চারে সচেষ্ট হন। পূর্ববঙ্গে এতদিন বাঙালী হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে-প্রাধান্য ভোগ করছিল, বঙ্গভঙ্গের ফলে সেই প্রাধান্যের উত্তরাধিকারী হলো উক্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ—এরূপ ধারণা পূর্ববাংলার মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রচারিত হতে থাকে। হিন্দুর স্বার্থানুকূল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানগণের যোগদান অনুচিত, স্বদেশী আন্দোলনের এ প্রকার অপব্যাখ্যাও চলতে থাকে পূর্ববাংলার সরকারী ও বেসরকারী মহলে। বাংলার এই জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকবৃন্দ ও তাঁদের স্থানীয় প্রতিনিধিগণ যে কিরূপ ভেদনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা তৎকালীন বহু ইংরেজ লেখকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেনরী নেভিন্‌সন ১৯০৮ সনেই লিখেছিলেন :

"...priestly mullahs went through the country preaching the revival of Islam, and proclaiming to the villagers that the British Government was on the Mohammedan side, that the Law Courts had been specially suspended for three months, and no penalty would be exacted for violence done to Hindus, or for the loot of Hindu shops, or the abduction of Hindu widows...Sir Bampfylde Fuller said in jest that of his two wives (meaning the Moslem and Hindu sections of his province) the Mohammedan was the favourite. The jest was taken in earnest, and the Mussulmans genuinely

believed that the British authorities were ready to forgive them all excesses" * (৩০).

নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে ফুলার-গভর্ণমেণ্ট প্রথম থেকেই হিন্দু-বিরোধী মুসলিম তোষণ-নীতি প্রকাশ্যভাবেই অবলম্বন করেন। পয়সা-পদ-পদবীর রকমারি প্রলোভনের প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে পূর্ববাংলার দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ও রাজনৈতিক চেতনায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়কে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ও প্রচারক করে গড়ে তোলাই ছিল এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯০৬-এর ২৫শে মে তারিখে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' সরকারের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ পি. সি. লায়ন্ (P. C. Lyon) জনৈক বিভাগীয় কমিশনারের উদ্দেশে যে সার্কুলার জারী করেন, তা'তে উক্ত বিভাগের বিভিন্ন সরকারী পদে মুসলমান নিয়োগের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল * (৩১)। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেলো, সরকারী চাকুরীর জন্য ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান প্রার্থীর শোচনীয় সংখ্যাল্পতা। ১৯০৭ সনের ২রা অক্টোবর তারিখে ঢাকার কমিশনার নবাব সালিমুল্লার নিকট এক পত্রে মন্তব্য করেন যে, পূর্ববঙ্গ ও আসামের অ্যাকাউনটেণ্ট্ জেনার‍্যালের অফিসে মুসলমানদের চাকুরীতে নিয়োগের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও মুসলমান প্রার্থী একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না—সাতজন মুসলমানকে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছয়জনই পদত্যাগ করে চলে গেছে ("6 out of 7 men appointed having left")। তিনি আরও বলেন যে, প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বা বহুলপ্রচারিত সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারাও এফ্-এ পাশ আবেদনকারীর মধ্যে একজনও মুসলমান প্রার্থী পাওয়া গেলো না ["It is added that neither at the open competitive examination held by him, nor in response to his invitation for applications from persons who passed the F. A. Examination (both of which were widely

* (৩০) *The New Spirit in India* (London, 1908, p. 192)

* (৩১) 'বেঙ্গলী,' ১৩ই জুন, ১৯০৬

advertised) has a single Mahomedan offered himself as a candidate"]। পরিশেষে ঢাকার কমিশনার মন্তব্য করেন যে, শুধু অ্যাকাউনটেন্ট্-জেনারল্যালের অফিসে নয়, শিলংস্থিত অন্যান্য অফিসেও অনুরূপ অসুবিধা দেখা দিয়েছে * (৩১ ক)।

এতদুপলক্ষে ঢাকার নবাব সালিমুল্লা কমিশনারকে যে পত্র লেখেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নবাব লেখেন যে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলমান-দের মধ্যে যে মূল চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে "মুসলমান নিয়োগের" ('employment of Mahomedans') কথা ছিল, "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-সম্পন্ন মুসলমানের" ('Mahomedans with necessary qualifications') কথা ছিল না। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, মূল চুক্তির সর্ত গভর্ণমেণ্ট ভঙ্গ করেছে বলেই সরকারী চাকুরীর জন্য মুসলমান প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। এখনও যদি সরকার মূল চুক্তির সর্ত পালনে প্রস্তুত থাকে তা' হলে দেখা যাবে মুসলমান চাকুরী-প্রার্থীর অভাব নেই—তাদের হাজারে হাজারে, দশ হাজারে দশ হাজারে পাওয়া যাবে এটা সুনিশ্চিত। মুসলমানদের নিয়োগের বেলায় সরকারকে দুটি জিনিষ দেখতে হবে—প্রথমত তারা পবিত্র 'কলিমা' আবৃত্তি করে কিনা এবং দ্বিতীয়ত, তাদের হিন্দু-বিদ্বেষী মনোভাব আছে কিনা * (৩১খ)।

* (৩১ ক) *Amrita Bazar Patrika*, April 2, 1908

*(৩১ খ) "Here I may point out, that, under the circumstances, it is you who are making the performance of the contract on your part impossible. Even now, if you may be ready and disposed to stick to the said terms, and to employ Mahomedans, whether literate or illiterate, fit or unfit, proficient or otherwise, their one qualification being the recital of the holy 'Kalima' and thier other qualification being the anti-Hindu feeling, I can guarantee any number of candidates to thousands and tens of thousands, within as little a period of time as you may choose to fix......" ঢাকার কমিশনারকে লিখিত নবাব সালিমুল্লার এই পত্রখানি ২রা এপ্রিল ১৯০৮ সনের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় দ্রষ্টব্য।

তৎকালীন মুসলিম পত্রিকাতেও সরকারী নীতি সম্পর্কীয় এই ধরনের বহু তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু-বিদ্বেষ বশে ইংরেজ সরকারের মুসলমান তোষণ-নীতির ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে ময়মনসিংহের 'চারু-মিহির' পত্রিকা ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেষণ করে—

"পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারই এই প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষভাব সঞ্চারের জন্য দায়ী। উক্ত সরকারের খোলাখুলি মুসলিম-প্রীতি ও হিন্দু-বিদ্বেষ নীতির পরিণামে মুসলমানদের ধারণা হয়েছে যে, তারা হিন্দুদের শত্রু বলে জ্ঞান করলে অন্যায় কিছু হবে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক বিরোধ দেখা দেবে এবং ময়মনসিংহ জেলার পরিস্থিতি ইতোমধ্যেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অবশ্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মুসলমান জানে যে কর্তৃপক্ষের এই মুসলিম প্রীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো হিন্দু প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তাদের খাড়া করে স্বদেশী আন্দোলনকে দমন করা। কিন্তু এদেশের মুসলমান জনসমষ্টির অধিকাংশই হলো অশিক্ষিত ও নিরক্ষর, এবং এই সমস্ত অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে সরকার বুঝি সত্যসত্যই হিন্দুদের অপেক্ষা তাদের বেশী সুনজরে দেখে এবং তাদের শিক্ষা না থাকলেও তাদের চাকুরীতে নিযুক্ত করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু মুসলমান ছাত্র তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে সরকারী বা অন্য কোনো চাকুরী-প্রার্থী হয়েছে।... মফঃস্বলের অনেক জায়গাতে এর মধ্যেই হিন্দু অধিবাসীদের মনে একটা অনিশ্চয়তার উদ্বেগ দেখা দিয়েছে এবং তারা আশঙ্কা করে যে এরপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো মামলায় তারা আর আদালতে সুবিচার পাবে না। আমরা এই বিষয়ে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি" * (৩২)।

* (৩২) "It is the Goverument of Eastern Bengal and Assam which is responsible for the growth of ill-feeling between Hindus and Musalmans within its jurisdiction. Its open avowal of a liking for Musalmans and of aversion for Hindus has led the former to think that they are justified in considering the latter as their enemies.........Their is already a feeling of

"চারু মিহির" পত্র সরকারী অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে এই মর্মে ১৯০৬ সনেই বহুবার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে।

স্যার ব্যাম্পফাইল্ড ফুলারের অনুসৃত নীতির ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা দেয় এবং স্বদেশী আন্দোলন সেখানে এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছোটলাটের পদ থেকেও বিদায় নিতে হলো। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র প্রতিঘাতে ফুলারের পতন জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিজয় নির্দেশক কীর্তিস্তম্ভ।

স্যার ফুলারের পদত্যাগের (৩রা আগষ্ট, ১৯০৬) অব্যবহিত পূর্বে নবগঠিত প্রদেশে কতকগুলি 'হ্যাণ্ডবিল' প্রচারিত হয়। ঐ 'হ্যাণ্ডবিলে' স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সারা প্রদেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য মুসলমানদের নিকট আহ্বান জানানো হয় এই বলে যে, স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু স্বার্থের পরিপোষক অর্থাৎ (সেই বিশেষ অবস্থায়) মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী। বিনা স্বাক্ষরিত ঐ 'হ্যাণ্ডবিল' শিলং থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল * (৩৩)।

৬ই নবেম্বর, ১৯০৬ সনের 'চারু-মিহির' পত্রিকা পুনরায় লেখে যে, স্যার ব্যাম্পফাইল্ড্ ফুলার এদেশ পরিত্যাগ করেছেন বটে কিন্তু নূতন বঙ্গের শাসন-পদ্ধতিতে এখনও কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না, বরং ফুলারের অনুসৃত সাম্প্রদায়িক কূটনীতি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এই ভেদনীতি সমাজদেহের প্রতি অঙ্গে বিষ সঞ্চারিত করছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান নূতন প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানদের অসদ্ভাবের জন্য সরকারী কর্মচারীরাই দায়ী। এক দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্তে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ব্যর্থ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট অশিক্ষিত ও স্থূলমস্তিষ্ক ঢাকার

insecurity in the minds of the Hindu inhabitants of many places in the mufassal, and they fear that henceforth they will not get justice in law courts against Musalmans......"—'চারু-মিহিরে'র এই মন্তব্য ১৩ই মার্চ, ১৯০৬ সনে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal*, No. 12, of 1906 দ্রষ্টব্য।

* (৩৩) 'বেঙ্গলী', ৭ই জুলাই, ১৯০৬,—দ্বিতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নবাবের ("uneducated and thick-headed Nawab of Dacca") সাহায্য গ্রহণ করেছিল। সরকারের এই কাজের ফলে ঐ নূতন প্রদেশে গুজব রটে গেলো যে কর্তৃপক্ষ নূতন প্রদেশের শাসনভার নবাব সালিমুল্লার হাতে সঁপে দিয়েছেন। এতে কোনো কোনো মুসলমানের মাথা বিগড়ে গেলো ও তারা পত্রিকা মারফৎ বিষোদ্গীরণ করতে লাগলো। দু' একটি ক্ষেত্রে আবার দুর্বল ও দূরদৃষ্টিহীন রাজকর্মচারীদের ত্রুটির ফলে গুরুতর ক্ষতিও সাধিত হলো। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান অসম্প্রীতির জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই * (৩৪)।

'ফুলার-সালিমুল্লা নীতি'র বিষয়ে মুসলমানদিগকে সতর্ক করেই আবদুল রসুল বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে একজন নেতা বঙ্গভঙ্গের সুফলের কথা সজোরে ঘোষণা করেন। সুফল যদি কিছু ফলে থাকে তা সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে হয়নি, হয়েছে তাঁর নিজের। বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের পুরস্কারস্বরূপ স্যার ব্যাম্পফাইল্ড্ তাঁর অনুচরবৃন্দকে কয়েকটি সাব-ইন্স্পেক্টরের পদ দিয়েছেন ও অন্যান্য পদে তাদের নিয়োগেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হিন্দু সম্প্রদায় থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখাই হলো এর আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসলমানেরা ভুলে যাচ্ছে যে, যে-আত্মশক্তি ও আত্ম-নির্ভরতা ব্যতিরেকে তাদের অবস্থার উন্নয়ন অসম্ভব, এই নীতি তারই মূলে কুঠারাঘাত করছে *(৩৫)।

মুসলমানদের মুখপত্র 'সোলতান' (Soltan) কাগজেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল। 'সোলতান' ছিল একটি বাংলা সাপ্তাহিক ও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। ২৮শে জুন, ১৯০৭ সনের সংখ্যায় উক্ত পত্রে "ভারতের ভবিষ্যৎ ও মুসলমানের কর্তব্য" শীর্ষক এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে 'সোলতান' পত্রিকা মন্তব্য করে যে, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটলে

* (৩৪) *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal*, No. 46 of 1906

* (৩৫) প্রিয়নাথ গুহের "বজ্ঞভঙ্গ", পরিশিষ্ট ২, পৃষ্ঠা ৩৮-৪০

যদি হিন্দুরা নিজহস্তে ক্ষমতা দখল করে নিজেদের ইচ্ছামত শাসনযন্ত্র পরিচালিত করে তবে শুধু ভারতের মুসলমানগণ নয়, পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও আফগানিস্থানের মুসলমানেরাও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং তাদের আবার দাসত্ববন্ধনে বেঁধে ফেলবে। বস্তুত ভারতের ভবিষ্য শাসনব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থই নিরাপদ থাকে। তা'ছাড়া, ভারতবর্ষে হিন্দুগণ মুসলমানদের অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদে সর্ব বিষয়েই অনেক বেশী অগ্রসরশীল। কাজেই হিন্দুদের উন্নতি রোধের চেষ্টা করা মুসলমানদের পক্ষে নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে এরকম প্রচেষ্টা মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থেরও প্রতিকূল। এটা সুনিশ্চিত যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতের শাসনব্যবস্থার ঘটবে পরিবর্তন। তাই আসন্ন সংগ্রামে মুসলমানেরা কোন্ পথ অবলম্বন করবে তা তাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুদের অথবা ইংরেজ সরকারের শত্রুতা করা তাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। আমাদের অভিমত এই যে, আমরা কোনো পক্ষের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হবো না। হিন্দুদের যে সমস্ত কাজকর্ম আমাদের জাতীয় স্বার্থকে পরিপুষ্ট করে—যেমন স্বদেশী আন্দোলন—সেগুলিকে আমরা সমর্থন করবো। আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। আমরা আমাদের জাতীয় সত্তা বজায় রাখতে চাই। কোনো দলের কথায় সাড়া না দিয়ে আমাদের জাতির পক্ষে যা মঙ্গলজনক আমরা শুধু তাই করবো। সকলের আগে মোল্লাদের ও আমাদের রক্ষণশীল সম্প্রদায়েব বিরুদ্ধে আমাদিগকে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। উপসংহারে ঐ পত্রিকা মুসলমানদের উদ্দেশ করে মন্তব্য করে যে, আত্মশক্তির দ্বারা আত্মোন্নতির সাধনা তাদের প্রথম কর্তব্য * (৩৬)।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনে 'সোলতান' পত্রিকা পুনরায় মুসলমানদের সম্মুখে আত্মশক্তির দ্বারা আত্মোন্নতির আদর্শ সজোরে ঘোষণা করে এবং বলে যে, স্বদেশী শিল্প পরিপুষ্ট হলে হাজার হাজার কারিগরও উপকৃত হবে। দাসত্বের সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনে বিচলিত না হয়ে আত্মোন্নতির দিকে মনোনিবেশ

* (৩৬) *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal*, No. 27 of 1907

করতে মুসলমানদিগকে আহ্বান করা হয়। ঐ পত্রিকা আরও বলে যে, হিন্দু বা ইংরেজ কেহই মুসলমানদের ভাগ্যোন্নতি ঘটাতে পারবে না। তাই লাটসাহেবের পূজা না করে আত্মনির্ভর হও, আত্মোন্নতিতে মন দেও, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও * (৩৭)।

তৎকালে ভারত সরকারের শাসননীতি যে কি পরিমাণ ধর্মগত বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিয়েছিল তার পরিচয় সরকারী হেফাজতে রক্ষিত দলিলে এবং সেকালের সংবাদপত্রে আজও বর্তমান। পূর্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্টের হিন্দু-বিরোধী মুসলিম-প্রীতি বিলাতের পার্লামেণ্টেও বিতর্কের অবতারণা করে। বিলাতের পার্লামেণ্টে ও'গ্রেডী নামক জনৈক ভারতবন্ধু সভ্য ভারত-সচিব মর্লিকে প্রশ্ন করেছিলেন (জুন, ১৯০৬) যে, ফুলারী সরকারের তরফ থেকে পূর্ববাংলায় হিন্দু জনগণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করার যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তা সত্য কিনা। সেদিন মর্লি এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি * (৩৮)। বস্তুত, মর্লি নিজেই ৬ই জুন, ১৯০৬ সনে লিখিত এক পত্রে বড়লাট মিণ্টোকে জানিয়েছিলেন, যে, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানেরা ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলাবে বলে শুনা যাচ্ছে * (৩৯)।

স্যার ফুলারের পদত্যাগের পর স্যার ল্যান্সিলট্ হেয়ার (Sir Laucelot Hare) পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হলে অনেকেই সে সময় আশা পোষণ করেছিলেন যে, নূতন গভর্ণরের আমলে ফুলার-প্রবর্তিত নগ্ন হিন্দু-বিরোধী নীতির ঘটবে পরিবর্তন। কিন্তু তাঁদের সে আশা অচিরেই বিলীন

* (৩৭) "We should on no account cast aside indigenous arts and industries. Neither the Hindus nor the English will be able to effect our improvement. We must be self-reliant. It is for this that we ask you, brother, to give up offering *Puja* to the *Lat.* Stand on your own legs......" Vide *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal,* No. 38 of 1907

* (৩৮) "বেঙ্গলী", ৭ই জুলাই, ১৯০৬—দ্বিতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* (৩৯) *Lady Minto's Diary,* p. 30

হয়ে গেলো। ফুলার রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হলেও তাঁর আত্মা তখনও নূতন প্রদেশে বিরাজমান। তাঁর নীতির প্রধান প্রতিনিধি হলেন ঢাকার নবাব সালিমুল্লা। বঙ্গ-বিভাগের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৬) নূতন প্রদেশে যাতে সর্বত্র আনন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হয় সেজন্য তাঁর চেষ্টার সীমা ছিল না। কেবল ঢাকা সহরে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে সভানুষ্ঠান করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। নানা জায়গায় তদুদ্দেশ্যে প্রতিনিধি ও অর্থসাহায্যও প্রেরণ করেন। তাঁর উৎসাহে ফরিদপুর, কুমিল্লা, মাদারিপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উল্লেখযোগ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফরিদপুরের এক মুসলমান-জনসভায় জনৈক মোক্তার খোলাখুলিভাবে হিন্দুদিগকে মুসলমানদের শত্রু বলে উল্লেখ করেন।

তৎকালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে স্বদেশী আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে গোপনীয় পাক্ষিক রিপোর্ট (Fortnightly Report) ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হতো। প্রথম পাক্ষিক রিপোর্ট প্রেরিত হয় ১৯০৬ সনের ৬ই অক্টোবর। এরও প্রায় এক পক্ষকাল পূর্বে (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) নূতন প্রদেশের চীফ্ সেক্রেটারী স্যার পি. সি. লায়ন ভারত সরকারকে শিলং থেকে লেখা এক পত্রে জানান যে, পূর্ববঙ্গে ও আসামের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত রিপোর্টগুলি পড়লে বুঝা যায় যে এই স্থানের আন্দোলন এখনও প্রায় পুরাপুরি কলিকাতার উস্কানিতে চলছে। বিপিন চন্দ্র পালের নামোল্লেখ করে বলা হয় যে তিনি সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করছেন। তাঁর বক্তৃতা খোলাখুলিভাবে রাজদ্রোহমূলক (His speeches are openly seditious) * (৪০)। ঐ একই পত্রে লায়ন সাহেব আরও মন্তব্য করেন যে বয়কট বা পিকেটিং ইত্যাদি ব্যাপারে মুসলমানদের কোনরূপ সায় নেই, বয়কট আন্দোলন প্রায় সর্বাংশে হিন্দু-আন্দোলন।

* (৪০) *I. B. Records*, West Bengal, File No. 491 of 1907, pp. 1-2

১৬ই অক্টোবর ১৯০৬ সনে বঙ্গভঙ্গের প্রথম বাৎসরিক দিবসে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সর্বত্র যে সকল জনসভার অনুষ্ঠান হয়, সরকারী বিচারে তার মধ্যে বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের আকাঙ্ক্ষাই নাকি প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ দিবসে উক্ত প্রদেশে মোট ৮৩টি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সভার অনুষ্ঠান ঘটে, আর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সমর্থনে আহূত মুসলমান সভা ছিল ৩৭টি। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সভাতে যোগদান করেছিল ২৫,০০০, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সমর্থনকারী সভাতে যোগ দিয়েছিল প্রায় ৭৫,০০০ ব্যক্তি * (৪১)। ভারত সরকারের নিকট এই রিপোর্ট নূতন প্রদেশ থেকে পাঠানো হয় ৭ই ডিসেম্বর ১৯০৬ সনে। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সভাগুলি ছোটবড় সকল স্থানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্ররাই যোগদান করে। পক্ষান্তরে, বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী মুসলমানদের সভাগুলি কেবল বড় বড় সহরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর তাতে যোগ দিয়েছিল প্রধান প্রধান মুসলমানগণ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা। কাজেই ভারত সরকারকে জানানো হয় সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনগণ প্রধানত বঙ্গভঙ্গের সমর্থনকারী এবং তারা সেই পরিমাণে হিন্দু পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের এই মতবাদ অনেকাংশে সেই প্রদেশের ডি. আই. জি. স্টুয়ার্ট বেকার-এর (Stuart Baker-এর) চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। তিনি ৩০শে নবেম্বর, ১৯০৬ সনে উক্ত প্রদেশের চীফ্ সেক্রেটারী লায়নকে এক পত্রে ব্যক্ত করেন যে, সভা-সমিতির সংখ্যা দেখে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে মনে হবে যে এই প্রদেশে বুঝি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী ভাবই প্রবলতর, কিন্তু গভীর পর্যালোচনায় বিপরীত সত্যই

* (৪১) "...There were 83 anti-partition meetings attended by 25,000 people, while there were 37 meetings in favour of the partition which were attended by about 75,000 persons." Vide *I. B. Records*, File No. 491 of 1907, p. 11.

প্রমাণিত হবে। হিন্দুদের অনুষ্ঠিত সভা ও মুসলমানদের অনুষ্ঠিত সভার খবরাখবর আমরা যে সমস্ত কর্মচারীর মারফৎ পেয়ে থাকি তারা প্রায় অনিবার্যভাবেই মুসলমানদের অনুষ্ঠিত সভার গুরুত্ব লাঘব করে এবং হিন্দুদের অনুষ্ঠিত সভার গুরুত্ব অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে রিপোর্ট তৈরী করে। এই সমস্ত কথা মনে রাখলে এ সিদ্ধান্তই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষেই জনমত অনেক বেশী প্রবল * (৪২)। স্টুয়ার্ট বেকার স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে হিন্দু পুলিশদের বিবৃত রিপোর্টকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য (quite unreliable) বলে মনে করতেন, কারণ তাঁর এই ছিল বিশ্বাস যে হিন্দু পুলিশেরা বঙ্গভঙ্গ বা মুসলমানদের অনুকূল সবকিছুকেই কমিয়ে দেখায় এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যা-কিছু, তা বাড়িয়ে দেখায়; অনেকক্ষেত্রে তারা বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী সভার কথা একেবারে চেপেও যায় * (৪৩)। এই সকল যুক্তি উত্থাপন করে তিনি শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলা ও আসাম সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীকে পরিষ্কারভাবে জানান যে

* (৪২) "Considering therefore the statement in connection with the above remarks, the conclusion I would form is that it proves overwhelmingly that the feeling of the province is as a whole strongly in favour of partition. The above (*i.e.* the Statement of Anti and Pro-Partition Meetings held on 16th October, 1906) refers to the 16th only and we find that a good many of the Muhammadan meetings in favour of partition were held on other dates and I think if these also were dealt with, the preponderance shown would be even greater." (Stuart Baker) . Vide *I. B. Records*, File No. 491 of 1907, p.8

* (৪৩) "...the Hindu police appear to be quite unreliable in the information they give. They miuimi e everything they consider in favour of the partition or of the Muhammadan community and magnify everything which shows the dissatisfaction at the partition. Thus they give exaggerated reports of the numbers of those attending anti-partition meetings, whilst they greatly minimise those attending pro-partition meetings and in some cases they suppress these altogether..." Vide *I. B. Records*, File No. 491 of 1907, pp. 12—13.

উক্ত প্রদেশে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষেই জনমত প্রবল। এর এক সপ্তাহ পরই পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ভারত সরকারকে অনুরূপ মন্তব্য ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রেরণ করে। স্বভাবতই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে ভারত সরকারের নীতি ঐ প্রাদেশিক সরকারের মতামতের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে এই সকল সরকারী রিপোর্টের যাথার্থ্য নানা কারণেই সন্দেহজনক। প্রথমত, তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রকাশ্যভাবে হিন্দু-বিদ্বেষী, কারণ শিক্ষা-দীক্ষায় ও রাজনৈতিক চেতনায় হিন্দুগণই সে সময় ছিল মুসলমানগণ অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসরশীল এবং সেই হিন্দুরাই ছিল উক্ত আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। তাই সেদিনকার ইংরেজ সরকারকে ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় সন্ধান করতে হয়েছিল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দাঁড় করাতে হবে বলেই ইংরেজ সরকার সেদিন এমন নগ্নভাবে মুসলিম তোষণ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ১৯০৪ সনে পূর্ববঙ্গে কার্জনের বক্তৃতাবলী, ১৯০৫ সনে গভর্ণর ফুলারের "সুয়োরাণীর" মতবাদ, জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে হীনবীর্য ও ঋণগ্রস্ত নবাব সালিমুল্লাকে প্রচুর ঋণদান করে দাঁড় করবার চেষ্টা—ইত্যাদি ঘটনা এর প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, এমন শাসনাধীনে বেতনভুক্ ইংরেজ অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল স্বাভাবিক কারণেই স্বদেশী আন্দোলন-বিরোধী। স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদানের ব্যাপারে ইংরেজ স্টুয়ার্ট বেকার হিন্দু পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা কি মুসলমান বা ইংরেজ অফিসারদের সম্বন্ধেও ন্যায্যভাবেই প্রযোজ্য নয়? তৎকালীন আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ সাংবাদিক হেনরী নেভিনুসন অন্ততঃ সরকারী ভাষ্য ও টীকাকে বেদবাক্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। ১৯০৭ সনে কুমিল্লা, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর মর্লি পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, এর প্রকৃত কারণ হলো হিন্দুদের পরিচালিত বয়কট-স্বদেশী আন্দোলন; সে প্রসঙ্গে নেভিনুসন মন্তব্য করলেন, সরকারী অফিসারেরা কিভাবে

ভারতসচিবকে ভুল সংবাদ পরিবেশণ করে বিপথে পরিচালিত করছেন এ'হলো তার এক হাস্যকর দৃষ্টান্ত * (৪৪)। তৃতীয়ত, তৎকালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলন বা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন যে কত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল তার আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো উক্ত প্রদেশে সরকার কর্তৃক ক্রমশ কঠোর থেকে কঠোরতর নিষ্পেষণ নীতির অনুসরণ। ১৯০৭ সনের নবেম্বর মাসে ভারত সরকার রাজদ্রোহমূলক সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে যে আইন (Seditious Meetings Bill) পাশ করেন তা সারা ভারতবর্ষের জন্য প্রণীত হলেও একমাত্র পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলাতেই প্রযুক্ত হয়েছিল। উক্ত প্রদেশে আন্দোলন ভয়াবহ রূপ গ্রহণ না করলে এই সকল সরকারী দমননীতি প্রবর্তনের কোনো সার্থকতাই থাকে না। অথচ সরকারী রিপোর্টেই বারবার বলা হয়েছে, স্বদেশী আন্দোলন কৃত্রিম আন্দোলন, জনসাধারণের মনের গভীরে এর কোনো শিকড় নেই এবং কলিকাতা-নেতাদের উস্কানিতেই পূর্ববঙ্গে সাময়িকভাবে উত্তেজনা মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাত্র। কিন্তু তবু পূর্ববঙ্গেই দেখা গেলো সরকারী চণ্ডনীতির ভয়ানক রূপ। তাই স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানদের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট অনেক ক্ষেত্রেই সত্যের বিকৃতি মাত্র। বঙ্গভঙ্গের এক বৎসর পরও স্বদেশী আন্দোলন শুধু হিন্দুর আন্দোলন ছিল না। মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গেও ১৬ই অক্টোবর ১৯০৬ সনের স্বদেশী সভায় মুসলমানদের অংশ গ্রহণ বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজ কর্তৃক অনগ্রসরশীল মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতার সুযোগ গ্রহণ ও কঠোর দমননীতির অবলম্বন সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক অভিযান লক্ষ্য করে বিদেশী সরকার এই সময় স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে

* (৪৪) "Thus a new religious feud was established in Eastern Bengal, and when Mr. Morley said in the Commons that the disturbance was due to the refusal of Hindus to sell British goods to Mohammedans, it was a grotesque instance of the power that officials have of misleading their Chief." Vide Nevinson's *The New Spirit in India*, p. 198.

পড়েন। বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের পরিচালনায় স্বদেশী আন্দোলন যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে মর্লিও তাঁর "স্মৃতিকথা"য় সে-কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯০৬ সনে বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে চরমপন্থী দলের দ্রুত প্রভাব-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রীতিমত বিচলিত হন। স্বরাজের আদর্শও ভারতবাসীর চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। মিণ্টো ও মর্লি উভয়েই অনুভব করলেন নিছক দমনমূলক নীতির ব্যর্থতা ও ভারতীয় শাসন-সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা।

১৯০৬ সনের ১৫ই জুন তারিখে লিখিত এক পত্রে মর্লি মিণ্টোকে জানান যে, ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্য বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় একজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ সম্পর্কে ভাইসরয়ের অভিমত জানতে তিনি আগ্রহান্বিত। এই পত্রের উত্তরে মিণ্টো তাঁর আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন, এবং তদনুসারে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সদস্য নিয়ে আগষ্ট মাসে এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন স্যার এ. টি. অরুণডেল্, স্যার ডেন্‌জিল্ ইবেট্‌সন্, মিঃ বেকার ও মিঃ আর্ল রিচার্ডস্, এবং কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন মিঃ এইচ্. রিজ্‌লী * (৪৫)।

ভারতীয় শাসনসংস্কারের জন্য মর্লি-মিণ্টোর এই সমবেত প্রচেষ্টা ভারতের মুসলমান নেতাদের মনে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। মেহ্‌দী আলি নবাব মহসীন উল মুল্‌ক প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে মুসলমান স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। আলিগড় 'অ্যাংলো ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজে'র অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড তখন সিমলায় অবস্থান করছিলেন। মেহ্‌দী আলি লর্ড মিণ্টোর প্রাইভেট সেক্রেটারী ডানলপ্ স্মিথের সঙ্গে এই মর্মে কথাবার্তা চালাবার জন্য আর্চবোল্ডকে লিখে পাঠান। ডানলপ্ স্মিথের এক চিঠির ভিত্তিতে আর্চবোল্ড মেহ্‌দী আলিকে লিখলেন তিনি যেন কয়েকজন মুসলমান প্রতিনিধির (তাঁরা নির্বাচিত না হলেও ক্ষতি নেই) স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান, এবং তার পরেই তিনি

* (৪৫) John Buchan প্রণীত *Lord Minto—A Memoir*, London, 1924, পৃষ্ঠা ২৪০—৪২

এক নেতৃস্থানীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের ভাইসরয়ের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। আর্চবোল্ড আরও লিখলেন যে, উক্ত আবেদন পত্রে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

এই আবেদন পত্রের খসড়া রচনায় তিনি নিজে সাহায্য করবেন, আর্চবোল্ড সাহেব এরূপ প্রতিশ্রুতিও প্রদান করলেন। এরপর এই বিষয়ে আলিগড়ের মুসলিম নেতাদের সঙ্গে আর্চবোল্ডের বহু পত্র-বিনিময় ("much valuable correspondence") হয়েছিল * (৪৬)।

১৯০৬ এর ১লা অক্টোবর মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ সিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের আবেদন পত্র পেশ করেন। বম্বের ধনী খোজা সম্প্রদায়ের নেতা সুলতান মহম্মদ শাহ্ এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ শাহ্ আগা খাঁ নামেই সমধিক পরিচিত। 'ডেপুটেশানের' নেতৃত্বের কাজে আগা খাঁর নামও আর্চবোল্ডই প্রস্তাব করে পাঠান। মুসলমান প্রতিনিধিদল মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎকালে ও তাঁদের আবেদনপত্রে দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন, যথা—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ও জেলা বোর্ডে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন

* (৪৬) লাল বাহাদুর প্রণীত *The Muslim League—Its History, Activities and Achievements*, (পৃষ্ঠা ৩৫) দ্রষ্টব্য। আলিগড় থেকে জনৈক ব্যক্তির পত্রের উত্তরে মিঃ আর্চবোল্ড (W. A. V. Archbold) ১০ই জুন, ১৯২৫ সনে যা লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত হলো। "As to the Simla Deputation I was, as you know, one of those who took a leading part and I have much interesting correspondence relating to it in my possession. But it is not my place to publish what I remember about it. In that matter I was trying to help the Mahomedans whose business it was and whose leaders must give you the information you desire. So I would advise you to go to Sir Aftab Ahmad Khan and also particularly to H. H. the Aga Khan. They may not know as much as I do about the whole affair, but they will be in a position to say what ought and what ought not to be given to the world."

বা reserved seat ও তাদের জন্য পৃথক ভোটের অধিকার বা separate electorate * (৪৭)। শিক্ষিত হিন্দুসমাজের সহিত প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে এই আশঙ্কায় মুসলিম নেতৃবর্গ মর্লি-মিণ্টো প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারে ঐ বিশেষ অধিকারগুলির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুসলমানদের এই বিশেষ অধিকার-দাবীর যাথার্থ্য বিবেচনাকালে গভর্নমেণ্ট যাতে ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংরক্ষণে তাদের অবদানের কথাও চিন্তা করে, সেজন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ লর্ড মিণ্টোকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ভারতে মুসলমান জনগণ বরাবরই ইংরেজ শাসক-বৃন্দের ন্যায়পরায়ণতায় ও সমদর্শিতায় অগাধ আস্থা পোষণ করে আসছে; আর সে কারণেই তারা তাদের দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে এমন কোন পন্থার আশ্রয় নেয় নি যা শাসক শ্রেণীর নিকট অসুবিধার কারণ হতে পারে। প্রতিনিধিবৃন্দ আরও বলেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ ভবিষ্যতেও এই উৎকৃষ্ট ও সময়োপযোগী ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হবে না। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মুসলমানদের মনে,—বিশেষ করে মুসলিম যুবশ্রেণীর অন্তরে,—যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তা কোনো কোনো অবস্থায় যে অবাঞ্ছিত রূপও গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে মুসলিম নেতৃবর্গ ভাইসরয়কে অবহিত করেন। উপসংহারে এই নিবেদন করা হয় যে, ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারসমূহ স্বীকার করে নিলে তারা মুসলমান প্রজাদের অবিচলিত আনুগত্য ও চিরকৃতজ্ঞতা লাভে সমর্থ হবে (*Speeches By the Earl of Minto*, পৃষ্ঠা ৫৯-৬৫ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'সিমলা ডেপুটেশানে'র স্মারকলিপিতে বয়কট আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রসঙ্গে অতি সতর্ক ও সংযত ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছিল। হিন্দুরা বয়কট-স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা করার ফলেই

* (৪৭) অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩রা অক্টোবর, ১৯০৬—Full Text of the Muslim Address দ্রষ্টব্য। *Speeches By the Earl of Minto* গ্রন্থেও (কলিকাতা, ১৯১১, পৃষ্ঠা ৫৯-৬৫ এই আবেদনপত্র মুদ্রিত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ ও আসামে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তিক্ত ও মলিন হচ্ছে এমন অভিযোগ ঐ ডেপুটেশানের প্রতিনিধিবর্গও উপস্থাপিত করেন নি। হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিবৃন্দের অস্পষ্ট ইঙ্গিতকে পুলিশ রিপোর্টে বিকৃত করে ও অযথা ফুলিয়ে বড় করে দেখানো হয়েছে। তৎকালীন পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় মুসলমান নেতৃবৃন্দ নাকি নিম্নলিখিত তথ্যগুলি ব্যক্ত করেছিলেন। প্রথমত, বয়কট আন্দোলন মোটের উপর হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলনের প্রতি মুসলমান জনগণের কোনো সহানুভূতি নেই। দ্বিতীয়ত, হিন্দু আইনজীবী ও ছাত্রদের অত্যাচারবশত মুসলমানদের মনে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তা'ছাড়া, হিন্দু জমিদারেরা তাঁদের স্থানীয় বাজারগুলিতে 'বয়কট' চালু করতে গিয়ে যে অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করছেন, তাতেও মুসলমানরা ক্রমশই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে। তৃতীয়ত, কোনো কোনো জেলায় কতিপয় মুসলমানের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তা হিন্দুদের প্ররোচনাতেই সম্ভব হয়েছে ; আর ঐ শ্রেণীর মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্তই কম। চতুর্থত, যে কয়জন মুসলমান নেতা স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করে চলেছেন তারা অধিকাংশই পদমর্যাদাসম্পন্ন লোক নন ; হয় তাঁরা হিন্দু আন্দোলনকারীদের টাকা খেয়ে, নতুবা নামডাকের প্রলোভনে এই কার্যে ব্রতী হয়েছেন (অর্থাৎ তাঁরা হলেন—"almost invariably men of little or no standing who are either in the pay of the Hindu agitators or are anxious for notoriety" (এই প্রসঙ্গে *I.B. Records* F.N. 491 of 1907, p. 5 দ্রষ্টব্য)। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্ট অনেকটা কল্পনা-মিশ্রিত হলেও মুসলিম 'ডেপুটেশান' যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিণ্টো উত্তরে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে অবহিত করতে মুসলমান প্রতিনিধিগণকে পরামর্শ দেন * (৪৮)।

* (৪৮) *Speeches By the Earl of Minto* পুস্তকে "All-India Mohammedan Deputation"-এর প্রতি মিণ্টোর উত্তর দ্রষ্টব্য। মিণ্টোর এই ঐতিহাসিক উত্তরের কিয়দংশ নিম্নে

সিমলা ডেপুটেশানের পর ভারতের মুসলিম জননায়কগণ মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এই বিষয়ে ঢাকার নবাব সালিমুল্লার নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গের আগে থেকেই তিনি এই লক্ষ্য সাধনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন।

সিমলা ডেপুটেশানে সালিমুল্লা অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি সে সময় উক্ত প্রতিনিধিদলের নিকট তাঁর মতামত ব্যক্ত করে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তা'তে তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দেন। সিমলায় প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকা আলোচনায় স্থির হয়, প্রস্তাবটি ঢাকায় আসন্ন মুসলিম এডুকেশান্যাল কনফারেন্সে (ডিসেম্বর, ১৯০৬) আলোচিত হবে। সংবাদ পাওয়ামাত্র সালিমুল্লা এক ফতোয়া (১১ই নভেম্বর, ১৯০৬) তৈরী করে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালীর এক খসড়া প্রচার করেন এবং বিভিন্ন মুসলমান নেতা ও সংঘের নিকট এর কপি পাঠিয়ে তাদের ও তাদের প্রতিনিধিদেরকে আসন্ন কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। কেহ অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলেও নিজ নিজ মতামত যাতে নবাব বাহাদুর বা মেধী আলির নিকট লিখে পাঠান, সেই বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় এই ম্যানিফেস্টোয়। সালিমুল্লা এই প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন "The Moslem All-India Confederacy"। তাঁর বিচারে এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে,

প্রদত্ত হলো: "The pith of your address, as I understand it, is a claim that, in any system of representation, whether it affects a Municipality, a District Board, or a Legislative Council, in which it is proposed to introduce or increase an electoral organisation, the Mohammedan community should be represented as a community...In the meantime I can only say to you that the Mohammedan community may rest assured that their political rights and interests as a community will be safeguarded in any administrative re-organisation with which I am concerned" (পৃষ্ঠা ৬৯-৭০).

"To, whenever possible, support all measures emanating from the Government and to protect the cause and advance the interest of our co-religionists throughout the country". অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট-প্রসূত যে-কোন নীতি বা নির্দেশ যথাসম্ভব সমর্থন করা এবং সারা ভারতে আমাদের স্বধর্মীদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রসার করা হবে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য * (৪৯)। তা'ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানের আরও একটি লক্ষ্য হলো, "To controvert the growing influence of the so-called Indian National Congress, which had a tendency to misinterpret and subvert the British Rule in India" অর্থাৎ তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিকে দমন করা আমাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাতে চায় ও সেই শাসনের নীতি বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে। সলিমুল্লার ঐ ফতোয়ায় আরও বলা হয় যে, এরূপ রাজনৈতিক সংঘের অভাবেই শিক্ষিত ও সচেতন মুসলমান যুবকগণ কংগ্রেসী দলে যোগদান করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯০৬ এর ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটির সময় ঢাকা সহরে নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশান্যাল কনফারেন্সের বিংশতি অধিবেশন বসে। উক্ত সম্মেলনে বাংলা, মাদ্রাজ, বম্বে, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, রেঙ্গুন, এমন কি ভারতের বাইরের ও কোন কোন স্থান থেকে প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক একই সময়ে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিবিংশতি অধিবেশন। পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, উক্ত কংগ্রেসে বিশেষ কোন গণ্যমান্য মুসলমান উপস্থিত হন নি। কারণ সে সময় অনেকেই মুসলিম এডুকেশান্যাল কনফারেন্সে যোগদানের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। ঢাকায় সম্মেলনের কাজ যথারীতি সমাপ্ত হলে প্রতিনিধিদল রাজনৈতিক আলোচনার উদ্দেশ্যে ৩০শে ডিসেম্বর

* (৪৯) 'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯০৬—'সলিমুল্লার ম্যানিফেষ্টো' দ্রষ্টব্য।

একটি বিশেষ সভার অনুষ্ঠান করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নবাব ভিকার উল-মুল্‌ক। উক্ত সভায় "All India Muslim League" নামে একটি সর্বভারতীয় মুসলমান প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই লীগের নিয়ম-কানুন রচনার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়। নবাব মহসীন উল্‌-মুল্‌ক ও নবাব ভিকার উল-মুল্‌ক এই কমিটির যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হলেন। স্থির হলো যে, উক্ত কমিটির তৈরী নিয়ম-কানুন এক সাধারণ মুসলিম সভায় পাকাপাকিভাবে গৃহীত হবার জন্য উপস্থাপিত হবে। পাকিস্তান-জন্মদাতা মুসলিম লীগের এই হলো উৎপত্তির ইতিহাস।

১৯০৬ সনে মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক জন্ম হলেও এর সত্যকার জীবন সুরু হয় ১৯০৮ সন থেকে। আগাগোড়াই নবাব সালিমুল্লা ছিলেন মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান প্রেরণা। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে, চেষ্টায় ও তৎ-রচিত "মোসলেম কনফেডারেসীর" গঠন-প্রণালীর ভিত্তিতে লীগের কর্মপদ্ধতি রচিত হয়েছিল। ১৯০৭ এর ১৫ই জানুয়ারী পূর্ববঙ্গের মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা কালে সালিমুল্লা নবগঠিত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সমবেত মুসলিম জনমণ্ডলীর নিকট বিশ্লেষণ করেন। নবাব বাহাদুর তাঁর সুবৃহৎ ভাষণে বঙ্গভঙ্গের দিনকে (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) "happy day" বা "শুভ দিন" বলে সম্বর্ধনা জানান এবং তিনি বলেন, বিগত পঞ্চাশ বছরে পিছিয়ে-পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বমুখী—সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক—উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই মুসলিম লীগের জন্ম। তিনি প্রদেশে-প্রদেশে, জেলায়-জেলায় ও গ্রামে-গ্রামে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করে মুসলমান জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে অনুরোধ করেন ও একটি "জাতীয় ভাণ্ডার" স্থাপন করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাফল্যের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানান * (৫০)। ১৯০৭-এর ২৯শে ডিসেম্বর করাচী শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে

* (৫০) 'ইংলিশম্যান', ১৮ই জানুয়ারী, ১৯০৭—মুন্সীগঞ্জের রাকাবি-বাজারে প্রদত্ত নবাব সালিমুল্লার ভাষণ দ্রষ্টব্য।

"লীগের" খসড়া নিয়মাবলী (draft-rules) গৃহীত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার আদমজী পীয়ারভয়। কাজেই ১৯০৮ সন থেকেই মুসলিম লীগের প্রকৃত কর্মজীবন সুরু হয়েছে বলা চলে। ঐ বৎসর ৬ই মে ইংল্যাণ্ডের ওয়েষ্টমিনৃষ্টার শহরে সৈয়দ আমীর আলির সভাপতিত্বে ভারতীয় মুসলিম লীগের বিলাতী শাখার জন্ম হয়। ইংল্যাণ্ডের জনগণকে ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু-বিরোধী কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করাই ছিল এই বৃটিশ কমিটির লক্ষ্য * (৫১)।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সারা ভারতে কিরূপ আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, মুসলিম লীগের জন্ম (১৯০৬) তার এক প্রজ্জ্বোল দৃষ্টান্ত। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়। এই চণ্ডনীতির পশ্চাতে সালিমুল্লা ও তাঁর অনুচরবর্গের এবং মুসলমান মোল্লাদিগের হাত ছিল প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট। প্রথম থেকেই নবাব বাহাদুর মুসলমানগণকে হিন্দুপ্রধান স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতায় প্ররোচিত করেন। চারিদিকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে, নেতাদের নিকট পত্র দিয়ে, জনগণের মধ্যে বক্তৃতা চালিয়ে এবং নিজে অর্থ সাহায্য করে সালিমুল্লা ধীরে ধীরে মুসলিম জনগণকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে সক্ষম হন * (৫২)।

১৯০৬ সনের ২০শে ডিসেম্বর তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রখানি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে পঠিতব্য। ঐ পত্রে তিনজন মুসলমান, যথা ময়মনসিংহের অন্তর্গত টেঙ্গাপাড়া, বরকশিয়া ও মোহনগঞ্জের অধিবাসী যথাক্রমে ইব্রাহিম খাঁ, খোদা নওয়াজ খাঁ ও ছাদত উদ্দীন—কি ভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করছিল সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'স্বজাতি আন্দোলন' ও 'জাতীয় বিজ্ঞাপন' নামক দু'টি পুস্তিকা প্রচার করে তারা সে সময় মুসলমানগণকে হিন্দুদের সঙ্গে

* (৫১) '*The Muslim League*', p. 41.

* (৫২) 'বেঙ্গলী, ২৫শে জুলাই, ১৯০৭—সিরাজগঞ্জে 'বেঙ্গলী' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা ও স্থানীয় জনৈক দায়িত্বশীল মুসলমান ব্যবসায়ীর 'ইণ্টারভিউ' দ্রষ্টব্য।

সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে উপদেশ দেয়। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' গভর্ণমেন্টের পাক্ষিক রিপোর্টে'ও (F. No. 491 of 1907) কতিপয় মুসলমান মোল্লা ও মৌলবীর এই প্রকার অপপ্রচারের কথা স্বীকৃত হয়েছে।

১৯০৭ সনের গোড়ার দিকে পূর্ব বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। প্রথমে সাম্প্রদায়িক আগুন প্রজ্বলিত হয় কুমিল্লা শহরে। ১৯০৭-এর ৪ঠা মার্চ নবাব সালিমুল্লার কুমিল্লায় আগমন উপলক্ষ করে শহরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে লুণ্ঠন, মারামারি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পর্যবসিত হলো। এপ্রিল মাসে জামালপুরে (ময়মনসিংহ) হাঙ্গামা বাধে ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তৎকালে প্রতি বছরই জামালপুরে পুণ্য স্নান ও মেলা উপলক্ষে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হতো। সেই বছর (১৯০৭) এই স্থানে প্রায় তিন হাজার বা ততোধিক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। শহরে গুজব রটে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সম্ভাবনা বর্তমান। ২১শে এপ্রিল সকালে ড্রাম পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়, যেন হিন্দুগণ নির্ভয়ে মেলায় যোগদান করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেলা আরম্ভ হবার অল্পক্ষণের মধ্যেই একদল মুসলমান লাঠি হাতে নিয়ে হিন্দুগণকে আক্রমণ করে ও দুর্গাবাড়ীর মন্দিরে প্রবেশ ক'রে প্রতিমা ভেঙ্গে দেয়। উত্তেজনা ক্রমেই চরমে ওঠে। মন্দিরের বহিঃপ্রান্তে কয়েকদিন ব্যাপী মারামারি চলতে থাকে ও কয়েকজন হিন্দু (২৭শে এপ্রিল) দণ্ডায়মান মুসলিম জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। মুসলমানেরাও স্থানীয় জমিদারগণের কাছারী আক্রমণে ও লুটতরাজে বিরত হলো না * (৫৩)। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই সময় শহরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। জামালপুরের দাঙ্গার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা ২রা মে, ১৯০৭ সনে লেখেন :

* (৫৩) 'বেঙ্গলী', ৭ই মে, ১৯০৭ সনের সংখ্যার, ২রা মে তারিখের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার বিশেষ সংবাদ-দাতার প্রেরিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

"In Eastern Bengal, the antagonism of the Mahomedans towards their Hindu neighbours seems to have been of very sudden growth ... Some mysterious influence seems to have been at work here as elsewhere. A small flame was ignited in their breasts, apparently it was sedulously fanned and it burst into a conflagration at the first opportunity. Perhaps the end of it is not yet come. It may be stamped out by proper measures on the part of the Government, but they are not to be envied the task of putting out a fire which weakness of authority allowed to blaze."

এর মর্মার্থ হলো এই যে, পূর্ববাংলায় মুসলমানদের হিন্দু-বিদ্বেষ আকস্মিক অভিব্যক্তি বলে মনে হয়, আর এর পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে কোনো এক শক্তির রহস্যাবৃত প্রভাব। ইংরেজ সরকারের দৌর্বল্যই এই আগুন প্রজ্বলিত করেছে।

জামালপুরের দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশিত হলে বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে দারুণ উত্তেজনা ও অশান্তি দেখা দেয়। ইংরেজের প্ররোচনায় পুষ্ট এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কলিকাতার সংবাদপত্র সমূহে প্রচণ্ড প্রতিবাদ উত্থিত হয়। ২৯শে এপ্রিল 'সন্ধ্যা' পত্রে উপাধ্যায় এক প্রবন্ধে লিখলেন যে, লাঠিতে আর কুলাবে না, বোমাও দরকার। আত্মরক্ষার জন্য আজ আমাদের অস্ত্রধারণ করতে হবে, শত্রুপক্ষকে আঘাতের বদলে দিতে হবে প্রত্যাঘাত। কিন্তু আমরা আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করবো না* (৫৪)। ৩০শে এপ্রিল 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বাসন্তী প্রতিমার ভগ্ন মূর্তি মুদ্রিত হলো। পরদিন 'বন্দে মাতরম্' পত্রে ভগ্ন প্রতিমার মূর্তি মুদ্রিত করে সেই সঙ্গে অরবিন্দ মন্তব্য করলেন যে, এই ছবি হলো আমাদের লজ্জা, দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে আমাদের নৈতিক অধঃপতন ও আমাদের মনুষ্যত্ব বিলুপ্তির চিত্র। কিন্তু এখানেই এ বিষয়ের শেষ নয়। "It is a picture of our own shame, of our demorali-

* (৫৪) *Confidential Report on Native Newspapers in Bengal*, No. 18 of 1907

sation under long subjection, of our loss of manhood and even the semblance of a great and religious people".
দাক্ষিণাত্যে আফজল খাঁ তুলজা মাতার মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে ও ভবানী মন্দির অপবিত্র করে কিভাবে মারাঠা শক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন সে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অরবিন্দ আরও লিখলেন যে এবারও মাতৃমূর্তি ভগ্ন ও অপবিত্র হয়েছে এবং এর পশ্চাতে আফজল খাঁ অপেক্ষাও বৃহত্তর শক্তি দণ্ডায়মান। দাক্ষিণাত্যের পর্বতের অভ্যন্তর থেকে যে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা একদিন দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, আজকের অশান্তির আগুন হবে তদপেক্ষাও ভয়াবহ এবং মারাত্মক *(৫৫)।

জামালপুরের হাঙ্গামার পরেই কামিনীকুমার ভট্টাচার্য গান লিখলেন :

"আপনার মান রাখিতে জননী! আপনি কৃপাণ ধর গো!
পরিহরি চারু কনক ভূষণ, গৈরিক বসন পর গো।
আমরা তোদের কোটি কুসন্তান, ভুলিয়া গিয়াছি আত্মঅভিমান
করে, মা, পিশাচে তোদের অপমান, তা-ও নেহারি নীরবে সহি গো!
তোদের তপ্ত শোণিত পরশে, পিশাচ-পীড়িত ভারতবরষে,
জাগুক আবার যত কুলাঙ্গার আজিও সুখে ঘুমায়ে রয়।
শুনিয়ে তোদের ভৈরব হুঙ্কার, নিখিল চমকি উঠুক আবার,
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে কর মা! ধৌত কর গো * (৫৬)।

জামালপুর থেকে হাঙ্গামা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। 'বেঙ্গলী' পত্রের সংবাদদাতার প্রেরিত বিবরণ থেকে জানা যায়, ২৮শে এপ্রিল তারিখে

* (৫৫) "Again it is the image of the mother that has been broken and desecrated, and this time it is a mightier power which stands behind the outrage. But the fire that has been kindled may also be greater, more rapid, more devastating than the one that rushed burning over all India from the hills of the Deccan." Vide *Bande Mataram*, May 1, 1907, p. 1.

* (৫৬) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস", পৃঃ ১২৬-১২৭

যা "গত রবিবার জামালপুরের আট মাইল দূরবর্তী মেলিন্দা হাটে হাঙ্গামা বাধে। ঐদিন দুপুরে কয়েকজন মুসলমান ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে যে তারা হিন্দুদিগকে প্রহার করবে।" জামালপুর থেকে দশ মাইল দূরবর্তী কামারচর নামক গ্রামে হাঙ্গামায় ১৮ জন হিন্দু মোদকের বাড়ী মুসলমান কর্তৃক লুণ্ঠিত হলো। উভয় স্থলেই সরকারী কর্তৃপক্ষ অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততা অবলম্বন করে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলেন *(৫৭)।

জামালপুরের দুর্গাপ্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েও ক্ষিপ্ত মুসলিম জনতা শান্ত হলো না। ময়মনসিংহ জেলার অম্বারিয়া গ্রামের কালীমূর্তি তারা অনুরূপভাবে ভেঙ্গে দিল এবং রায়গঞ্জের বারোয়ারী কালীবাড়ীতে প্রতিমার গলায় গরুর হার, জুতা ও মাথার খুলির ("cow-bones, skulls and shoes") মালা পরিয়ে দেয় * (৫৮)। এছাড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল ও রাজসাহীতেও কম-বেশী গোলযোগ ও হাঙ্গামা বাধে। হিন্দু-মুসলিম এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক সে সময়ে পূর্ববঙ্গে "লাল ইস্তাহার" নামে যে একটি ছোট পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল, তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিরোধকল্পে "স্বজাতি আন্দোলন" নামে একটি পাল্টা আন্দোলন খাড়া করার জন্য মুসলমানগণকে এই ইস্তাহারে আহ্বান করা হয়। তাদের সম্বোধন করে বলা হয়:

"হে মুসলমানগণ! জাগরিত হও, তহবিল সংগ্রহ কর, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন কর, পার্যমাণে হিন্দুর সঙ্গে পাঠাভ্যাস করিও না। জাতীয় কারবার খোল, হিন্দুর দোকান হইতে কোন বস্তু ক্রয় করিও না। শিল্প শিক্ষা কর, হিন্দুর শিল্পজাত দ্রব্য স্পর্শ করিওনা; হিন্দুকে চাকুরী দিও না; হিন্দুর বাড়ীতে নিকৃষ্ট চাকুরী করিও না। হিন্দুর কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া জাতিগত ব্যবসা (গোয়ালা প্রভৃতির ব্যবসা) ছাড়িও না। তোমাদের জ্ঞান নাই; যদি জ্ঞান লাভ করিতে

* (৫৭) 'বেঙ্গলী', ৫ই মে, ১৯০৭

* (৫৮) 'বেঙ্গলী' ২রা মে ও ২১শে মে, ১৯০৭

পার, তবে এক দিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাইতে পারি। দেখ, বঙ্গদেশে তোমাদের সংখ্যা অধিক, তোমরা কৃষক, কৃষি কাজই ধন উৎপত্তির বীজ; হিন্দু ধন কোথায় পাইল, হিন্দুর ধন বিন্দুমাত্রও নাই। হিন্দু কৌশলে তোমাদের ধন নিয়া ধনী হইয়াছে; তোমরা যদি সেই কৌশল শিক্ষা করিতে পার ও জ্ঞান লাভ করিতে পার, তবে একদিনেই হিন্দু অন্নাভাবে মরিয়া যাইবে বা মুসলমান হইবে।

মুসলমান মাত্রেই হিন্দুর বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিবেন না। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন, পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ও অত্যাচার করিতেছেন, তাহা মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য নহে; মুসলমানগণ চিরকাল তাহাদের পদানত থাকে, ইহাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য।...'হিন্দুর স্বার্থপরতা', 'মুসলমানদের অজ্ঞানতা' সর্বনাশের মূল, এই দুই শত্রুই মুসলমানকে অবনত করিয়াছে" * (৫৯)। "লাল ইস্তাহারের" পরে অনুরূপ আর একটি পুস্তিকাও পূর্ববঙ্গে প্রচারিত হয়। তার নাম 'বিলাতী-বর্জন-রহস্য" * (৬০)। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ নগ্ন ভাবায় বিভেদের বিষ ছড়িয়েও লাল ইস্তাহারের রচয়িতা বা প্রকাশক একরূপ বিনা শাস্তিতেই রেহাই পেয়ে যান। রাসবিহারী ঘোষ সুরাট কংগ্রেস উপলক্ষে রচিত সভাপতির ভাষণে লিখেছিলেন,

"The man who preached this zehad was only bound down to keep the peace for one year. You are probably surprised at such leniency. We in Bengal were not, or were only surprised to hear that the man had been bound down at all."

পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে

* (৫৯) 'বেঙ্গলী', ৫ই মে, ১৯০৭। এই প্রসঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯০৭) পত্রে প্রকাশিত সুরাট কংগ্রেসের জন্য রচিত রাসবিহারী ঘোষের সভাপতির ভাষণ দ্রষ্টব্য।

* (৬০) 'বেঙ্গলী' ১৯শে জুলাই, ১৯০৭।

মুসলিম জননায়কগণ ও বিদেশী শাসকবর্গ উভয়েই বয়কট-স্বদেশী আন্দোলনের উপর দোষারোপ করেছেন * (৬১)। তাঁদের মতে হিন্দুগণ বলপূর্বক মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করতে বাধ্য করে হাঙ্গামায় ইন্ধন জুগিয়েছে। ভারত-সচিব মিঃ মর্লিও অনুরূপ মন্তব্য ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রকার ধারণা যে বহুলাংশে ভ্রমাত্মক, তা ইংরেজ ও মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উক্তিতেই পরিস্ফুট হয়েছিল। দেওয়ানগঞ্জের (ময়মনসিংহ) ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বীট্‌সন বেলের মতে, 'বয়কট' দাঙ্গার কারণ ছিল না। দেওয়ান-গঞ্জের আর একজন বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট (মুসলমান) এই সম্পর্কে উক্তি করেন :

"There was not the least provocation for rioting; the common object of the rioters was evidently to molest the Hindus."

এই ম্যাজিষ্ট্রেটই অন্য আরেকটি মামলার বিচারে বলেন :

"The evidence adduced on the side of the prosecution shows that, on the date of the riot, the accused had read over a notice to a crowd of Mussalmans and had told them that the Government and the Nawab Bahadur of Dacca had passed orders to the effect that no body would be punished for plundering and oppressing the Hindus. So, after the Kali's image was broken by the Mussalmans, the shops of the Hindu traders were also plundered."

মিঃ বার্নিভিল নামক জামালপুরের সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার মালিন্দা হাটের রিপোর্টে লিখেছিলেন :

"Some Mussalmans proclaimed by beat of drum that the Government had permitted them to loot the Hindus."

* (৬১) *I. B. Records*, **File No. 491 of 1937, p. 33**

উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটই হারগিলচরের মহিলাহরণ মামলায় বলেন, গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে হিন্দু বিধবাদের 'নিকা' করতে অনুমতি দিয়েছে বলে যে গুজব রটে, তাতেই হাঙ্গামা বাধে * (৬২)।

এই সামান্য কয়েকটি তথ্য এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থে নবাব সালিমুল্লার হিন্দু-বিরোধী কর্মনীতি, মুসলিম জনগণের অজ্ঞানতা ও অনগ্রসরতা, ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সাম্প্রদায়িক কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ, সৈয়দ আহমদ্ প্রবর্তিত আলিগড় রাজনীতির বিবর্তন ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এই সমস্ত বিচিত্র ঘটনা স্মরণ রাখলে বয়কট ও স্বদেশীকে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মূল বা প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা চলে না। অশিক্ষিত মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাবে তাদের ধর্মান্ধতা ও দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ ও অন্যদিকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মুসলিম নেতা। সেই সঙ্গে বাংলার নবজাগরণে হিন্দু প্রাধান্য এবং মুসলমানদের উন্নয়নের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুসমাজের আন্তরিক দরদশীলতার অভাব হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী—একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা কালে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আদর্শ ঘোষণা করতে গিয়ে অনেক সময়ই ইতিহাসের বাস্তব পটভূমিকার প্রতি দৃষ্টি রাখেন নি। সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনার বশে, এমন কি অতীত ইতিহাসের নির্দয় বাস্তবতাকে অস্বীকার করেও, তাঁরা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের মন্ত্রপ্রচারে মুখর হয়ে উঠলেন, হিন্দু-মুসলমানের সনাতন বিভিন্নতার চেহারা তাঁরা অসত্য বলে অস্বীকার করলেন। তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক বিভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে যদি বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণ করতেন, তাহলে

* (৬২) 'বন্দে মাতরম্' ২৭শে ডিসেম্বর,১৯০৭—সুরাট কংগ্রেসের জন্য রচিত রাসবিহারী ঘোষের সভাপতির ভাষণ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

তাদের পারস্পরিক বিভিন্নতা এতটা তিক্ততা ও বিরোধে পর্যবসিত হতো না। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রাক্ ইংরেজ যুগেও ভারতে ছিল, অনেক যুগে, অনেক ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ভাবেই ছিল।

ইসলাম ধর্মকে হিন্দু ধর্ম কোনদিনই তার নিকট নতজানু করাতে পারে নি। হিন্দুদের তরফ থেকে ইসলামের আল্লাকে বিষ্ণুর অবতার বলে চালানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, ইসলামের হিংস্র একেশ্বরবাদই (fierce monotheism) মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিলিত হতে দেয়নি। বাস্তব ইতিহাসের এ কঠোর শিক্ষা আমাদের পূর্বযুগের জননায়কগণ অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন ও তাই ভুল দর্শন প্রচার করে ভারতের রাজনীতিতে তাঁরা এক বিরাট গোঁজামিলের সৃষ্টি করেন। বাস্তবের দাবীকে অস্বীকার করে চলতে গিয়ে আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতারা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি।

তা'ছাড়া, আর একটা বিষয়ও ভেবে দেখবার মত। বিংশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশে ও ভারতের নানা প্রান্তে যে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন আবির্ভূত হয়, তা হিন্দুদের চোখে ছিল প্রগতির বাহন, জাতীয় আত্মবিকাশের অত্যাবশ্যক সোপান। কিন্তু মুসলমান জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ কিছু স্বতন্ত্র। মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকে তখনও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের অগ্রগতির স্বার্থেই ভারতে ইংরেজ শাসন শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অতি-প্রয়োজনীয়। একদল ইংরেজ শাসনের অবসান চাইলেন জাতীয় অগ্রগতির প্রাথমিক সোপান হিসাবে, অন্যদল ইংরেজ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখাকেই জ্ঞান করলেন প্রগতির পথে অত্যাবশ্যক উপাদান বলে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষণীয়। মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরাই কংগ্রেসের কর্মনীতি বরদাস্ত করতে পারলেন না তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রণোদিত ছিলেন, এই সুপ্রচলিত মতবাদও ইতিহাসের বিচারে অশ্রদ্ধেয়।

পরিশেষে আর একটি কথা। স্বদেশীর নামে বিলাতী পণ্য বর্জন, এমন কি "ত্যাগ স্বীকার করেও," এটা সাধারণ অবস্থায় জনগণের নিকট নিত্যনৈমিত্তিক-

ভাবে কাম্য হতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিলাতী পণ্য বর্জনের তাগিদ যে পরিমাণে এলো নেতাদের কাছ থেকে, সে পরিমাণ কিন্তু স্বদেশী সামগ্রী দারিদ্র্য-প্রপীড়িত জনগণের সামনে দেখা দিল না। তাই যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকে, "বয়কট" আন্দোলন (অর্থনৈতিক অর্থে) হতে জনগণ ততই দূরে সরে যেতে থাকে। দারিদ্র্যের বেদনা যেখানে যত বেশী প্রবল ছিল, সেখানে ততবেশী কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি জনগণের বিরূপতাও দেখা দিতে লাগলো। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ছিল অনেক বেশী দুর্দশাগ্রস্ত। স্বল্পমূল্যের বিলাতী দ্রব্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক নিয়মেই ছিল বেশী। ১৯০৬ সনের পর বিলাতী পণ্য বয়কটের সঙ্কল্প হিন্দু নেতারা যতই উৎসাহ নিয়ে প্রচার করতে লাগলেন, ততই মুসলমান জনগণ ঐ আন্দোলনকে তাদের স্বার্থ-বিরোধী বলে মনে করতে থাকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু পরিচালিত সমগ্র জাতীয় আন্দোলনই তাদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক, উদ্দেশ্যমূলক ও স্বীয় স্বার্থের-প্রতিকূল বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯০৬ সনের শেষদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রধান প্রধান জেলাগুলি সফর করবার পর ঐ প্রদেশের তৎকালীন ডি, আই, জি, স্টুয়ার্ট বেকার নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে লেখেন, "I had some conversations with Muhammedan gentlemen and though not knowing me well as yet, they are nervous about expressing themselves freely ; I was astonished at their bitter feeling against the anti-partitionist agitators and I had no idea that they so fully recognised the economic side of the question. I must say that I had been under the impression that a great deal of their agitation and speeches could only be considered from a political point of view, but I see that I was wrong, and that there is much personal and real feeling in the matter" * (৬৩). ইংরেজ অফিসার স্টুয়ার্ট বেকারের এই স্পষ্ট ভাষণ আজকের ঐতিহাসিকের পক্ষে অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

* (৬৩) *I. B. Records*, **West Bengal. File No. 491 of 1907, pp. 12-13**

অষ্টম অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থের পরিশেষে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। একাধিক পণ্ডিত ও লেখক এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় আন্দোলন একটা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্দোলনে পরিণত হয়। এই অভিযোগ, তাঁরা সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, এই বলে যে, সে যুগের জননেতাগণ তাঁদের বক্তৃতা ও লেখালেখির মাধ্যমে বার বার জনগণের ধর্মানুরাগের নিকট আবেদন জানিয়েছেন, প্রতি বছর সাড়ম্বরে শিবাজী উৎসব পালন করেছেন, এমন কি অরবিন্দ প্রভৃতির ন্যায় মহান নেতৃবৃন্দও পুনঃ পুনঃ গীতা মহাভারত এবং অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রতি সতর্ক ও সজাগ অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। সর্বোপরি তাঁদের কণ্ঠ থেকে বার বার উচ্চারিত হয়েছে 'বন্দে মাতরমের' জয়ধ্বনি, যে ধ্বনির মধ্যে মা কালীর গৌরব-ঘোষণাই নাকি শুনতে পাওয়া গিয়েছিল! লণ্ডন 'টাইমসে'র বিশেষ সংবাদদাতা ভ্যালেনটাইন্ চিরোল তাঁর "ইণ্ডিয়া ওল্ড্ অ্যাণ্ড নিউ" গ্রন্থে লিখেছেন, "কালী মাতার পুরানো সম্বোধন 'বন্দে মাতরম্' একটা নূতন তাৎপর্য লাভ করলো এবং এই ধ্বনিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক যুদ্ধধ্বনি রূপে ব্যবহার করা হলো" * (১)। ধর্মপ্রবণতার দিক থেকে বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরভ্যুত্থান— হিন্দুধর্ম ও সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির পুনরুত্থান—স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর মতে রাজনৈতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের যে যোগাযোগ ঘটে তার ফলে ১৯০৫-এর

* (১) Valentine Chirol : *India Old And New* (London, 1921, p. 115)

জাতীয় আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং মুসলিম সম্প্রদায় আন্দোলন হ'তে সরে দাঁড়ায়। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে অ্যাংলো-ভারতীয় সমাজ বা ইংরেজ শাসক কর্তৃপক্ষের প্রকৃত মনোভাব। পরবর্তীকালে এই মতবাদ ভারতবর্ষে এবং ভারতের সীমানার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করে এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী দল তাকে বাঁধা বুলির মতো ব্যবহার করেছেন। যে-মতবাদ চিরোল প্রচার করেছেন বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে, সেই মতবাদেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং রজনী পামি দত্তের রচনায়। কিন্তু বিচার করে দেখলে বুঝতে পারা যায় এই সুপ্রচলিত মতবাদ কতখানি অন্তঃসারশূন্য।

প্রথমত, একথা মনে রাখা দরকার যে, বিগত কয়েক দশক ধরে তথাকথিত হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি নিয়ে অনেক অসার কথা বাজারে প্রচার করা হয়েছে। বিগত শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশক হতেই এই প্রচার চলে এসেছে। কিন্তু একথা কখনই স্বীকার্য নয় যে, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন পুরাপুরি রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক 'আর্য সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীও বৈদিক যুগের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন কামনা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচীন বৈদিক আদর্শের ভিত্তিতে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী ও শক্তিযোগী নূতন ভারত গড়ে তুলতে। তিনি বর্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেন নি। তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাশি ও আদর্শকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন * (২)। তৎকালে খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ অসীম ঔদ্ধত্য সহকারে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁদের সম্মোহনী প্রভাবে সেদিন ভারতীয়গণ আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী পাশ্চাত্য সভ্যতার কলুষ প্রভাব হতে স্বদেশবাসীদের মনকে মুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা দেশবাসীর মনোবল ভেঙে

* (২) B. K. Sarkar: *Creative India* (Lahore, 1937, pp. 461-64)

দিয়েছিল—তারা হারিয়ে ফেলেছিল তাদের আত্মবিশ্বাস। তিনি ব্যাকুল ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এই আত্মঘাতী স্রোতের গতিরোধ করতে। দয়ানন্দের অক্লান্ত সাধনায় মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম আবার আক্রমণকারী ও অগ্রসরশীল ধর্মে রূপান্তরিত হলো—খৃষ্টধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের কাছে সে আর নতজানু হয়ে পড়ে রইলো না—নেতিবাচক চিন্তাধারা পরিবর্তিত হলো বীর্যবত্তার মধ্যে, অফুরন্ত আশাবাদের মধ্যে। এই মানসিক জাগরণ এবং সুপ্রাচীন সুপ্ত শক্তির উদ্বোধনের ফলেই বিগত শতাব্দীর শেষে রচিত হলো সর্বাত্মক জাতীয় আন্দোলনের বলিষ্ঠ পটভূমিকা। এ ধরণের সমাজ-উন্নয়নকারী আন্দোলনকে রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা একান্ত অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ ঘটলেই তা রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হয় না; আবার অন্যদিকে কেবলমাত্র ধর্মসম্পর্করহিত হলেই কোনো আন্দোলন প্রগতিশীল আন্দোলন হয়ে ওঠে না। বৃহৎ আন্দোলন মাত্রেরই স্বরূপ অত্যন্ত জটিল। এ ধরণের আন্দোলন কোনো একটা সরল রেখা ধরে অগ্রসর হয় না। বৃহৎ ও ব্যাপক আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবাদর্শের সম্মিলন হওয়াই স্বাভাবিক। যে আন্দোলনে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ ঘটে, তার মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ থাকে উদারনৈতিক বা সংস্কারপন্থী, কিছু বা থাকে রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, আবার কিছুসংখ্যক মানুষ গ্রহণ করে বৈপ্লবিক ভূমিকা। সুতরাং কোনো বৃহৎ আন্দোলনের চরিত্র নিরূপণ করতে হলে দেখতে হবে তার মূল লক্ষ্য ও আদর্শ কী, তার প্রধান সুর কী—বিভিন্নমুখী কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে আন্দোলন লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারছে কিনা; আন্দোলনে ধর্মের কোনো প্রভাব আছে কি নেই তা প্রধান বিবেচ্য নয়। বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করা হয়েছে, ১৯০৫-এর আন্দোলন রাজনৈতিক ভাবাদর্শের ধারা বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বঙ্গবিভাগ রহিত করা ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সন্তোষজনক সমাধান করা। আন্দোলন সুরু হবার অল্পকাল পরেই এই সীমিত আদর্শকে অতিক্রম করে আন্দোলন এগিয়ে গেলো 'পূর্ণ

স্বরাজের' অভিমুখে। স্বাধীনতার স্বপ্ন জাতিকে নব জীবন-রসায়নে করলো অগ্নিগর্ভ, সংঘবদ্ধ নিরস্ত্র প্রতিরোধের দ্বারা বৈদেশিক শাসনের হাত থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য তারা হলো ব্রতবদ্ধ * (৩)। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতীয় স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষাই ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যে বারবার ধর্মাদর্শের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের গৌরবময় ঐতিহ্যের অবতারণা করা হয়েছে তার মূলে কোনো সামাজিক বা ধর্মগত গোঁড়ামি ছিল না, রাজনৈতিক কর্মকৌশল হিসাবেই তাদের আমদানী করা হয়েছিল। প্রাচীন গৌরব কাহিনীর সমাশ্রয়ে জননী জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনা, আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও বেগবান করে তোলাই ছিল নেতৃবৃন্দের প্রধান উদ্দেশ্য। মহান নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সর্বপ্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনকে ভারতীয় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হন। তিলক ছিলেন সে-যুগের চরমপন্থী রাষ্ট্রনেতা। তাঁর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে যে নবনীতির প্রথম সূচনা হয়, স্বদেশীযুগে তা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিস্তার লাভ করলো। রাজনৈতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় উদ্দীপনার সম্মিলন হয়েছিল সত্য, কিন্তু তার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন তার প্রগতিশীল ভূমিকা পরিত্যাগ করে নি, পক্ষান্তরে ধর্মীয় উদ্দীপনা দেশপ্রীতিকে করেছে উদ্বোধিত ও নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত। তার ফলেই বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার আন্দোলন পরিণত হয় সুদূরপ্রসারী বিরাট জাতীয় আন্দোলনে।

তৃতীয়ত, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বদেশী আন্দোলনে ধনিক, বণিক এবং অভিজাত সম্প্রদায় যোগদান করেছিল, কিন্তু তার ফলে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় নি। তাদের অংশ গ্রহণ থেকে বরং প্রমাণিত হয় যে, নূতন ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে রক্ষণশীল

* (৩) ১৯০৭ সনে 'বন্দে মাতরম্' পত্রে (২৭শে এপ্রিল, ২৯শে এপ্রিল, ৩০শে এপ্রিল ও ২রা মে) অরবিন্দ ঘোষ লিখিত "Shall India Be Free?" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

ধনিক, বণিক এবং অভিজাত শ্রেণীর মানুষও রেহাই পায় নি—আন্দোলন থেকে দূরে থাকা তাদের পক্ষেও সম্ভব হয় নি।

চতুর্থত, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ স্বদেশী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ কোনো সময়ই রাজনীতিকে ধর্মানুশাসনের কাছে নতজানু করাতে রাজী হন নি। তৎকালীন গোয়েন্দা বিভাগীয় পুলিশের রিপোর্টে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে, ধর্মের আবরণে জননী জন্মভূমির পূজা করা এবং তদুদ্দেশ্যে এক নব সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তোলার কথা অরবিন্দই সর্বপ্রথম চিন্তা করেছিলেন। এই নূতন ধ্যান-ধারণার মধ্যে অরবিন্দের গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় *(৪)। অরবিন্দের তৎকালীন লেখালেখির ভিতর রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ এতই সুস্পষ্ট যে, যে-কোনো অসতর্ক পাঠকের দৃষ্টিও তা এড়িয়ে যেতে পারে না। সে-যুগের চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের স্বরূপ ধরা পড়েছে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার অপূর্ব সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীর মধ্যে *(৫)। একথা অনস্বীকার্য যে, অরবিন্দের রচনায় প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, কালী, ভবানী ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, তাঁর রচনায় এই সব শব্দের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটেছে আলঙ্কারিক অর্থে, আক্ষরিক অর্থে নয়, সাম্প্রদায়িক কোনো দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তনের উদ্দেশ্যে নয়।

পঞ্চমত, একথা মনে করলে ভুল হবে যে, সে-যুগের রাজনীতিতে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁরা আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্র-সভ্যতাকে বর্জন করেন নি এবং তাঁরা ঘুণে-ধরা পুরানো সমাজ-ব্যবস্থার উপরও জাতীয় আন্দোলনকে দাঁড় করাতে

* (৪) *I. B. Records*, West Bengal, L. No. 47, p. 3

* (৫) বর্তমান লেখকদের *'Bande Mataram' and Indian Natinalism* (Cal., 1957). এবং *Sri Aurobindo's Political Thought* (Cal., 1958 পুস্তকদ্বয় এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

চান নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এদেশে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনও বিবর্তিত হয়। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ছিল এর বাস্তব মূর্তি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রবর্তিত ও পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোনোমতেই রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিশেষিত করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, নব-প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাই জাতির মনে জাগিয়ে তোলে এক নূতন ভাবনা—এক অবিশ্বাস্য বৈপ্লবিক উদ্দীপনা। সে-যুগের বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত পাঠক্রমের তুলনায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গৃহীত পাঠ্যতালিকা ছিল অনেক বেশী প্রগতিশীল। এমন কি সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমের তুলনায়ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পঠন-পাঠন প্রণালী উন্নততর ছিল বলেই মনে হয় * (৬)।

ষষ্ঠত, চিরোল প্রদত্ত 'বন্দে-মাতরমে'র ব্যাখ্যা একেবারেই ভ্রান্তধারণা-প্রসূত। কালী মায়ের পূজার উদ্দেশ্যে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি কখনও উচ্চারিত হয় নি এবং কালী শব্দটিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যুদ্ধধ্বনিতে কোনো সময় পরিণত হয় নি। 'বন্দে মাতরম্' ছিল মাতৃপূজার মন্ত্র এবং সেই মাতৃপূজা বলতে নেতারা বুঝেছিলেন দেশজননীর বন্দনা। দেশপ্রীতির এই নূতন ধ্যানের ঋষি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত। ১৯০৫ সনের ৩০শে আগষ্ট অরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে এক পত্রে ব্যক্ত করেছিলেন, "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি" * (৭)। মাতৃরূপে দেশবন্দনার আদর্শ স্বদেশী যুগে বাঙালীর রাষ্ট্রিক চিন্তায় স্থায়ী ঘর করে বসেছিল।

সপ্তমত, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য নরনারী আন্দোলনে যোগদান করেছিল। পরবর্তীকালে

* (৬) বর্তমান লেখকদের *The Origins of the National Education Movement*

* (৭) "অরবিন্দের পত্র" (প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর থেকে ১৯২১ সনে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১০—১১) দ্রষ্টব্য।

মুসলিম সম্প্রদায় আন্দোলন হতে সরে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তারা কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। ঢাকার নবাব বাহাদুর প্রথম দিকে ছিলেন বঙ্গভঙ্গের প্রচণ্ড বিরোধী, পরে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন বঙ্গ-বিভাগের সমর্থনে। এই সময় তিনি প্রচার করতে লাগলেন, কংগ্রেস প্রকৃত প্রস্তাবে একটা হিন্দু সংগঠন এবং বয়কট-স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু আন্দোলন—হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এর কাম্য। এই সময় মুসলিম সম্প্রদায় যে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো তার যথার্থ কারণ আন্দোলনের সহিত হিন্দুধর্মের যোগাযোগ নয়, আসল কারণ হলো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের বিভেদ-নীতি, মুসলমান জনগণের ধর্মান্ধতা, দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের নানারূপ অপপ্রচার ইত্যাদি ঘটনা। এই সময় বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশলে রাজনৈতিক চেতনায় অনগ্রসর মুসলমানদিগের ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে তাদের বিপথগামী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মুসলমান জনসাধারণকে ধর্মের নাম করে বুঝানো হলো নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে তাদের স্বার্থই সর্বাগ্রে সংরক্ষিত হবে এবং তাদের স্বার্থ হিন্দু স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বয়কট-স্বদেশী আন্দোলন সফল হলে হিন্দু স্বার্থই পরিপুষ্ট হবে এবং সেই পরিমাণে মুসলমান সমাজের অগ্রগতির ও আত্ম-বিকাশের পথ হবে কণ্টকিত। কংগ্রেসী আন্দোলন হিন্দু আন্দোলন, হিন্দুর স্বার্থ পরিপোষণ এই আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য—এই ধরণের সুসংবদ্ধ অপপ্রচারে সেদিনের মুসলমান জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বদেশী যুগে মুসলমানদের তরফ থেকে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, তা কিন্তু নূতন নয়। এমন কি ১৮৮৬ সনে যখন জাতীয় কংগ্রেস ছিল সম্পূর্ণরূপে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাবাধীন, যখন রাজনীতিতে শিবাজী উৎসবের মতো কোনো হিন্দু উৎসবের প্রচলনও হয়নি, তখনও কংগ্রেসকে বলা হয়েছে হিন্দু সংগঠন এবং কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনকে প্রচার করা হয়েছে হিন্দু আন্দোলন

বলে। ভারতে স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনীতির প্রবর্তক স্যার সৈয়দ আহমদ প্রথম দিকে ছিলেন উদারনৈতিক শাসনসংস্কারের পক্ষপাতী, পরবর্তীকালে কংগ্রেস যে সকল শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী উচ্চারণ করবে তিনি তাই কামনা করেছিলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে। কিন্তু 'নাইট' পদবি লাভ করবার পর সরকারী শক্তির প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন হিন্দু বিরোধী এবং ভারতে ইংরেজ শাসকের উৎসাহী সমর্থক* (৮)। ১৯০৬ সনে মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল সিমলায় গিয়ে ভারতের বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন (১লা অক্টোবর), তাঁরা ছিলেন চিন্তাজগতে সৈয়দ আহমদের উত্তরাধিকারী এবং দীর্ঘকাল পরে তাঁরা স্যার সৈয়দের পন্থানুসরণ করেই কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

অষ্টমত, যদিও ১৯০৬ সনের পর পূর্ববঙ্গের বেশীর ভাগ মুসলমানই আন্দোলন হতে দূরে চলে গিয়েছিল, তথাপি তখনও মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। ১৯০৬-০৭ সনে বাখরগঞ্জ জেলার মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় অশ্বিনীকুমার দত্তের পরিচালনায় জাতীয় আন্দোলনে যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। গোয়েন্দা পুলিশের তৈরী ১৯০৭ সনের রিপোর্টে বরিশালকে নবপ্রদেশের "সর্বাপেক্ষা অগ্রসরশীল এলাকা" ("the most advanced area in this province") বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, অশ্বিনীবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় "যাত্রা" পার্টি ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় পরিভ্রমণ করে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল * (৯)।

* (৮) James Samuelson :—*India Past and Present* (London, 1890, pp. 319-20)

* (৯) "Babu Aswini Kumar Dutt of Barisal is the patron of a theatrical or jatra party that is now touring through the districts of Faridpur and Bakarganj. This party enacts pieces written in support of the *Swadeshi*

বরিশালের অশ্বিনীবাবু তৎকালে বাখরগঞ্জ জেলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণের উপর যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা অনেকটা একক ও তুলনাবিহীন। সুতরাং ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায় কোনো অংশ গ্রহণ করে নি, এ' কথা গ্রাহ্য নয়।

এবার শেষ কথা। স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনাকালে সর্বশ্রেষ্ঠ জননেতারা যদি কোনো ধর্মপ্রচার করে থাকেন তাহ'লে মানতেই হবে সেই ধর্ম ছিল দেশ-প্রেমের ধর্ম, যে ধর্মের বাণীমূর্তি ছিলেন অরবিন্দ। নবজীবনদায়িনী এই নূতন ধর্মের মহান আদর্শকে জীর্ণ ও বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি। যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন তার মূল লক্ষ্য ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা ও পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সে-যুগের নেতৃবৃন্দ যুগোপযোগী কোনো পন্থাই বর্জন করেন নি। নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল ভারতের স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি সাধনা বাস্তব হয়ে উঠতে পারবে। অরবিন্দ লিখেছিলেন, "The world needs India and needs her free." বিপিন পালের কণ্ঠেও অনুরূপ চিন্তা বারবার উচ্চারিত হয়েছিল।

১৯০৫-এর জাতীয় আন্দোলনের মূল কথা হলো 'বয়কট', 'স্বদেশী', 'স্বরাজ' এবং 'জাতীয় শিক্ষা'। এই সব চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে রক্ষণশীলতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রায় কোনো সময়েই প্রশ্রয় পায় নি। বরং একথা বলা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় ভারতবাসী প্রগতির পথে পেয়েছিল এক নূতন জীবনদৃষ্টি ও বৈপ্লবিক চেতনা। এই আন্দোলন জনমানসে যে-প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তা' আজও অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে; এই আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। ভারতের জনজীবনে এমন প্রচণ্ড আলোড়ন ইতিপূর্বে

movement and in ridicule of the Government......" Vide *I. B. Records*, West Bengal, File No. 491 of 1907, pp. 16-17.

আর কখনও দেখা যায় নি। ১৯০৫-এর আন্দোলন দুর্বারগতি ঝঞ্ঝার বেগে নিয়ে এলো পরিবর্তন—গণ-চেতনার মর্মমূল পর্যন্ত করলো আন্দোলিত। পুরাতন জীবন ও জগতের রূপ ও রঙ বদ্‌লে গেলো আচম্বিতে। জরাজীর্ণ ধ্যানধারণা নিঃশেষে হলো বিলুপ্ত। এই আমূল পরিবর্তনের নামই তো বিপ্লব'।

প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "বয়কট-স্বদেশী-স্বরাজ-জাতীয় শিক্ষা নামক কর্মচতুষ্টয় বা চিন্তা-চতুষ্টয় কোনো নামজাদা বাঙ্গালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পল্লী বা শহরের কল্পনা বা কার্য মাত্র ছিল না। এই কর্ম ও চিন্তারাশির প্লাবনে তামাম বাংলার নরনারী ভেসে গিয়েছিল। কাজেই রবিকণ্ঠে বেরিয়েছিল,—'মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী।' শব্দই হ'ক আর বস্তুই হ'ক,—দুইয়েই ছিল লাখ-লাখ মানুষের স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও ভাবুকতা আর কৃতিত্ব, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবত্তা ও স্বার্থত্যাগ মাখানো। এরি নাম আন্দোলন। বহরটা রীতিমত পুরু। অসংখ্য বাঙালীর সুরৎ বদ্‌লেগেল। মেজাজ বদ্‌লে গেল" * (১০)। এই পরিবর্তন এতই উল্লেখযোগ্য ছিল যে, ভারতের বড়লাট মিণ্টো "Seditious Meetings Bill" আলোচনা প্রসঙ্গে ২রা নভেম্বর, ১৯০৭ সনে আইন পরিষদে ভাষণ প্রদানকালে এই অভিমত ব্যক্ত করেন, "The Government of India would be blind indeed to shut its eyes to the awakening wave which is sweeping over the Eastern world, over whelming old traditions, and bearing on its crest a flood of new deas" * (১১).

* (১০) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬ দ্রষ্টব্য।

* (১১) *Speeches By the Earl of Minto* : 1905-1910 (Cal. 1911, p. 181)

পরিশিষ্ট

বাংলার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা ও 'যুগান্তর' পত্রিকা

অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীমান হরিদাস মুখোপাধ্যায় "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান" নামক পুস্তিকার জন্য একটি ভূমিকা লিখিতে আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। আজকাল 'যুগান্তর' পত্রিকা এবং তাহার কার্য সাধারণের কাছে Fairy Tale রূপে পরিণত হইয়াছে। পুনঃ বিপ্লবান্দোলন বিষয়ে নানা ঐতিহাসিক বাহির হইতেছেন, যাঁহারা কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া যা' তা' লিখিতেছেন। ইঁহারা কেহই ইতিহাস লিখিতেছেন না। ইংরাজ ঐতিহাসিক ফ্রিম্যান্ বলিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অর্থ হইতেছে, অকাট্য তথ্য। অবশ্য কোন একটা অনুসন্ধানের সর্বদিকের সর্ববিষয়ে কেহ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হইতে পারেন না, অনেক তথ্য লুক্কাইত থাকিয়াই যায়। কিন্তু ফল দেখিয়া কারণ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। এইজন্য যতদূর সম্ভব যথার্থ তথ্য সমূহের অনুসন্ধান দ্বারা সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রকৃত ঘটনাসমূহ লোকের সম্মুখে ধরা ঐতিহাসিকের কর্ম।

এই বিষয়ে দেখিতেছি, গ্রন্থকারদ্বয় অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন। তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহাদের সহিত কিছু মতভেদ আছে। অবশ্য ইহা তাঁহাদের দোষ নয়। সংবাদপত্র এবং সরকারী রিপোর্ট সমূহ হইতে তাঁহারা অনেক তথ্য পাইয়াছেন, সেইখানেই আমার কিছু সন্দেহ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি যে, আমার বিচারকালে আদালতে

C. I. D. Superintendent Ellis যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাতে অনেক মিথ্যা কথা সাজানো ছিল। তৎকালেই আমি আমার কৌশুলী অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন দাসকে বলি, "এলিস সব মিথ্যা কথা বলিতেছে।" কিন্তু আমি যখন স্বপক্ষ রক্ষার জন্য (defence) বিরতই ছিলাম, তখন কে কি বলে তাহাতে কি আসিয়া যায়! আবার, "কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কসে"র প্রিন্টার যে বলিয়াছিল—"আমি 'যুগান্তরে'র সকলকে চিনি" ইহাও সত্য নয়। সেই লোককে আমি কখনও দেখি নাই। তিনি সরকারী পক্ষের সাক্ষী ছিলেন। এই প্রকারের ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া মতানৈক্য আছে। কিন্তু তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

গ্রন্থকারদ্বয় বিস্মৃত অতীতের বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে যে তথ্যসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা এইজন্য তাঁহাদের কাছে চিরঋণী থাকিবেন। ইঁহারা Fairy Tales, আষাঢ়ে গাল-গল্পের বাজার মধ্য হইতে বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের যথার্থ ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া বাহির করিতেছেন। এতদ্বারা বহু ভুলভ্রান্তি এবং আষাঢ়ে গল্পের নিরসন হইবে আশা করা যায়।

এইস্থলে আষাঢ়ে গল্পের একটা উদাহরণ দিই: ৺ভগ্নী নিবেদিতা সম্বন্ধে বাজারে অনেক অপ্রাকৃত ও অসম্ভব গল্প চলিতেছে। তিনি নাকি আইরিশ গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। আর ভারতে তাঁহার নকলে কি প্রকারে "গুপ্ত সমিতি" সংগঠন করিতে হয়, তাহা বাঙ্গালী তরুণ বৈপ্লবিকদের তিনি শিক্ষা প্রদান করিতেন, ইত্যাদি কত গল্পই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়। এইসব গল্পের উদ্ভব কোথা থেকে হয় তাহাও জানি না! এমন কি ভগ্নীর জীবনীকার ফরাসী মহিলা মাদাম রেমণ্ড তাঁহার পুস্তকে আমার খণ্ডন সত্ত্বেও ভুল কথা লিখিয়াছেন! আমি যাহা

তাঁহাকে বলি নাই এবং যে ভুল তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছি, তৎসত্ত্বেও সেই সব ভুল সংবাদ তাঁহার পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বোধ হয় প্রতিপাদ্য (Thesis) প্রমাণ করিবার জন্যই লোকের আজগুবীর আশ্রয় লইতে হয়।

তদ্রূপ, 'যুগান্তর' সম্বন্ধেও কত গল্প বাজারে চলিতেছে! যাঁহারা কখনও বিপ্লবান্দোলনের ত্রিসীমানায়ও আসেন নাই, তাঁহারাই আজ গুপ্ত সমিতির গুপ্ত আন্দোলনের ঐতিহাসিক হইয়াছেন! কেহ স্বীয় পার্টির জয়ঢাক বাজাইয়া ইতিহাসের সত্যতা লুকাইত করিতেছেন, কেহ বা পক্ষপাত দুষ্ট হইয়া কাহাকেও বড় এবং কাহাকেও ছোট করিতেছেন। অনেকে 'যুগান্তর' আন্দোলনের ভিতরকার কথার আসল ওয়াকিবহাল বলিয়া নিজেদের জাহিরও করিতেছেন।

গুণী বড় হউন, অগুণী তাঁহার যথার্থ স্থান প্রাপ্ত হউন, ইহাই শিক্ষিত সমাজের অভিমত। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা করা বৃথা। গুপ্ত সমিতির কথা প্রকাশ হয় না, বিশেষতঃ বাঙ্গালার গুপ্ত আন্দোলন ইতালীয় কার্বোনারি সম্প্রদায়ের ন্যায় কার্য করিত। একই নেতার অধীনে যাঁহারা কার্য করিতেন, হয়ত তাঁহারাও পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতেন না। কে, কোন্ নেতার অধীনে কাজ করিতেন, তাহা অন্যে জানিতেন না। নেতা তাঁহার অধীন কর্মীদের কর্ম পরিচালনা করিতেন, এবং তাঁহার উর্ধতম নেতার কাছে রিপোর্ট পেশ করিতেন। এই পন্থার উদ্দেশ্য ছিল, একজন ধরা পড়িলে আর একজন তাঁহার সহিত জড়িত হইয়া যেন ধরা না পড়েন। আলিপুর বোমার মকদ্দমার পর, বৈপ্লবিক কর্মীরা পৃথক হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে কর্ম করিতেন। উদ্দেশ্য উহাই।

যখন সকলে সব সংবাদের ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তখন হঠাৎ

কাহারও কাছ থেকে পক্ষপাতদুষ্ট কথা বা উড়া কথা শুনিয়া ঐতিহাসিক গবেষক বলিয়া বাজারে জাহির করা অশোভন ব্যাপার। 'যুগান্তর' সম্পর্কীয় কর্মীদের বেশীর ভাগ লোক এখনও জীবিত আছেন। হাজার হাজার লোক এখনও দেশে জীবিত আছেন, যাঁহারা এই পত্রিকা পড়িয়াছেন! তত্রাচ এই পত্রিকা সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন এবং মা কালীর সাধক ছিল বলে জাহির করাতে সত্যেরও মর্যাদা থাকে না, কর্মীদেরও সম্মান করা হয় না। এতদ্দ্বারা দেশের অনিষ্ট সাধন করা হয় মাত্র।

১৯২৫ খৃঃ আমার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বিপ্লব সমিতির অন্যতম নেতা ৺অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে তাঁহার 'মহাজন ব্যাঙ্কে' ডাকাইয়া আমার জেলের পর হইতে প্রথম জগৎব্যাপী যুদ্ধের সময় তাঁহার ও অন্যান্য কর্মীদের "অন্তরীণ" হওয়া পর্যন্ত সকল ঘটনার সার বলিয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন: "আপনি বলে-ছিলেন আমি জেলে চল্‌লাম, কিন্তু আমার 'যুগান্তর' যেন বেঁচে থাকে।" তৎপর, তৎকালীন পরিচালকেরা "বোমা" তৈয়ারী করিতে চলিয়া যাবার পর, তিনি ৺কার্তিক চন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য যুবকদের হাতে পত্রিকা পরিচালনার কর্মভার প্রদান করেন (লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তক দ্রষ্টব্য)। এই স্থলে বক্তব্য যে, আমার জেলে যাইবার আগে থেকেই সাধারণের কাছ থেকে টাকা সাহায্য আসিত। পরে টাকা যথেষ্ট আসিত ইহা অবিনাশ বাবু কাগজ-পত্র দেখিয়া ধার্য করিয়াছিলেন।

পুনঃ অনুশীলন সমিতির নেতা আমাদের সহকর্মী ৺সতীশ চন্দ্র বসু তাঁহার Statement-এ (বিজ্ঞপ্তিতে) উক্ত সমিতির উৎপত্তি এবং 'যুগান্তরের' সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে বর্ণনাদি দিয়াছেন।

আবার ৺হেমচন্দ্র কানুনগো আমাকে তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বৈপ্লবিক নেতাদের বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর এই সব প্রকাশের প্রয়োজন ও সার্থকতাই বা কি? কার্য করিতে গেলেই ব্যক্তিগত আক্রোশ, ঈর্ষা আবির্ভূত হয়; বিশেষতঃ পরাধীন আত্মকেন্দ্রিক হিন্দুজাতির মধ্যে তাহা স্বভাবগত ধর্ম।

কে কি করিল, কাহার সঙ্গে কি কথা হইল, কে কোন্ প্রবন্ধ লিখিল, কাহার সঙ্গে কাহার ঝগড়া হইল তাহা স্বাধীনতা আন্দোলনের গাত্র স্পর্শ করে না। এবং তাহা একেবারেই অবান্তর ব্যাপার। এই দেশে দৃষ্ট হয়, যাঁহাদের কিছু করিবার বা বলিবার নাই, তাঁহারাই জরদগবের ন্যায় ঐ সব পুরাতন কথা রোমন্থন করিয়া নিজেদের গুরুত্ব জাহির করিতেছেন। আসল বিবেচনার বিষয় হইতেছে, কেহ আদর্শচ্যুত হইয়াছেন কি না এবং তদ্বারা আন্দোলনের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে কি না? আন্দোলন ব্যাহত হইয়াছে কি না এবং কেন হইয়াছে? আন্দোলন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে কি না এবং কেন হইয়াছে? এই সবই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বস্তু। ব্যক্তিকে ছোট বা বড় করা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যার পশরা খোলা ব্যাপার ইতিহাস নয়!

ইহাই ঐতিহাসিক সত্য যে, অনেকে আদর্শচ্যুত হওয়া বা পূর্ব কর্মকে হাস্যাস্পদ করা সত্ত্বেও বিপ্লব আন্দোলন ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নানাদিকে নানাভাবে চলিয়াছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেহ রোধ করিতে পারে নাই, স্বয়ং প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও নয়। এইজন্য কে কোন প্রবন্ধ লিখিল, বোমার কথা কাহার মস্তিষ্ক হইতে প্রথম উদ্ভূত হইল, কে বোমা পাকাইল (হেম দাস ইহাকে ভুবড়ী বলিয়াছেন) ইত্যাদি বড় কথা নয়, এতদ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের

কিছু আসিয়া বা বহিয়া যায় না। বাঙ্গালী বহুদিন বৃহৎ কর্ম করে নাই বা বৃহৎভাবে কোন কর্ম করিতে পারে না বলিয়াই এই সব ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কথা লইয়া বই প্রকাশ করিয়া লেখকেরা ব্যক্তিগত আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন।

পুনঃ, আর একটা কথা ঃ পুলিশ রিপোর্ট অভ্রান্ত নয় বা সব সময়ে সত্য নয়। ইংরেজ পুলিশ অফিসারেরা নিজেদের চাকুরী বজায় রাখিবার জন্য অযথা খয়ের খাঁগিরির উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আলিপুর মকদ্দমাতেই প্রমাণিত হইয়াছে, পুলিশ জাল পত্র সৃষ্টি করিয়াছে ; যেমন 'রসগোল্লার' গল্প। আমি আমার সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই নিম্নোক্ত বলিতেছি ঃ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর, কোন বৈপ্লবিক নেতা দিল্লীতে অবস্থানকালে পুলিশের পুরাতন নথিসমূহ পড়েন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া আমায় জানান, যখন আমি জেল হইতে বাহির হইয়া বিদেশে রওনা হই পুলিশেরা নাকি আমাকে অনুসরণ করিতেছিল। তাঁহারা বলেন, আমি একজন লোকের সঙ্গে ছদ্মবেশে যাইতেছিলাম। অথচ, পুলিশ আমায় ধরিল না! জেল হইতে বাহির হইবার সময়ে সহকারী জেলারই আমায় বলিয়াছিলেন, "বাহির হইয়াই বিদেশে পালান, সম্ভবতঃ সন্ধ্যাকালেই আপনাকে ধরিবে, যদি অমুক সরকারী পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে আপনি বাঁচিবেন না।" বাহির হইয়া আমি বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ইহা বলি। ব্যারিষ্টার চট্টোপাধ্যায় অমুকের বিপক্ষে এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তিনিই দাসের সহকারীরূপে আসামীদের হইয়া মকদ্দমার তদ্‌বির করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বলিলেন, "যদি তোমায় সন্ধ্যায় ধরে, তুমি কিছুই বলো না। যা' করবার আমরা তা' করব।"

তৎপর, স্বদেশে ১৯২৫ সালে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বন্ধুবর

ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্র হালদার বলেন, "তোমার বিপক্ষে standing warrant আছে, তোমার এবার open trial করিবে।" আমার পলায়ন বিষয়ে যদি পুলিশ রিপোর্ট সত্য হইত, তাহা হলে আমার জন্য বেলুড় মঠে পুলিশ তল্লাসী করিবে কেন? এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া পৈতৃক বাড়ীখানা তল্লাসী করিবে কেন? আর অগ্রজ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের উপর কঠোর নজর রাখিবে কেন? প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে পুলিশ তাঁহাকে ও তাঁহার দুইজন যুবক অনুরাগীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। আসল কথা এই যে, বোধ করি লোক মুখে গল্প শুনিয়াই পুলিশ এই রিপোর্ট তৈয়ারী করেছিল।

পুনঃ দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর দার্জিলিংএ যাই। তথায় স্বামী অভেদানন্দের আশ্রমে উত্তর বঙ্গের একজন মোক্তারের সহিত আলাপ হয়। তিনি ভাবাধিক্যে আমার পদধূলিও গ্রহণ করেন। পরে আমায় তাঁহার বাড়ী যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। আমিও স্বীকৃত হই এবং পাহাড় থেকে নামিবার সময় তাঁহার অতিথি হই। সেই নগরে, আমার এক আত্মীয় ছিলেন যিনি আদালতের প্রধান মুন্‌সীফ্। স্টেশনে নাবিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া মোক্তার মহাশয়ের বাড়ী যাইব স্থির করি। আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য মোক্তার মহাশয়ের সঙ্গে তথাকার অ্যাসিস্ট্যান্ট্ সার্জন এবং আরও কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়দের প্রতীক্ষায় বাহিরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে পুলিশ ইন্‌স্পেকটর আসিয়া হাজির! আমার আত্মীয় তাঁহার বাসায় অতিথি হইতে আমাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু আমি তাহা প্রত্যাখান করি। কিছুদিন পরে দেখি আমি তথা হইতে যতই চলিয়া আসিতে চাই মোক্তার মহাশয় ততই আপত্তি করেন। এই সঙ্গে লক্ষ্য করি পুলিশের তৎপরতা কমিতেছে, কিন্তু আমার অতিথি সেবক (host)-এর

তৎপরতা বাড়িতেছে। আমি কাহারও সঙ্গে বেড়াইতে গেলে তিনি আমার গা ঘেঁষিয়া চলেন। পরে, হঠাৎ একদিন আমায় প্রত্যুষে পূর্বোক্ত ডাক্তার মহাশয় আসিয়া বলেন, "মহাশয় পালান। এই লোকটা আপনাকে রাখিয়া গোয়েন্দাগিরি করিতেছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আর পুলিশ ইনস্পেকটর মুন্সীফ্, আপনার ও আমার বিপক্ষে এক বড় রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাখিল করিয়াছে যে—"The chief Munsiff treated the party with a sumptuous dinner।" আমি তৎপর দিন সেই স্থান পরিত্যাগ করি। পর বৎসর পাবনার কোন এক গ্রামে এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা হয়। তিনিও ঐ নগরে তৎকালে পুলিশ ইনস্পেকটর ছিলেন, এবং আমার সঙ্গে দেখাও করেন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি: "এই কথাটি কি সত্য যে উক্ত মোক্তার আমার বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করিতেছিল?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, তাহা সত্য।" পুনঃ, জিজ্ঞাসা করি—"অমুক বাবু যিনি তথাকার কংগ্রেস নেতা, তিনি কি এই বিষয়ে জানিতেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"।

পরের বৎসর উপরোক্ত মুন্সীফ্ আত্মীয়টি আমাদের বাড়ী আসিলেন। তাঁহার কাছ হইতে বাকী কথাটা শুনি। তিনি বলিলেন, "ম্যাজিস্ট্রেট এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করে আমায় জাবাবদিহি করলে আমিও কড়া কড়া জবাব দিই। আমি বলি, 'আমি তাঁকে থাকতে বলি, তিনি অস্বীকার করেন। তিনি কেবল এক কাপ চা ও কিঞ্চিৎ জলখাবার খেয়ে চলে যান। আমার কোন আত্মীয় আসলে আমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব না?" এই ম্যাজিস্ট্রেটটি রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় শাখার সভাপতি, আর স্থানীয় স্বামীজি একজন ভূতপূর্ব ডেটিনিউ ও ভূতপূর্ব বৈপ্লবিক। সেই সূত্রেই আশ্রমে আমি আমন্ত্রিত

হইয়া একবেলা অতিবাহিত করি। জানি না, তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল। বহু পরে মৈমনসিংহ জেলায় কোন এক কৃষ্টি সম্মেলনের পর তথাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের সহিত আলাপ হয়। তিনি এক প্রখ্যাতনামা মনস্বীর বংশধর। তিনি এই গল্পটি শুনিয়া বলিলেন, "ম্যাজিস্ট্রেটটি কি বাঙ্গালী?" উত্তর দিলাম, "হাঁ।"

এইজন্য, ঐতিহাসিকেরা পুলিশ রিপোর্টে প্রদত্ত তথ্যের উপর যেন অযথা বেশী আস্থা স্থাপন না করেন. ইহাই আমার বক্তব্য। এই প্রকারে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশন কালের অভিজ্ঞতা বলিতে পারি। আমার উপর নজর রাখিতে গিয়া লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ৺রামচন্দ্র শেঠের উপর পুলিশ নজর রাখে এবং দিল্লীতে তিনি নানা সাক্ষ্য সাবুৎ দ্বারা প্রমাণ করেন যে তিনি ভিন্ন ব্যক্তি।

পুনঃ, বিপ্লবান্দোলনের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এই যে "আমিই সারথী" বলিয়া দাবীর গর্ব এবং তজ্জন্য ঝগড়া, ইহার মূল কথা হইল যে, লোকেরা তখন মধ্য-ভিক্টোরীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পূর্বে লোকেরা ভাবিত যে একজন বড় লোকই একটি যুগপ্রবর্তক, তিনিই সমাজে নূতন ধারা আনয়ন করিয়া ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত করেন। কিন্তু আজকালকার সমাজতাত্ত্বিকেরা তাহার বিপরীত কথা বলেন। সমাজ প্রবাহ বহিতে থাকে, আর যুগপ্রবর্তক তাহার মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। একজনে কিছু করিতে পারেন না, সমষ্টিই কার্য করেন।

এই কথা খুব কম লোকেই জানে যে, বর্তমান ভারতে সর্বধর্ম-সমন্বয় ভাবধারার প্রথম প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় নহেন, তাঁহার একশত বৎসর আগে গুজরাটের এক রাষ্ট্রের দেওয়ান প্রাণনাথ বিভিন্ন ধর্মের সম্মিলন করে একটী নিরাকারবাদীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই সম্প্রদায় আজও ভারতে আছে, যদিও আজ নিরাকারবাদীয় নয়। তদ্রূপ, বাঙ্গলার বিপ্লববাদ বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে গুটিকতক তরুণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহার উৎস বহুদূরে অবস্থিত ছিল। আমরা কার্য করিতে গিয়া অনেক প্রবীণ like-minded অর্থাৎ সমমতাবলম্বী লোকের সাক্ষাৎ পাই; কোন কোন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানেরও সন্ধান পাই, যাহা ছদ্মবেশে একই উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছিল। আসল কথা, তুর্কী আক্রমণের পর যেমন বাঙ্গলা স্বাধীনতার কথা ভুলে নাই, তদ্রূপ পলাশীর যুদ্ধের পরও বাঙ্গালী স্বাধীনতার কথা ভুলে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতেরা তাহা নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: বাঙ্গলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বলিতেন—তিনি বহুকাল পূর্ব হইতেই বিপ্লব আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার কর্ম আরম্ভ হয় বলিয়া শুনা গিয়াছিল। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের কর্মও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল বলিয়াই ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে যে কর্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহা স্বদেশী আন্দোলনের প্রবাহের ধাক্কায় বেগবান হইয়া উঠে। গৌণভাবে বৈপ্লবিকেরাই মফঃস্বলে স্বদেশী আন্দোলন চালান। তৎকালে অনেক যুবক ও প্রধান উকিলও বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলন কখনও সহিংস কখনও অহিংস আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনকে অখণ্ড আকারে দেখিতে হইবে। সন্ত্রাসবাদ একটি আন্দোলন নয়, তাহা "শাস্তি" রূপে ব্যবহৃত হয়। 'যুগান্তরে'ই আমি লিখিয়াছিলাম, "ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন—'Terrorism is the last resort of a disarmed patriotism' অর্থাৎ নিরস্ত্র স্বদেশপ্রেমিকতার পক্ষে সন্ত্রাসবাদ শেষ উপায় বলিয়া নির্ধারিত হয়, কিন্তু ইহা গঠনমূলক

বা আন্দোলনমূলক কর্মপদ্ধতি নয়। এতদ্দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। ইউরোপের অ্যানার্কিস্টেরা এইজন্য ইহা পরিত্যাগ করিয়া Passive Resistance (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ) উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। আর রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদীরা আজ অরণ্যে রোদন করিতেছেন, তথায় Mass Terrorism বা গণ-আন্দোলন জয়যুক্ত হইয়াছে। গণ-আন্দোলনের সক্রিয়তাকেই Mass Terrorism বলে অভিহিত করা হয়। গান্ধীজি প্রবর্তিত এই পন্থা দ্বারাই ভারতে স্বাধীনতা স্পৃহা ব্যাপক হইয়াছিল।

পুনঃ বলি বিপ্লব সর্ব সময়েই সহিংস হয় না। বিপ্লব মানে ফৌজ এবং হাতিয়ার নিয়া কেবল লড়াই নয়, কার্লাইল "ফরাসী বিপ্লব" বর্ণনাকালে বলিয়াছেন: 'Revolution is an evolution with an accelerated pace,' অর্থাৎ বিপ্লব একটি ক্রমবিকাশের ধারা যাহা অতি দ্রুত গতিতে চলে। ইহার অর্থ, যে-গন্তব্যে উপনীত হইতে স্বাভাবিক ভাবে ৫০ বৎসর লাগিত তাহা দ্রুত গতিতে গিয়া ৫ বৎসরে লক্ষ্যে পৌঁছায়। কৃষিজীবী অর্ধ-গোলাম সোভিয়েৎ রাশিয়ার জাতি নিচয়ের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণযোগ্য। আর "লাল" চীন এবং "হলদে" ভারতের দ্রুত অগ্রগমনশীলতার গতি লক্ষ্য করিলেও তাহা পরিলক্ষিত হয়।

এইজন্যই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে ৺বিনয় সরকারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। একজন হালফ্যাসানের ছোকরা যাহার কাছে অতীত কিছু নয় বলে ধারণা, তিনি আমায় বলেন, "অধ্যাপক সরকার বলেন, 'Glorious Bengali Revolution of 1905', এই কথা কি যুক্তিযুক্ত ?" আমি উত্তর দিই, "তাহা নিশ্চয়ই ঠিক। যে সে-সময় দেখে নাই, তাহার ভিতর থাকে নাই, সে এই আন্দোলনের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না।"

বাঙ্গলায় এই জনপ্রবাহের অনুষ্ঠান—যদ্বারা বাঙ্গলার ইতিহাস নূতন রূপ ধারণ করে তাহা—দুইবার সংঘটিত হয়। অতীতে অষ্টম শতাব্দীতে আমরা সম্রাট ধর্মপালের 'খালিমপুর অনুশাসনে' পাঠ করি যে, বাঙ্গলার প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্য ন্যায়ে জর্জরিত হইয়া একজন বয়স্ক সামন্ত গোপাল দেবকে দেশ শাসনের জন্য রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐতিহাসিক জয়সোয়াল এই কর্মদ্বারা বাঙ্গালীরা মনুর আইন লঙ্ঘন করিয়া একজন শূদ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিজেদের সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছে বলিয়া ["The Sudra added a glorious chapter to the history of India" (শূদ্র রাজারা ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবান্বিত অধ্যায় যোগ করে বলিয়া)] বাঙ্গালীদের অভিনন্দন করিয়াছেন। তৎপর, আবার মাৎস্য ন্যায় এবং পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণ। শেষে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা নিজেকে আবার খুঁজিয়া পায়, পরভৃতেরা বৈদেশিক খোলস ছাড়িতে থাকে। বাঙ্গালী নিজেকে আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার জন্য অধীর হয়; বাঙ্গালী রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থ-নীতিক সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা চাহিতে থাকে। এই সময়েই ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নৌরজী মহোদয় ব্যক্ত করেন—"Swaraj is our birth-right." এই স্বরাজের উন্মাদনাতেই বাঙ্গলার তরুণ জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কাছে, "লক্ষ পরাণ শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহার ঋণ, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" এই মনের অবস্থা সৃষ্ট হয়। এই স্বরাজের নেশাতেই বাঙ্গালী তরুণ দেশে বিদেশে গিয়াছে। ঋষি বৃহস্পতির পুত্র কচের ন্যায় মারণাস্ত্র শিখিবার জন্য প্যারিস গিয়াছে, আমেরিকায় theoretically যুদ্ধবিদ্যা মিলটারী অফিসারের কাছ থেকে শিখিয়াছে, নাম ভাঁড়াইয়া ফরাসী Foreign Legion-এ ঢুকিয়াছে, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া শত্রুর গুলি উপেক্ষা

করিয়া কান্তারার মরুভূমি পার হইয়া রাত্রে সুয়েজ ক্যানাল সাঁতরাইয়া মিশরে কার্যোপলক্ষে যাইতে উদ্যত হইয়াছে। আরও কত কি করিয়াছে। কারণ বাঙ্গালী তরুণের লক্ষ্য ছিল "রক্তাম্বুধি করিয়া মন্থন, তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন"।

বিপ্লব অর্থে কি বোঝায়? বিপ্লব নানা ভাবের ও নানা প্রকারের হয়। এই বিষয়ে মহামতি লেনিনের লেখা পঠিতব্য। অর্থনীতির উপর সমাজ ও তাঁহার রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতিক পরিবর্তন না হইলে বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করে না। রাজনীতিক বিপ্লব প্রথম সোপান; তৎপর অর্থনীতিক বিপ্লব সংসাধিত হইয়া সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আজ, ভারতে রাজনীতিক বিপ্লবের পর নিঃশব্দে অর্থনীতিক বিপ্লব সংসাধিত হইতেছে। ইহার ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভাঙ্গিয়া ডেমো-ক্র্যাটিক সমাজ উদ্ভূত করিবার চেষ্টা হইতেছে, আর শাসকবর্গীয় কংগ্রেস সংস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে Socialist Pattern (সোশালিষ্ট ধাঁচের) সমাজ গঠন।

অর্থনীতিক বিপ্লব ঘটিলে, নূতন সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে লোকের মানসিক পরিবর্তনও সাধিত হয়। তখন তাহার চিন্তাধারা অন্য প্রকারের হয়, বাহ্য বাতাবরণের ছাপ তাহার মনে পড়ে।

দুইশত বৎসর পূর্বের ভারত আর আজিকার ভারত উভয়েই একস্থানে স্থানুবৎ বসিয়া নাই। কয়েক বৎসরের পূর্বের ভারত আজ পূর্বস্থানে গণ্ডীভূত নয়। লোকের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন যে হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারের ধ্বনি উত্থিত হয় না। তাহা তৎকালীন নবোত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণীর সৌখিন সমাজ সংস্কার ছিল। কিন্তু আজ সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব চলিতেছে।

এই বিষয় বুঝিবার জন্য আমাদের জার্মান দর্শন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই দর্শনে Erkentnis Theorie—ইংরেজীতে যাহাকে Theory of Cognition বলে—তাহা একটা বিশিষ্ট অংশ। মহান জার্মান পণ্ডিত কার্ল মার্ক্স এই দর্শনকে তাঁহার মতের একটি বিশিষ্ট খোঁটা করিয়াছেন। আর ইহা আমাদের বেদান্তের ভিত্তি। এই দর্শন বলে: Phenomena অর্থাৎ জাগতিক অনুষ্ঠান সমূহ প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমাগত চলিতেছে, কিন্তু তাহাকে বিচার দ্বারা বুঝিয়া (cognized হইয়া) সেই অনুষ্ঠানকে স্বীয় কার্যে লাগান হইতেছে একজন মনীষী বা জ্ঞানী নেতার কর্ম। যিনি বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক গতির স্বরূপ বুঝিয়া তাহাকে জ্ঞাতসারে পরিচালনা করেন তিনিই যুগপ্রবর্তক বলে আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি নাস্তি থেকে অস্তির সৃষ্টি করেন না, অস্তিরই স্বরূপ বুঝিয়া তাহাকে কার্যে প্রয়োগ করেন। এই জন্য বলা হয় বীর বা নেতা নূতন যুগের স্রষ্টা নন, বরং নূতন যুগের সংঘর্ষ তাঁহাকে উপরে তুলিয়া ধরে। ভুঁইফোড় কিছুই হয় না। ধীরে ধীরে ডায়লেক্‌টিক্ নীতি বা দ্বন্দ্ব-নীতি অনুসারে সম্বিদ্ সঞ্চয় হইতে থাকে, তাহা যিনি বুঝিয়া লোকের চিন্তা ও কার্যসমূহ পরিচালনা করেন তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বা ভবিষ্যৎ বক্তা বা যুগপ্রবর্তক নেতা। বেদান্তে এই অনুষ্ঠানকেই বিচার পূর্বক "আত্মানং বিদ্ধি" বলে। পুরাতন বাইবেলের বর্ণনা, "I am that I am." সুফী সাধকদের "অন্‌অল্-হক্" মতদ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙ্গলা তথা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সম্বিদ্ সঞ্চিত হইতেছিল। প্রথম স্বাধীনতা প্রচেষ্ট', তৎপর পাঞ্জাবের 'কুকা' শিখদের আন্দোলন, মহারাষ্ট্রে তাঁতিয়া ভিল ও ফড়কের বিদ্রোহ, বাংলায় কৃষকদের নীলকর বিদ্রোহ, উড়িষ্যায় মালিকা সম্প্রদায়ের গোপন কর্ম, ভাইভাব বিদ্রোহ প্রভৃতি খণ্ডভাবে

discontinuous continuityর ধারায় চলিতেছিল। ইহার উপর শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ভারতীয়দের পুরাতন অজ্ঞতাপ্রসূত সুসুপ্তিকে বিশেষ ধাক্কা দেয়। এই সঙ্গে শিক্ষিতেরা কৃষকের অবস্থা, শ্রমজীবীদের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেবল ধর্ম বা সমাজ সংস্কার দ্বারা যে ভারতীয় আর্য জাতির পুনরুত্থান সম্ভব নয় ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন। ডায়লেক্‌টিক্ বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্বনীতির দ্বারা বাঙ্গলার উন্নত মন শেষে রাজনীতিতে আসিয়া পড়িল। রাষ্ট্রশক্তি হস্তে না থাকিলে জাতীয় উত্থান অসম্ভব। ইহাই ধীরে ধীরে জ্ঞান হইতে লাগিল। ফলে পূর্বেকার সংস্কার আন্দোলনে ভাঁটা পড়িল। সংস্কারান্দোলন গণ্ডীবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িক সংস্থায় পরিণত হইল ও নরমপন্থী হইয়া পড়িল। কিন্তু অর্থনীতিক অবস্থানুযায়ী একদল চরমপন্থীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক উত্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে সংস্কারকদের সাহিত্য বা ইংরেজী লেখকদের সাহিত্য অপেক্ষা জার্মান কাণ্ট ও ফরাসী কোঁতের পুস্তক বিশেষভাবে পঠিত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, ফরাসী কোঁতের মত বিশেষভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে আলোড়িত হইতে থাকে। এই বৈপ্লবিক মত যাহা ঈশ্বর, পূজা, পার্বণ প্রভৃতি অস্বীকার করে কেবল স্ত্রীলোককেই সর্বগুণের আকর বলিয়াছে, তাহার প্রভাব কতটা এই দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে কার্যকরী হইয়াছিল তাহা আজ কে বলিবে ? ভারতীয় আর্য মন তখন অন্য পন্থা খুঁজিতেছিল। বাহ্যত দেশে একটা তুষ্ণীভাব বিরাজ করিতে থাকে। তৎপর আসে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—"Heaven is nearer through football than through the Geeta. We want men of strong biceps" (গীতাপাঠাপেক্ষা ফুটবল খেলার দ্বারা স্বর্গ

নিকটতর হইবে। আমরা দৃঢ় মাংসপেশীর লোক চাই)। স্বামীজির *From Colombo to Almorah* নামক পুস্তকটি তরুণদের দ্বারা অধীত হইতে থাকে। এইসঙ্গে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের "ম্যাটসিনি" ও "গ্যারিবল্ডী"র জীবনী, "প্রাতঃস্মরণীয় চরিতাবলী" প্রভৃতি পুস্তক তরুণেরা পড়িত। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাসমূহ তুষ্ণীভূত মনে বোমা পড়ার মত কার্য করে। ফরাসী লেখক রোঁলার কথায় বিবেকানন্দের বাণী—"put new red wine in moribund nationalism"। ইহার অর্থ ঝিমানো-জাতীয়তাবাদে নূতন রক্ত সঞ্চারিত হইল। তরুণ বাংলা নূতন কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাইল। ইহারই ফলে স্বামীজির দেহত্যাগের পর কলিকাতায় বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন ও সর্বত্র তাহার শাখা স্থাপন দ্বারা যুবকদের মনকে সক্রিয় করিতে থাকে। এই সঙ্গে পুরাতন যুগের কতিপয় ব্যক্তি—যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাও—এই সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে থাকেন। এই প্রকারে ভারতীয় আর্য মন দ্বন্দ্বনীতির ধাক্কায় বিপ্লববাদ অর্থাৎ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় আসিয়া উপনীত হয়। তখন টুকরা-টুকরা ধর্ম বা সমাজ বা রাজনীতি বিষয়ক সংস্কার আন্দোলন নয়, বিপ্লবের তরঙ্গ আসিয়া বঙ্গের যুবকের মনকে ধাক্কা দিল, তাহার মস্তিষ্কের প্রবাহ অন্য ধারা গ্রহণ করিল।

শ্রীঅরবিন্দ-বন্ধু ও বৈপ্লবিক দলের অন্যতম কর্মী শ্রদ্ধেয় ৺চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "রামদাস ও শিবাজী" নামক গ্রন্থে আক্ষেপ করিয়াছেন, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের ন্যায় মধ্যযুগে বাঙ্গলার রাজনীতিক, সামাজিক ও ধর্মের পরিস্থিতি একই প্রকারের ছিল। এই সব দেশে ধর্মের দ্বারা একটা গণ-আন্দোলন সমুপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলায় রামদাস বা গুরুগোবিন্দ সিংহের আবির্ভাবের অভাবে আর এই গণ-জাগরণের

'কার্য-কারণ' সম্বন্ধ সংযুক্ত করিবার মত কোন নেতা উত্থিত না হওয়ায় বাঙ্গলা একজাতীয়তার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হয়। কথাটি একেবারে ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে গৌণভাবে আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে পাই। দেশের তরুণদের প্রতি তাঁহার বাণী বৃথা যায় নাই। যুবক সম্প্রদায় সেই বাণী শুনে; তাহারই ফলে স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ উপস্থিত হয়।

ইংরেজ সরকারের লোকেরা বলিয়াছিলেন, স্বদেশী আন্দোলন আকস্মিক ভাবে আসিয়া পড়ায় তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 'আকস্মিক' ভাবে কোন অনুষ্ঠানই উদ্ভূত হয় না। আমরা দেখি যে অরণি অনেক দিন হইতে চয়ন করা হইতেছিল, বিপ্লবান্দোলন ও তাহার বাহ্যিক প্রকাশ স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা তাহাতে আহুতি প্রদান হইতে থাকে। আর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে "ভারত ছাড়ো" হুঙ্কারে তাহার পূর্ণাহুতি প্রদান করা হয়। ইহার ফলে আজ ভারত স্বাধীন। কিন্তু বিপ্লবের ধারা এখনও চলিতেছে, দ্বন্দ্বনীতি তাহাকে পূর্ণ অর্থনীতিক বিপ্লবে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রন্থকারদ্বয় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে নানাভাবে মৌলিক অনুসন্ধান দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন ও তাহার পূর্বেকার অনুষ্ঠান সমূহের যে সব লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করিয়া এখানে প্রকাশ করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহারা ইতিহাস সেবকদের কাছে বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। এতদ্বারা স্বদেশী যুগ সম্বন্ধে নানা অলীক সংবাদ ও ভ্রান্তির নিরসন হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের মহান কর্মে জয়যুক্ত হউক ইহাই আমি আশা করি।

৩নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬
৩১-৮-১৯৫৭

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

পুনশ্চঃ, ১৯৫৭ সনের আগষ্ট মাসে যে পুস্তিকার জন্য আমি ভূমিকা লিখিয়াছিলাম, তাহা প্রায় চার বৎসর পরে নূতন নামে বড় গ্রন্থের আকারে বাহির হইতেছে। ইহাতে স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে "নিবেদিতা" সম্বন্ধে একখানি বইও বাজারে বাহির হইয়াছে। বাংলার বিপ্লববাদ ও নিবেদিতা সম্বন্ধে দেখিতেছি "মৌলিক" গবেষকেরা কতই না আজগুবি গল্পের আশ্রয় লইতেছেন! এই প্রসঙ্গে মাডাম রেমণ্ডের উক্তি বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রণালী হইল "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপানো! এইজন্যই কোন কোন বিষয়ে তাঁহার লেখা সম্বন্ধে আমার সন্দেহের উদয় হয়। তিনি রোমান ক্যাথলিক বলে নিবেদিতাকেও রোমান ক্যাথলিক সাজাইয়াছেন, নিবেদিতার ঝি নাকি তাঁহাকে লুকাইয়া ক্যাথলিক গীর্জায় বাপ্টাইজ্ করাইয়াছিল। কিন্তু প্রটেষ্ট্যাণ্ট পাদ্রীর কন্যার পুনঃ ব্যাপ্টিজম্ কি হইতে পারে না? নিবেদিতার আমেরিকান ও ভারতীয় কোন বন্ধুর কাছ থেকে শুনি নাই যে, তিনি রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি হিন্দুর কন্যা নন যে, একবার 'কলমা' পড়িলেই আর ঘরে ফিরিবার উপায় নাই। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে ভগ্নী নিবেদিতা বৈপ্লবিক সমিতির কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সভ্য ছিলেন বলে যে সংবাদ আমি ইতিপূর্বে আমার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করি, তাহা আমি মাডাম রেমণ্ডের কাছ থেকেই প্রথমে শুনি। তিনি লিখিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দই নাকি তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়াছেন। আমরা কিন্তু কখনও একথা শুনি নাই। অরবিন্দের পুস্তকেও ইহার উল্লেখ নাই।

পুনঃ, একবার মাডামের কাছ থেকে চিঠি পাই যে, তাঁহার সংবাদের মধ্যে কোন কোন জায়গায় আমি আবির্ভূত হইতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা

করেন, "একথা কি ঠিক যে নিবেদিতা এক বক্তৃতাস্থলে যাইতেছিলেন, আমি সঙ্গে ছিলাম। পুলিশ ওঁৎ পেতে তাঁকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বসিয়াছিল। আমি তা বুঝিতে পারিয়া নিবেদিতাকে বক্তৃতা থেকে নিরস্ত করি।" ইহার উত্তরে আমি লিখি, "ইহা সর্বৈব মিথ্যা।" তিনি বোধহয় জানিতেন না যে, ইংরেজ ভারতে একজন ইংরেজ বা ইউরোপীয়কে ভারতীয় পাহারাওয়ালা বা পুলিশ কর্মচারীর গ্রেপ্তার করিবার কোন অধিকার নাই।

কিন্তু, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি এই গল্পকে ঘুরাইয়া আমার মধ্যম অগ্রজের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। পুনঃ, একজন ইউরোপীয় মহিলা (স্বামী অভেদানন্দের শিষ্যা) আমায় বলেন, "আপনি কি মাডাম রেমণ্ডকে বলিয়াছিলেন, স্বামীজি ও আপনি একত্রে বসিয়া প্লানচেটে ভূত নামাইতেন?" আমি জবাব দিই, "একথা ত আমি বলি নাই; বরং বলিয়াছিলাম, একজায়গায় প্লানচেটে ভূত নামানো হইতেছিল, তাহাতে স্বামীজির spirit আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোন প্রশ্নের দ্বারা spirit-এর যথার্থতা ফেঁসে যায় (লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" দ্রষ্টব্য)। এই গল্পটি মাডাম নিজের কার্যের জন্য উল্টাইয়াছেন। এই সব বিদেশীরা ভারতে কেবল ভূতের খেলা ও ফুল গাছে কি করিয়া অল্প সময়ে গাছ হয়, এই সব যাদু দেখিতে আসেন। কাজেই ঐ প্লানচেটের গল্পটি নিজের কার্যে লাগাইলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দও ভূত নামাইতেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে, ভূত নামানোর দল, হিমালয়ে আস্ট্রাল মহাত্মার আবাস ইত্যাদি গল্পের তিনি ঘোর বিপক্ষবাদী ছিলেন।

নিবেদিতার বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া বারীন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা স্থির করেন, এমন কথাও লিখিত হইয়াছে! উক্ত পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোক্তাদের

মধ্যে এখনও কেহ কেহ জীবিত আছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হওয়া যাইবে (লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" দ্রষ্টব্য)। পুনঃ, "যুগান্তর" পত্রিকা পড়িয়াছেন এমন বহু লোক দেশে এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে "যুগান্তর" সাম্প্রদায়িক পত্রিকা ছিল কিনা এবং কালীভক্তদের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইত কি না।

উপরেই উক্ত হইয়াছে যাঁহারা জীবনে বিপ্লববাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন নাই; বরং নিরাপত্তার পাঁচিলের অন্তরালে যাঁহারা নিজেদের চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহারাই আজ বাজারে বিপ্লববাদের ইতিহাস রচয়িতা ও বৈপ্লবিকদের জীবনীর ঐতিহাসিক হইয়াছেন।

জীবনের সায়াহ্নে এই দেখিয়া যাইতেছি যে, বঙ্গবাসী আজ বড় military-minded অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে বড় টনটনে জ্ঞানসম্পন্ন ও বড় কূট-রাজনীতিবিশারদ হইয়াছে। হায়! লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বাঙ্গালীর ঐ সব জ্ঞান ছিল কোথায়? আবার, ইহাও দেখিতেছি যে, বাঙ্গালী হিন্দু বড় ঐতিহাসিক হইতেছে। নানা আজগুবি গল্পের সমাবেশ করে অপক্ক-মস্তিষ্ক তরুণদের মনোরঞ্জনের জন্য কেতাব লিখিলেই তাহা "ইতিহাস" হয় না। এইস্থলে দুইটি জিনিষ বিবেচ্য। প্রথম, মোগলযুগ থেকেই বঙ্গবাসী যুদ্ধ-বিদ্যা-রসে বঞ্চিত। এইজন্যই আমরা বাল্যকালে ছিরে ডাকাত ও রঘু ডাকাতের গল্প শুনে মনের ঐ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতাম। "রঘু ডাকাত" গল্প তখন নাটকাকারে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। যৌবন বয়সে, "আনন্দ মঠ" পড়িয়া তাহা বাস্তবে পরিণত করিবার আশা পোষণ করিতাম।

তারপর আসিল, "পথের দাবী" এবং অন্যান্য পুস্তক। অলৌকিক

বা অপ্রাকৃত এবং আজগুবি গল্পের পশ্চাতে বাঙ্গালী চিরকালই ঘুরে। ইহা তার . রক্ত-মাংস সঞ্জাত। সেইজন্যই অলৌকিক ও বিজ্ঞান, আজগুবি ও সত্য ঘটনার মধ্যে সাধারণ লোক পার্থক্য দেখে না। "বিরিঞ্চি বাবার" পশ্চাতে উকিল মুনসেফ্ প্রভৃতি আজও ঘোরে ! (Brunton :—*Quest For The Secret In India* দ্রষ্টব্য)।

ইহার একটি কারণ, আমাদের অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা, যা এতদিন দেওয়া হইতেছিল ; আর একটি কারণ, বাঙ্গালীর অলৌকিকত্বের উপর গভীর বিশ্বাস। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যাহাদের Thrice conquered people (তিনবার বিজিত জাতি) বলিয়া শ্লেষ করে, তাহাদের অন্য মনস্তত্ত্ব কি করিয়া আসিবে ?

দ্বিতীয় কারণটি পূর্বোক্ত আমাদের পিতৃপুরুষের রক্ত থেকে আসিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাচীন বিশ্বাসের (Tribal beliefs-এর) উপর বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা নানা অলৌকিক ও আজগুবি গল্পের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধরা তীর্থিক (অবৌদ্ধ) থেকে বেশী যোগশক্তিসম্পন্ন হইয়া নানা কেরামতি দেখাইয়াছেন ; তজ্জন্য নানা অলৌকিক গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। সিদ্ধদের এইসব যোগসাধনার কথা (গল্প) পড়িলে গা রি-রি করে (লেখকের *Mystic Tales of Lama Taranath* দ্রষ্টব্য)। আজ, বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাংলা তথা ভারতে নাই। কিন্তু তাঁহাদের legacy (উত্তরাধিকার) ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ও মুসলমান পীরদের দিয়া গিয়াছেন (ডাঃ এনামুল হকের—"বাংলায় সূফীপ্রভাব" দ্রষ্টব্য)। এইসব ভূতুড়ে গল্প এখনও যোগবিদ্যার অন্তর্গত বলে বিশ্বাস করা হয়। ইহার সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে ইন্দ্রজাল (Magic) এদেশে প্রচলিত ছিল। Rope-Trick ইহার মধ্যে একটি (কালিদাস দ্রষ্টব্য)। সাধারণ ভারতবাসী এখনও ম্যাজিক ও ধর্মের প্রভেদ বুঝে না। যাদুকর P. C.

Sarkar কেন এখনও "অবতার" বলিয়া পূজিত হ'ন নাই, ইহাই আশ্চর্যের কথা!

এই বিষয়ে দুঃখের কথা, যে-সব পাশ্চাত্যদেশীয় মহিলা ও পুরুষেরা ভারত পর্যটনে আসেন, তাঁহারা কেহই বাস্তব ভারত দর্শনেচ্ছু নন; তাঁহারা উপরোক্ত ম্যাজিক-পূর্ণ ভারত দেখিতে আসেন।

ভগ্নী নিবেদিতা ১৯১১ খৃঃ আমেরিকায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "ভূপেন, তুমি কি মনে কর যে, প্রত্যেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান যে ভারত দর্শনে আসিবে, ভারত বুঝাইবার জন্য সে একজন বিবেকানন্দ পাইবে?" কথাটা অতি সত্য। পুনঃ ভারতের জন্য নিবেদিত প্রাণ নিবেদিতাকে সম্যক ভাবে বুঝিবার জন্য তদনুরূপ লোকও প্রয়োজন। নিবেদিতাকে জানিতেন, তাঁহার সঙ্গে কার্য করিয়াছেন এমন অনেক লোকও আজ জীবিত আছেন। এইজন্য ভগ্নী নিবেদিতাকে বিকৃত করে উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রদর্শন করিলে বড়ই চটকদার গল্পের আবির্ভাব হয়।

ভগ্নী নিবেদিতা Nihilist ছিলেন না। ইহার অর্থ কি তাহাই বোধহয় প্রয়োগকর্তা জানেন না, তিনি Vivekanandist ছিলেন (*My Master as I saw Him* দ্রষ্টব্য)। তিনি নাকি Sinn Fein দলভুক্ত ছিলেন এবং বাঙ্গালী তরুণ বিপ্লবীদের তাহার কর্মপদ্ধতি শিখাইতেন। এই গল্প কখনও কাহার কাছ থেকে শুনি নাই। আয়র্লণ্ডের সিন্ ফিন্ আন্দোলন আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় খাঁটি স্বদেশী আন্দোলন। আইরিশ জাতিকে তাহাদের মৃত ভাষা শিক্ষাদান এবং ইংরেজীয়ানা ছাড়ানোর চেষ্টা ছিল। এই বিষয়ে অনেক বইও আছে। সন্ত্রাসবাদ ইহার সহিত বিজড়িত ছিল না। নিবেদিতা আলস্টারের স্কচ্ বংশজাত প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মীয় বংশের লোক। তাঁহার পিতৃপুরুষ

ছিল ইংরেজ ও তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ইংরাজী। কাজেই কেল্টিক আইরিশদের ন্যায় পুরাতন ভাষা ও আচারের পুনঃ প্রচলনে তাঁহার কোন উৎসাহ না থাকাই সম্ভব। তারপর তিনি ইংলণ্ডে বর্ধিত হইয়াছেন। এইটুকু শুনেছিলাম যে তাঁহার পিতা যিনি একজন প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মযাজক ছিলেন, তিনি আলষ্টারের লোক হইয়াও জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে সমদর্শী ছিলেন, নিবেদিতাও তাই ছিলেন। তাঁহার কাছ থেকে কখনও সাম্প্রদায়িক কথা শুনি নাই।

আবার ইহাও লিখিত হইয়াছে, তিনি নাকি বাঙ্গালী তরুণদের "বোমা" প্রস্তুত শিখাইতেন। এর মত অপ্রাকৃত ও মিথ্যা গল্প আর নাই! তিনি শিক্ষায় Botanist (উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক) ছিলেন। স্বামীজির জীবনকালে তিনি বেলুড়ে তাহাই পড়াইতেন, কেমিষ্ট্রি-চর্চ্চা তাঁহার ছিল না। তাঁহার ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী মিস্ এডিংটনও তাই ছিলেন। ১৯১২ খৃঃ নিউইয়র্কে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা ও কথাবার্তা হইয়াছিল। এইজন্য বলি, এইসব গল্প সত্য নহে।

পুনশ্চ, যদি তিনি সন্ত্রাসবাদীই হইতেন তাহা হইলে ভারতীয় পুলিশ কি তাঁহাকে ভারতে থাকিতে দিত? ভগ্নী ক্রিষ্টিনের কাছ থেকে নিম্নলিখিত তথ্য শুনিয়াছি : ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর উপর বোমা পড়িবার পর লেডী মিণ্টো ব্যাকুল হন ও একদিন এক পার্শী মহিলার সহিত বেলুড় মঠে আবির্ভূত হন। পরে একদিন নিবেদিতার বাড়ীতেও উপস্থিত হইয়া বলেন তোমরা ভারতবাসীদের বল, আমার স্বামী ভারতবাসীদের কত ভালবাসে, তাদের জন্য কত করিতেছে, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বোমা ছোঁড়ার কথা উঠে। নিবেদিতা বলেন, কাগজে বলিতেছে যে, উহা মিথ্যা রচনা। তদুত্তরে লেডী মিণ্টো বলেন

—I still can identify the boy who with raised hands threw the bomb (যে বালক হাত তুলে বোমা ছুঁড়িল তাহাকে আমি এখনও সনাক্ত করিতে পারি)। যদি নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদিনী হইতেন, তাহা হইলে কি লেডী মিণ্টো তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন বা পুলিশ তাঁহাকে নিবেদিতার কাছে আসিতে দিত ?

এই বিষয়ে শেষ কথা, নিবেদিতার যেটুকু সম্পর্ক বাঙ্গলার বিপ্লববাদী দলের সহিত ছিল, তা অতি গোড়ার ভাগে ছিল। তিনি পি, মিত্র, অরবিন্দ, স্থরেন ঠাকুর প্রভৃতিকে চিনিতেন এই পর্যন্ত।

লেখক নিবেদিতাকে বাল্যকাল থেকেই চিনিতেন। আমেরিকায় ১৯০৯ ও ১৯১১ সালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিশেষ ভাবে আলাপ করার স্থবিধাও তাঁহার হইয়াছিল। এইজন্যই এইসব আজগুবী ও অপ্রাকৃত গল্পের প্রতিবাদ করে বর্তমান লেখক সত্যের মর্যাদা স্থাপনে প্রয়াসী। নিবেদিতার সহিত জাতীয়তাবাদীদের যে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক এককালে ছিল ইহা বোধ হয় লেখকের কলম হইতেই প্রথমে বাহির হয়, কারণ একদল তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ তখন চাপিয়া রাখিতেছিল। আসল নিবেদিতা এই কাল্পনিক নিবেদিতা হইতে মহৎ। যাঁহারা তাঁহাকে কিম্ভূতভাবে চিত্রিত করেন, তাঁহারা তাঁহার মহত্ত্বের বিষয় জানেন না বা প্রকাশ করেন না।

কলিকাতায় ১৮৯৭ খৃঃ যখন প্লেগের মড়ক হয়, তখন স্বামীজি এমারেল্ড থিয়েটারে (পরে ক্লাসিক থিয়েটার) এক সভা আহূত করে রোগীদের সেবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করেন। নিবেদিতাও সেই সভায় বক্তৃতা করেন, এবং লোকদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ফেনাইল প্রভৃতি দিয়া রোগীদের সাহায্য করেন। এই সময়ে বাগবাজারে প্লেগের মড়ক হইলে তিনি নিজে রোগীদের শুশ্রূষা করিতেন (*Web o*

Indian Life দ্রষ্টব্য)। আজকাল এইসব কথা গবেষকেরা বড় একটা উল্লেখ করেন না।

ঋগ্বেদের "ইন্দ্রসেনা মুগদলিনি" (দশম মণ্ডল) হইতে আজ পর্যন্ত ভারতে বীরাঙ্গনার অভাব হয় নাই। বাংলাতেও Vera Susilov Vera Figner শ্রেণীর সন্ত্রাসবাদিনী তরুণীর অভাব হয় নাই। ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদে যদি তেমন প্রয়োজনীয় বাতাবরণ সৃষ্টি হইত তাহা হইলে জোয়ান অব আর্কের মতো নারীও স্বাধীনতার ধ্বজাহস্তে আবির্ভূত হইতেন। এইজন্য বলি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের এক ব্রহ্মচারিণীকে অস্বাভাবিকভাবে সাজাইয়া বাংলার জোয়ান অব আর্ক রূপে পরিচিত করিবার কোন্ হেতু থাকিতে পারে ?

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৬৮,
১৪ই এপ্রিল, ১৯৬১ } শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ণানুক্রমিক নামসূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	৪	উপাচার্যরূপে	আচার্যরূপে
১৬	১০	"	"
	১৮	১৩০২	১৩১২
৯৩	১৫	পানের	নানের
৯৬	১৫	প্রবন্ধ	পত্র
১৬৭	২৪	স্বতঃস্ফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
১৭৭	৩	কাণে	কানে
২০২	৪	প্রতক্রিয়া	প্রতিক্রিয়া
২০৪	২০	sufler	suffer
২০৫	১৫	১৮৮৯	১৮৮৮
২০৬	২২	এলাহাবাদ, ১৯৪৫	আগ্রা, ১৯৫৪
২৪০	২৩	দারা	দ্বারা
২৪৭	২০	deas	ideas